



মাসুদ রানা

বাউন্টি হান্টার্স

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



এক

রিপাবলিক অভ ফ্রান্স।

প্যারিস থেকে সামান্য দূরে ব্যক্তিগত মন্ত এক পার্কের মাঝে
রাজকীয় বাগানবাড়ি।

অক্টোবরের বারো তারিখ। সন্ধ্যা সাতটা।

বোর্ডরুমের মিটিঙে যাঁরা এসেছেন, সংখ্যায় তাঁরা বারোজন।

সবাই পুরুষ।

সবাই বিলিয়োনেয়ার।

এই বারোজনের ভিতর ষাট বছরকে পিছনে ফেলেছেন
দশজন। অন্য দু'জন বিশের কোঠায়। এদের বাবা এই
কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন, নইলে হয়তো এখানে বসবার সুযোগ
মিলত না এদের। কাউন্সিল নিশ্চিত হয়েছে— এদের বিশ্বস্ততা
নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার কোনোই কারণ নেই।

এই কাউন্সিলে যোগ দিতে পূর্বপুরুষের বিপুল সম্পদ পেতে
হবে, এমন নয়। তবে, এই কাউন্সিলের প্রায় সবাই তাঁদের বাবার
কাছ থেকেই জন্মসূত্রে পেয়েছেন হাজার হাজার কোটি ডলার।

বিশেষ এই কাউন্সিলের তরফ থেকে সাধারণত কাউকে
সদস্য-পদ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় না।

এঁরা টাকার কুমির নন, একেকজন ডলার-পাউণ্ড ও ইউরো
কারেন্সির মন্ত সব কিলার ওয়েইল।

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার কোম্পানির মালিক এই

কাউন্সিলের সহ-প্রতিষ্ঠাকারী ।

পরেরজন বিখ্যাত কয়েকটি সুইস ব্যাঙ্কের মালিক ।

তৃতীয়জন সৌদি তেল কুবের ।

চতুর্থজন বিশ্বের সবচেয়ে সফল স্টক ব্যবসায়ী ।

পঞ্চমজন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শিপিং কোম্পানির হর্তাকর্তা ।

ষষ্ঠজন ইউএস ফেডারেল রিয়ার্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ।

পাঁচ বছর আগে মৃত বাবার কাছ থেকে মস্ত এক ইম্পাত রাজত্ব পেয়েছে একজন । তার কোম্পানিগুলো ইউএস সরকারকে সরবরাহ করে মিলিটারি হার্ডওয়্যার এবং মিসাইল ।

কাউন্সিলে কোনও মিডিয়া ব্যারন নেই এর মূল কারণ, ধরে নেয়া হয়েছে, ধার এবং শেয়ার বাজারের কারণে যখন-তখন হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তাদের সম্পদ । এই কাউন্সিল আসলে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে বড় সব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে, কাউন্সিলের সদস্যরাই আকাশে তোলে বা ধুলোয় মিশিয়ে দেয় মিডিয়া ব্যারনদেরকে ।

একই কারণে কাউন্সিলে কোনও জাতীয় নেতা নেই । কাউন্সিলের সবাই জানে, খুব দ্রুত হারিয়ে যায় নেতাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা । মিডিয়া ব্যারনদের মতই, রাজনীতিকদের দাপট হঠাৎ করেই শেষ হয় । তার চেয়েও বড় কথা, এই কাউন্সিল অতীতে নানা দেশে প্রেসিডেন্ট তৈরি করেছে, আবার পছন্দ না হলে কান ধরে নামিয়ে দিয়েছে গদি থেকে । একই কথা খাটে স্বৈরশাসকদের বিষয়েও ।

অনেক আগেই স্থির হয়েছে, কাউন্সিলে রাখা হবে না কোনও মহিলাকে ।

অতীতে কাউন্সিলাররা একমত হন, কোনও মহিলাকে মিটিঙে বসতে দেয়া হবে না । তা সে রানি হলেও নয় । নামকরা ফরাসী কসমেটিক্স কোম্পানির মালিক লিলি মাখসাখের থাকতে পারে ত্রিশ বিলিয়ন ডলার, কিন্তু কখনও তাকে আসতে দেয়া হবে না

এই মিটিঙে।

উনিশ শ' আঠারো সাল থেকে প্রতি বছর দু'বার করে মিটিঙে বসছে এই কাউন্সিল।

কিন্তু এ বছর নয়বার মিটিঙে বসেছেন তাঁরা।

এই বছর আসলে নানাদিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ।

সুইটয়ারল্যাণ্ডের ড্যাভোসে বাৎসরিক ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামে মিলিত হয়েছেন তাঁরা। এ ছাড়া দুনিয়ার বড় সব ট্রেড অর্গানাইজেশনের মিটিঙেও। এমন কী একবার মিটিং হয়েছে ক্যাম্প ডেভিডে। তখন অবশ্য ওখানে ছিলেন না ইউএসএ-র প্রেসিডেন্ট।

আজকের মিটিং বসেছে মস্ত বাগানবাড়িতে।

দেখা গেল প্রত্যেকে হ্যাঁ-সূচক ভোট দিয়েছেন।

‘তা হলে সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ,’ বললেন চেয়ারম্যান। ‘১৩ অক্টোবর থেকেই শিকার শুরু। আজই গতানুগতিক চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে টার্গেটদের নাম। যারা বাউন্টি নিয়ে আসবে, তাদের কাছ থেকে মাল বুঝে পেলো পাওনা পরিশোধ করবেন এজিএম-সুইসের মোসিউ পি. এস. ড্যাবলার।

‘সবমিলে পনেরোটি টার্গেট। এ ছাড়া পরে আরও দুটো টার্গেট দেয়া হবে। প্রতিটি বাউন্টির জন্য দেয়া হবে তেত্রিশ মিলিয়ন ইউএস ডলার।’

এর একঘণ্টা পর শেষ হলো মিটিং। টেবিলে পড়ে রইল নোট। সবার নোটপ্যাড উপুড় করে রাখা, কিন্তু চেয়ারম্যানের সামনে টেবিলের উপর উল্টে গেছে প্যাডের পাতা।

ওখানে রয়েছে নামের একটি লিস্ট:

.....		
নাম	দেশ	সংগঠন
.....		

ক্যাপলান, স্কট এম.	ইউকে	এসএএস
ডসন, রিচার্ড কে.	ইউকে	এমআই-৬
অ্যাটলক, হার্লি.	ইউএসএ	ডেল্টা
এরিখ, সোলে টি.	ফ্রান্স	ডিজিএসই
কোসলোফ্ফি, চার্লস্ আর.	ইউকে	এসএএস
ওয়েলন, জে.	ইউএসএ	ডেল্টা
আজিজ আমিন.	লেবানন	হামাস
রেইসার্ট, জন আর.	ইউএসএ	ইউএসএএমআরএমসি
রবিন, কার্লটন.	ইউএসএ	ইউএস মেরিন
হারিস, টেরেন্স এক্স.	ইউএস	আইএসএস
ম্যাকিন, ডেনিস ই.	ইজরায়েল	মোসাদ
রানা, মাসুদ চৌধুরি.	বাংলাদেশ	বিসিআই
গ্র্যাঞ্জার, রেমণ্ড কে.	ইউএসএ	ইউএস মেরিন
আলাল, হোসেন.	সৌদি আরব	আল-কায়েদা
অ্যামনন, আব্রাম.	ইজরায়েল	আইএএফ

দুনিয়া-সেরা এলিট মিলিটারি ইউনিট, যেমন ব্রিটিশদের এসএএস, ইউএস আর্মির ডেল্টা ডিটাচমেন্ট, মেরিন কর্পস, ইজরায়েলি এয়ার ফোর্স, বা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি মোসাদ, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, সিআইএ ওরফে আইএসএস-এর সদস্যদের ওই তালিকাকে হালকাভাবে নেয়া যায় না। এ ছাড়া, আল-কায়েদা ও হামাসের সদস্যদের নামও রয়েছে ওই তালিকায়।

বিশেষ কাজে দক্ষ ওই লোকগুলো দুনিয়া জুড়ে নাম করেছে তাদের বিপজ্জনক পেশার কারণে।

কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিশালী কাউন্সিল স্থির করেছে— ওই

পনেরোজনকে আগামীকাল থেকে কুকুরের মত তাড়িয়ে হত্যা করা হবে। সেজন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র তিনটি দিন।

দুই

১৩ অক্টোবর।

স্থানীয় সময় সকাল নয়টা।

সাইবেরিয়ার এ অংশে শৌ-শৌ বইছে তুমুল মেরুঝড়, ধবল বরফ ছাওয়া জমির বুকে তীর্যক ভাবে নেমে আসছে নরম তুষারের পুরু শুভ্র চাদর।

পৃথিবীর আরেক প্রান্তে ইউএসএ-র ই.এস.টি. রাত নয়টা, ১২ অক্টোবর।

ঝড়ের অনেক উপর দিয়ে সাইবেরিয়ার আকাশে শব্দের গতির চেয়ে জোরে রকেটের মত ছুটে চলেছে একটি বিমান।

কোন রাশান স্টেশনের রেইডার স্ক্রিনে একবারের জন্যও ধরা পড়েনি। প্রচণ্ড গতি ভেঙে দিয়েছে সাউণ্ড ব্যারিয়ার, কিন্তু কোনও সনিক বুম নেই। এই বিমান ব্যবহার করছে অত্যাধুনিক ওয়েভ-নেগেটিভিং সেন্সার।

সাধারণত এ ধরনের মিশনে পাঠানো হয় না মহামূল্যবান এই বিমান। রাগী ভুরুওয়ালা ককপিট উইণ্ডো, কালো রেইডার-অ্যাবসর্বেন্ট রং এবং অদ্ভুত ডানা নিয়ে বিদ্যুৎবেগে চলেছে বি-২ স্টেলথ বোমারু বিমান। ওটা বহন করতে পারে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড অর্ডন্যান্স— তার ভিতর থাকতে পারে লেসার গাইডেড

বোমা বা এয়ার লঞ্চ থার্মোনিউক্লিয়ার ত্রুজ মিসাইল ।

কিন্তু আজকে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস ও রাশার সাইবেরিয়ার মাঝের এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে বোমারু বিমানে কোনও বোমা বা মিসাইল নেই ।

মডিফাই করা হয়েছে বিমানের বম বে, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে হালকা কিন্তু দ্রুতগামী একটি ভেহিকেল । পাশেই ছয়জন ইউনাইটেড স্টেটস্ মেরিন এবং দু'জন বাঙালি সেনা । শেষের দু'জনের একজন প্রাক্তন মেজর, অন্যজন বাংলাদেশ আর্মির সার্জেন্ট । দু'জনই কমাণ্ডো যোদ্ধা ।

স্টেলথ বোমারু বিমানের ককপিটে এসে ঢুকল বিসিআই এজেন্ট, মাসুদ রানা । ওর জানা নেই, গতকাল এই মায়াবী জগৎ থেকে ওকে বিদায় দিতে জারি করা হয়েছে নির্দেশ— দেখামাত্র হত্যা করতে হবে মাসুদ রানাকে, কেটে আনতে হবে তার মাথা ।

আসলে গতকাল থেকেই শুরু হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাউন্টি হান্ট । ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কিন্তু সুযোগ্য একদল লোক খুঁজতে শুরু করেছে মাসুদ রানাকে ।

ধূসর সাইবেরিয়ার আকাশে চোখ মেলে দিয়েছে রানা । পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি দীর্ঘ ও, সুঠামদেহী । ত্রুকাট চুলগুলো ঢাকা পড়েছে সাদা-ধূসর কেভলার হেলমেটের নীচে । মুখে এখন চিন্তার ছাপ । প্রচণ্ড চাপের মুখেও শীতল থাকে ওর ক্ষুরধার মস্তিষ্ক । যারা ওর অধীনে কাজ করেছে, তারা বলে: ও এক অদ্ভুত মানুষ, ওর উপর ভরসা করা যায় নিশ্চিন্তে । সঙ্গিকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজ জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে সামান্যতম দ্বিধা করে না ।

গত কয়েক ঘণ্টা অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল মাসুদ রানা । সে কথাই ভাবছে বি-২ বোমারু বিমানের ককপিটের ভিতর দাঁড়িয়ে ।

ফোনটা এসেছিল হঠাৎ করেই ।

লস অ্যাঞ্জেলেসে রানা এজেন্সির নিজস্ব অফিসে চুপ করে

ফাইল দেখছিল রানা। চটকা ভাঙল ল্যাণ্ড ফোনের রিং শুনে।
রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। ‘হ্যালো?’
‘মেজর রানা?’ গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল ওদিক থেকে।
‘কে বলছেন, প্লিজ।’
‘জরুরি আলাপ আছে আপনার সঙ্গে,’ বলল লোকটা।
‘আপনি হয়তো এ বিষয়ে আগ্রহী হতে পারেন।’
‘আপনি কে?’ আবার জানতে চাইল রানা।
‘আমি কর্নেল বব জেনকিন্স, মেরিন ফোর্সে আছি।’
‘বলুন।’ ততক্ষণে পুরো সচেতন হয়ে উঠেছে রানা।
‘ফোন করেছি আপনার এক বন্ধুর খবর জানাতে,’ খুকখুক করে কাশলেন ভদ্রলোক।

‘কার বিষয়ে জানাতে চান?’ জিজ্ঞেস করল রানা।
‘মেরিন ফোর্সের মেজর রবিন কার্লটন। গতকাল সন্ধ্যায় রিকন ইউনিট নিয়ে সাইবেরিয়ায় গেছে সে। সঙ্গে এক রিকন ডেল্টা ডিটাচমেন্ট।’ হঠাৎ করেই থেমে গেলেন তিনি।

রানার মনে পড়ল, অ্যান্টার্কটিকার তুষার ছাওয়া এক নির্জন স্টেশনের কথা। ওখানে মস্ত বিপদ থেকে ওকে রক্ষা করতে আশ্রাণ চেষ্টা করেছিল রবিন কার্লটন। হাসিখুশি মানুষ, উদার মনের, বন্ধুদের জন্য ঝুঁকি নিতে মোটেও দ্বিধা করে না। অল্প কিছুদিনের ভিতর ওরা হয়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কয়েক মুহূর্ত পর বললেন কর্নেল, ‘ইউএসএ-র কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া একদল সন্ত্রাসী দখল করে নিয়েছে সাইবেরিয়ার এক পরিত্যক্ত মিলিটারি শহর। তাদের ইচ্ছা: ওখানে গুদামজাত নিউক্লিয়ার মিসাইল ব্যবহার করে উড়িয়ে দেবে আরবের কয়েকটি দেশের রাজধানী। দু’একটা ফেলবে ওয়াশিংটন ডি.সি.-র ওপরেও।’

‘এসব আমাকে জানাচ্ছেন কেন?’ সন্দেহ নিয়ে জানতে

চাইল রানা।

‘কারণ, আজ দুপুরে যোগাযোগ করেছে মেজর রবিন কার্লটন। ওই পরিত্যক্ত শহরে হেভিলি আর্মড সন্ত্রাসীরা সংখ্যায় ওদের চেয়ে অনেক বেশি। শহরের কেন্দ্রে ঢুকবার পর ওদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। মস্ত বিপদে রয়েছে আপনার বন্ধু।’ বিরতি দিলেন কর্নেল, তারপর আবারও বললেন, ‘আপনি এখন মেজর কার্লটনের কণ্ঠস্বর শুনবেন।’ রিসিভারের ভিতর খট্ আওয়াজ হলো, তারপর কথা বলে উঠল রবিন কার্লটনের রেকর্ড করা কণ্ঠ, “স্যর, পাতাল সাইলোর কাছে কোণঠাসা হয়েছি। মারা গেছে আটজন, বাকি ক’জন রয়ে গেছি না থাকার মতই। জানি না, এ ফাঁদ থেকে বেরুতে পারব কি না। আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। বাইরে থেকে সাহায্য না পেলে মরতে হবে...” রবিনের কণ্ঠ হারিয়ে গেল, বদলে বলে উঠলেন কর্নেল, ‘আমরা চাই না রাশা জানুক আমাদের নেভি ও আর্মির দুই দল কমাণ্ডোকে পাঠানো হয়েছে তাদের দেশের ভিতর।’

চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা।

‘আমরা আপাতত আরেকটা দল পাঠাব। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রস্তুত রিকন ইউনিট এ মুহূর্তে এ রাজ্যের এ অংশে আমাদের হাতে নেই। ভোরের দিকে ডেল্টা ডিটাচমেন্টের এক প্লাটুন রওনা হবে, কিন্তু ততক্ষণে বহুকিছুই ঘটে যেতে পারে সাইবেরিয়ায়। রাশান আর্মির হাতে ধরা পড়তে পারে আমাদের ছেলেরা। সেক্ষেত্রে মস্ত সমস্যা হবে আন্তর্জাতিক আঙিনায়। এর ফলে পারস্পরিক দোষারোপ থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও শুরু হতে পারে। সবই করতে হচ্ছে গোপনে। ...ঠিক হয়েছে, আপনার পরিচিত সুযোগ্য এক নন-কমিশন্ড অফিসারের অধীনে প্রাথমিকভাবে ক’জন মেরিন সৈনিক পাঠাব আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে একটা বি-২ স্টেলথ বমার, কিন্তু

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ করবার সময় তিনি বললেন, আপনি হয়তো যেতে চাইবেন বন্ধুকে উদ্ধার করার জন্য। আমরা আসলে চাইছি আপনি এ দলের নেতৃত্ব নিন। আপনি চাইলে আমরা আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীদেরকে পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় বি-২ স্টেলথ বমারে তুলে দিতে পারি।’

এক মুহূর্ত ভাবল রানা, তারপর বলল, ‘আপনার ফোন নাম্বার দিন। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে ফোন দেব।’

‘লিখে নিন নাম্বার।’ গড়গড় করে সংখ্যাগুলো দু’বার বললেন ভদ্রলোক, তারপর রেখে দিলেন ফোন।

প্যাডে কর্নেলের ফোন নাম্বার তুলে নিয়েছে রানা। এবার অত্যাধুনিক কমপিউটারে খুঁজে নিল ফোন ডিরেকটরি। মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হলো, লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরের এক এয়ার বেস থেকেই ফোন এসেছে।

এরপর দেরি না করে যোগাযোগ করতে চাইল রানা নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে।

ভদ্রলোক এ সময়ে থাকেন নুমা অফিসে।

তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে কল দিল রানা।

একবার রিং হতেই ওদিক থেকে ভেসে এল, ‘হ্যালো, রানা? কী খবর, মাই বয়?’

‘ভাল আছি, স্যর। আপনি কেমন আছেন?’

‘ভাল।’

‘স্যর, আমি ফোন করেছি শিয়োর হতে, আপনি মেরিন কর্নেল বব জেনকিন্সের সঙ্গে কথা বলেছেন।’

‘হ্যাঁ, বিশ মিনিট আগে। যা শুনলাম, তোমার বন্ধু রবিন কার্লটন লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে।’

‘তা জানতেই ফোন করেছিলাম, স্যর,’ বলল রানা।

‘তুমি কি যেতে চাও ওকে সাহায্য করতে?’

‘আমার সঙ্গে কমাণ্ডো যোদ্ধা বলতে মাত্র এক তরুণ,’ বলল রানা। ‘ওকে নিয়ে রওনা হতে পারি। অবশ্য, তার আগে চিফের অনুমতি নিতে হবে।’

‘যদি যেতে চাও, চটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে। শুনলাম, এক ঘণ্টার ভিতর রেডি হবে বি-২ স্টেলথ বমার। ...রাহাতের অনুমতি পেলে দেরি না করেই পৌঁছে যেতে হবে এয়ার বেস এইচ. এন. ম্যাকেঞ্জিতে।’

‘জী,’ বলল রানা। কথা না বাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে ফোন রেখে দিল।

এবার যোগাযোগ করল বিসিআইএর চিফের সরাসরি ফোনে।

‘বলো, রানা?’ গুড়গুড় করে উঠল মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কণ্ঠ।

সংক্ষেপে পরিস্থিতি খুলে বলল রানা। ওর কণ্ঠ বলে দিল, বন্ধুকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হবে।

রানা জানে না, রাহাত খানও চাইছেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের প্রতি ওর আন্তরিকতা যেন কখনও নষ্ট না হয়।

‘বেশ, ঘুরে এসো,’ কয়েক মুহূর্ত পর বললেন তিনি। ‘তোমার সঙ্গের ছেলেটার নাম তো সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির? ওর তো এখনও আর্মির ছুটি শেষ হয়নি। যদি যেতে চায়, মনে করি না কেউ আপত্তি তুলবে।’

তিনি আর কিছুই বলছেন না, কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন রানা কিছু বলে কি না, তারপর রেখে দিলেন ফোন।

এবার রানা এজেন্সির এজেন্ট শাহাদাত হোসেনকে ফোন দিল রানা। শাহাদাতের ছোট অ্যাপার্টমেন্টেই উঠেছে খবির। দু’চার কথায় পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিতেই খবিরকে ধরিয়ে দিল সে।

‘তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও, আধঘণ্টা পর তোমাকে তুলে নেব,’ খবিরকে বলল রানা।

‘কোথায় যেতে হবে, স্যর?’ জানতে চাইল খবির।

‘সাইবেরিয়ায়।’

‘নতুন কোনও মিশন, স্যর?’

‘হ্যাঁ। তবে এবার দেশের জন্য কাজ করছি না।’

‘তাই? ...আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি, স্যর,’ বলল খবির।

মাত্র একটি মিশনে রানার অধীনে কাজ করেই বিপুল শ্রদ্ধা জন্মেছে ওর মানুষটার প্রতি। বুঝে গেছে, মস্ত হৃদয় আছে স্যরের। ওঁর নিখাদ ভালবাসা স্পষ্ট অনুভব করা যায় বুকের ভেতর।

মেরুঝাড় পিছনে ফেলে উত্তর সাইবেরিয়ার এক পরিত্যক্ত সোভিয়েত ইন্সটলেশন লক্ষ্য করে আকাশ চিরে ছুটে চলেছে বি-২ বোমারু বিমান।

সোভিয়েত আমলে ওই আর্মি শহরের নাম ছিল: পাবলো-৯।

ওটা পেনাল অ্যাণ্ড মেইনটেন্যান্স ইন্সটলেশন।

ওখানে কঠোর শ্রম দিত কারাবন্দির।

আর্কটিকের পাবলো-৯ কারাগার-নগরীতে আটটি কম্পাউণ্ড। কমিউনিস্ট আমলে ওসব কম্পাউণ্ডের নাম ছিল: পাবলো-১, পাবলো-২, পাবলো-৩ ইত্যাদি।

মাত্র দু’দিন আগেও পাবলো-৯ ছিল বহুদিন আগে ভুলে যাওয়া সোভিয়েত আউট-স্টেশন— আধা-কারাগার, আধা-মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটি। ওখানে কাজ করতে বাধ্য করা হতো রাজনৈতিক বন্দিদেরকে। এমন অসংখ্য কারাগার-নগরী বা ফ্যাসিলিটি ছড়িয়ে আছে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে। এসব শহর যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি কদর্য। তেলমাখা সব দালান

ও কারখানায় ভর্তি।

উনিশ শ' একানব্বুই সাল পর্যন্ত ওসব কারাগার-নগরীই ছিল ইউএসএসআর-এর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হুৎপিও। কিন্তু এখন সঙ্গত কারণেই এসব কারাখানা-নগরীর বেশিরভাগ পরিত্যক্ত। তুম্বারের ভিতর কোল্ড ওয়ারের ভূতগুলো হারিয়ে যাচ্ছে বিলুপ্তির দিকে।

কিন্তু মাত্র একদিন আগে, বারো তারিখে বদলে গেছে সব।

আমেরিকার কয়েকটি কারাগার থেকে পলাতক সম্পূর্ণ সশস্ত্র এবং প্রশিক্ষিত তিরিশজন বন্দি দখল করে নিয়েছে পরিত্যক্ত পাবলো-৯। গতকাল আমেরিকান সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে, আরব ভূখণ্ডের কয়েকটি রাজধানী এবং ওয়াশিংটন ডি.সি. শহর উড়িয়ে দেবে রাশার তৈরি এসএস-১৮ নিউক্লিয়ার মিসাইল দিয়ে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়লে ওই মিসাইলগুলো রয়ে গিয়েছিল সাইলোর ভিতরেই।

পলাতক বন্দিদের মাত্র দুটো দাবি: এক— তাদের দলের আর সবাইকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিতে হবে। তুলে দিতে হবে বিমানে। অনুসরণ করা চলবে না। দুই— বন্দিদের হাতে দিতে হবে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। তারাই ঠিক করবে কোথায় যাবে বা কাকে দেবে ওই বিপুল অর্থ।

তাদের কথা যদি মেনে না নেয়া হয়, নিউক্লিয়ার মিসাইল হিটের দায়-দায়িত্ব নিতে হবে আমেরিকান সরকারকে।

এরপর থেকে দরদাম করছে আমেরিকান নেগোশিয়েটাররা।

এদিকে আমেরিকান সরকার ব্যাপক খোঁজ-খবর নিয়েছে।

পাবলো-৯ কোল্ড ওয়ার শেষে পরিত্যক্ত সাধারণ কোনও ইন্সটলেশন ছিল না।

মিথ্যা বলছে না পলাতক সন্ত্রাসীরা।

কমিউনিস্ট রেজিম জানায়নি কিছুই গণতান্ত্রিক সরকারকে,

কিন্তু পাবলো-৯-এ রয়ে গেছে ষোলোটি নিউক্লিয়ার মিসাইল।

ওগুলো এসএস-১৮ নিউক্লিয়ার-টিপড ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল— চুপ করে বসে আছে পাতাল সাইলোর ভিতর।

ইউএস স্যাটালাইট যে ছবি তুলেছে, তাতে নিশ্চিত হওয়া গেছে, পাবলো-৯ আসলে কোনও কারখানা-নগরী নয়, ওটা একটি মিসাইল-লঞ্চ সাইট। প্রাক্তন সোভিয়েত আমলের ক্লায়েন্ট দেশগুলো, যেমন সুদান, সিরিয়া, কিউবা এবং ইয়েমেনে এখনও রয়ে গেছে এমন গোপন অনেক সাইট।

পাবলো-৯-এ প্রস্তুত রয়েছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল, এ তথ্য পাওয়ার পর আমেরিকান সরকারের উচ্চমহল থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে: ওই পলাতক সন্ত্রাসীদেরকে যত দ্রুত সম্ভব পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে হবে।

এবং সেজন্য আর্মি এবং নেভির রিকন ইউনিট সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছে।

আর্মির তরফ থেকে গেছে কাউন্টার-টেরোরিস্ট ইউনিট ডেল্টা ডিটাচমেন্ট। ওই দলের নেতৃত্বে রানার পরিচিত টেরোরিজম স্পেশালিস্ট মেজর হার্লি অ্যাটলক। তাদের পাশে লড়বে মেরিন রিকন ইউনিট, নেতৃত্বে রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেজর রবিন কার্লটন।

এই দুই মেজর কোণঠাসা হয়ে পড়ায় এবং আপাতত লস অ্যাঞ্জেলেসে ডেল্টা ডিটাচমেন্ট প্রস্তুত না থাকায়, আর্মি ও নেভি থেকে স্থির করা হয়েছে: আপাতত পাঠানো হবে একটি মেরিন টিম, যেটার দায়িত্বে থাকবে বাংলাদেশের মেজর মাসুদ রানা।

মাঝরাতের পরে রওনা হবে আরেকটি ডেল্টা ডিটাচমেন্ট।

বি-২ স্টেলথ বিমানের ককপিটে দাঁড়িয়ে মেরিন কর্নেল আব্রাহাম কনেলির ব্রিফিংয়ের কথাগুলোই ভাবছিল মাসুদ রানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবারও গিয়ে ঢুকল বম বে-তে, ওর মুখে হাই অলিচ্যুড মুখোশ।

সামনেই মাঝারি আকারের কার্গো কন্টেইনার। ওটার ভিতর রয়েছে ফাস্ট অ্যাটাক ‘কমাণ্ডো স্কাউট’ ভেহিকেল। আমেরিকান মিলিটারিতে আর্মার্ড সব ভেহিকেলের ভিতর ওটা সবচেয়ে হালকা এবং দ্রুতগামী— যেন স্পোর্টস্ কার ও হামভির সংকর।

কন্টেইনারের ভিতর ভেহিকেলের সিটে বসেছে ছয়জন রিকন মেরিন সদস্য এবং বাংলাদেশ আর্মির সার্জেন্ট খবির। রানাসহ আটজনকে নিয়ে এই টিম। সবার পরনে সাদা-ধূসর বডি আর্মার, সাদা-ধূসর হেলমেট, সাদা-ধূসর ব্যাটল ড্রেস ইউনিফর্ম। সামনে চেয়ে আছে সবাই, গম্ভীর মুখ।

সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা, নিজেকে কেমন বুড়ো মনে হলো ওর। এ দলে সবাই তরুণ। কারও বয়স তেইশ হয়নি। আর ওর? আটাশ পেরিয়েছে বেশ ক’দিন আগে।

কাছের তরুণের দিকে চাইল রানা। ‘গিগ্‌স্, হাতের কী অবস্থা?’

বিমানে উঠবার পর দেয়ালে হোঁচট খেয়ে কবজি মচকে গিয়েছিল তরুণের।

‘এখন ঠিক আছে, স্যার,’ উৎসাহ নিয়ে বলল কর্পোরাল গিগ্‌স্। ভীষণ অবাক হয়েছে, আগে কখনও কোনও অফিসারকে এভাবে জুনিয়রদের ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করতে দেখেনি।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। চট করে মনে পড়েছে তিশা ও নিশাতের কথা। এই মিশনে ওরা থাকলে ভাল হতো। কিন্তু তা হওয়ার নয়। ওরা এখন ইউএন-এর তরফ থেকে কঙ্গোর মাউন্ট স্ট্যানলি পাহাড় এলাকায়, লড়ছে অর্থপিশাচ ও রক্তলোভী এক ওয়ার লর্ডের বাহিনীর বিরুদ্ধে।

খবিরের দিকে চাইল রানা। চুপচাপ মানুষ খবির। নাটবল্টুর

মত পোক্ত সৈনিক। বেশিরভাগ সময় কুঁচকে থাকে ওর পুরু দুই ভুরু। দিনকে দিনকে হয়ে উঠছে ওর বাবার মত। অবশ্য, হোসেন আরাফাত দবিরের মত হাসির কথা মুখে আসে না ওর।

চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরুল রানার বুক চিরে। মনে পড়ে গেছে খবিরের বাবার স্মৃতি। দুর্দান্ত যোদ্ধা ছিল সে। কিন্তু মন ছিল ফুলের মত নরম। ছোট্ট একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে ধরা পড়ে শত্রুর হাতে, ভয়ঙ্করভাবে মরতে হয় তাকে। ওই করুণ দৃশ্য এখনও রানার চোখে ভাসে।

মন সরিয়ে নিয়ে ভাইব্রামাইকে স্যাটালাইট রেডিয়োতে যোগাযোগ করল রানা। গলার পাশে ওই ভাইব্রেশন-সেন্সিং মাইক্রোফোন ঠিক ধরবে ওর ভয়েস বক্সকে। জিএসএক্স-৯ নতুন ব্যাণ্ডে আপলিঙ্ক পৌঁছে দেবে স্যাটালাইটে। ইউএস মিলিটারির সর্বাধুনিক কমিউনিকেশন সিস্টেম ওটা। পোর্টেবল জিএসএক্স-৯ ইউনিটের কারণে রানার কণ্ঠ কয়েক হাজার মাইল দূর থেকেও পরিষ্কার শুনবে ইউএস মিলিটারি রিসিভার। আবার ওদিকের কথাও একইরকম স্পষ্ট শুনবে রানা।

‘বেস, স্ট্যালিয়ন থ্রি বলছি, সিচুয়েশন জানান।’

রানার ইয়ারপিসে ভেসে এল একটি কণ্ঠ। ওই স্বর আলাস্কার ম্যাককোল এয়ার ফোর্স বেসের রেডিয়ো অপারেটোরের।

‘স্ট্যালিয়ন থ্রি, বেস থেকে বলছি। শত্রু-দলের সঙ্গে লড়ছে স্ট্যালিয়ন টু ইউনিট। জানিয়েছে, মিসাইল সাইলো দখল করে নিয়েছে ওরা। শত্রুদের বেশ ক’জনকে শেষ করেছে। এখন অপেক্ষা করছে রিইনফোর্সমেন্টের জন্য। স্ট্যালিয়ন টু ইউনিট আরও জানিয়েছে, মেইন মেইনটেন্যান্স বিল্ডিংয়ের ভিতর এখনও রয়ে গেছে কমপক্ষে বারোজন টেরোরিস্ট।’

‘ঠিক আছে,’ বলল রানা। ‘আমাদের পরে যাদের আসার

কথা, তাদের কী খবর?’

‘ফোর্ট লিউইস থেকে আসছে পুরো এক কোম্পানি আর্মি রেঞ্জার। সংখ্যায় এক শ’ জন। আপনারা পৌছবার একঘণ্টার মধ্যেই পৌছবে।’

‘ঠিক আছে।’ সুইচ টিপে রেডিয়ো বন্ধ করল রানা।

আর্মাড স্কাউট ভেহিকেলের ভিতর বলে উঠল লেখক টু খবির, ‘ওরা কী বলেছে, স্যর?’

ঘুরে চাইল রানা। ‘পিছনে আরেকদল আসছে। আর একটু পর ড্রপ করব আমরা।’

পাঁচ মিনিট পর স্টেলথ বোমারু বিমানের পেট থেকে খসে পড়ল বাস্কের মত কার্গো কন্টেইনার, মাটির দিকে রওনা হলো রকেটের গতি তুলে।

কন্টেইনারের ভিতর আর্মাড গাড়ির পেটে বসে আছে রানা ও তার দলের সবাই। সাঁই-সাঁই করে নেমে চলেছে— থরথর করে বেদম কাঁপছে প্রত্যেকে। সিট-বেল্ট না থাকলে ছিটকে পড়ত।

ভেহিকেলের দেয়ালে ঝুলন্ত অ্যান্টিমিটারের দিকে চেয়ে আছে রানা, নীচের দিকে নামছে কাঁটা।

পঞ্চাশ হাজার ফুট...

পঁয়তাল্লিশ হাজার ফুট...

চল্লিশ হাজার... তিরিশ... বিশ... দশ হাজার...

‘পাঁচ হাজার ফুট উপরে এনগেজড হবে প্যারাসুট,’ নিস্পৃহ স্বরে বলল লোডমাস্টার, কর্পোরাল এ. এন. ক্যালভার্ট। ‘ঠিক জায়গায় ল্যান্ডিংয়ের জন্য টার্গেট ঠিক করেছে জিপিএস গাইডেন্স সিস্টেম। এক্সটার্নাল ক্যামেরাগুলো ভেরিফাই করেছে এল যেড ক্রিয়ারেন্স।’

দ্রুত ঘুরতে থাকা অ্যান্টিমিটারের দিকে চোখ রানার।

আট হাজার ফুট।

সাত হাজার ফুট...

ছয় হাজার ফুট...

সব ঠিক থাকলে পাবলো-৯-এর পনেরো মাইল পূবে নামবে ওরা। দিগন্তের ওপাশে ওই ইন্সটলেশনের ফ্যাসিলিটি থেকে ওদেরকে দেখতে পাবে না কেউ।

‘এনগেজিং প্রাইমারি গুট্‌স্‌...’ ঘোষণা করল ক্যালভার্ট।

এবার ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেল পড়ন্ত কণ্টেইনার, ভীষণ চমকে গেল সবাই। খুব দূলে উঠেছে পুরো বাস্ক। সিটে কাঁপতে শুরু করেছে ওরা। ছয় ফিটার সিট-বেল্ট ও রোলবার না থাকলে মারাত্মকভাবে জখম হতো।

তখনই হঠাৎ করে কণ্টেইনারের তিনদিকের প্যারাশুট ভাসিয়ে তুলল ওদেরকে।

‘পরিস্থিতি, ক্যালভার্ট?’ জানতে চাইল রানা।

কণ্টেইনারের এক্সটার্নাল ক্যামেরা ও জয়স্টিক দিয়ে ওদেরকে নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে চলেছে কর্পোরাল।

‘দশ সেকেন্ড। উপত্যকার মাঝে সরু মেটো পথে নেমে আসছি। আপনারা সবাই শক্ত হয়ে বসুন। তিন... দুই... এক...’

জোরালো ধুপ্ আওয়াজ তুলে শক্ত জমিতে নেমে এল কণ্টেইনার। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দিকে খুলে গেল বাস্কের সামনের দেয়াল। ফোর-ভইল-ড্রাইভ কমাণ্ডো স্কাউট লাইট অ্যাটাক ভেহিকেল ও বাস্কের চারপাশের সংকীর্ণ অংশে এসে ঢুকল ফ্যাকাসে আলো। এক সেকেন্ড পর কণ্টেইনারের ভিতর থেকে পিছলে সাইবেরিয়ার ধূসর দিনে বেরিয়ে এল যুদ্ধযান।

কাদাভরা সরু পথে রওনা হয়ে গেল ওরা। দু’পাশে তুষারে ছাওয়া টিলা। ঢালে অসংখ্য ধূসর গাছ, পাতা বলতে কিছুই নেই। সবই কংকালের মত নিখর। তুষারের কার্পেটের এখানে ওখানে ছুরির মত উঠে এসেছে তীক্ষ্ণ কালো সব পাথর।

রক্ষা এলাকা, নিষ্ঠুর। আমাদের নরকের ঠিক উল্টো, ঠাণ্ডা।

আবারও এলাম সাইবেরিয়ায়, মনে মনে বলল রানা। লাইট অ্যাটাক ভেহিকেলের পিছন সিটে বসেছে, বলে উঠল থ্রোট মাইকে: ‘স্ট্যালিয়ন ওয়ান, আমরা স্ট্যালিয়ন থ্রি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?’

ওদিক থেকে কোনও জবাব এল না।

‘আবারও বলছি: স্ট্যালিয়ন ওয়ান, আমরা স্ট্যালিয়ন থ্রি। আমার কথা শুনছেন?’

জবাব নেই কারও তরফ থেকে।

এবার রবিন কার্লটনের মেরিন ইউনিট বা স্ট্যালিয়ন টু-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল রানা।

সাড়া নেই।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে রানা, আলাস্কার বেসের সঙ্গে যোগাযোগ করল স্যাটালাইট ফ্রিকোয়েন্সিতে।

‘বেস, আমরা থ্রি। স্ট্যালিয়ন ওয়ান বা টু-র সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের সঙ্গে আপনাদের কন্টাক্ট আছে?’

‘অ্যাক্সারমেটিভ, মেজর রানা,’ জবাব এল আলাস্কা থেকে। ‘এই তো একটু আগে কথা হয়েছে। তখন...’

হঠাৎ করেই থেমে গেল সিগনাল।

খড়মড় আওয়াজ শুরু হয়েছে ইয়ারপিসে।

‘ক্যালভার্ট?’ কর্পোরালের দিকে চাইল রানা।

‘সরি, বস, সিগনাল হারিয়ে গেছে,’ ভেহিকেলের ওয়াল কম্পোলের কাছ থেকে বলল তরুণ। ‘আমাদের কিছু করার নেই। ...শুনেছিলাম এসব নতুন স্যাটালাইট রিসিভার কখনও নষ্ট হবে না।’

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। জানতে চাইল, ‘কোনও জ্যামিং সিগনাল হতে পারে?’

‘জী-না, স্যর। খোলা রেডিয়ো এয়ারস্পেসে আছি। ওই সিগনাল কেউ ঠেকাতে পারবে না। সমস্যা বোধহয় ওদিকে।’

‘ওদিকে...’ বিড়বিড় করল রানা। এবার ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল, ‘আমরা ভিণ্ডিয়াল রেঞ্জ পৌছব কখন?’

স্কাউটের ড্রাইভার এক মেরিন সার্জেন্ট, নাম বব গ্রেসন। রানা ছাড়া অন্যদের চেয়ে বয়সে বড়। ‘তিরিশ সেকেন্ড পর ওদিক থেকে আমাদেরকে দেখা যাবে, স্যর।’

সামনে ঝুঁকে বসল রানা, গ্রেসনের কাঁধের উপর দিয়ে চাইল।

স্কাউটের নীচে দ্রুত পিছিয়ে চলেছে কালো কাদাময় পথ। ঢালু এক টিলার চূড়ার দিকে চলেছে ওরা।

ওই টিলা পেরুলে সামনে দূরে চোখে পড়বে পাবলো-৯।

তিন

রাশান পরিত্যক্ত ইন্সটলেশনের দিকে যখন ছুটে চলেছে রানা ও তার দল, ওই একই সময়ে আলাস্কার ম্যাককোল এয়ার ফোর্স বেসে জন রেমন নামের তরুণ এক রেডিয়ো অফিসার হতাশ ও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেছে মেরিন এবং বাংলাদেশি টিমের সিগনাল।

কয়েক সেকেন্ড আগে রেমনকে হতবাক করে কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটির সমস্ত যন্ত্র বিকল হয়েছে, দপ্ করে নিভে গেছে কন্সোলের বাতি। অথচ বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে ঘরে।

রেডিয়ো অফিসার কী করবে ভাবছে, এমন সময় খুলে গেল ঘরের দরজা, এসে ঢুকলেন এয়ার রেস ম্যাককোলের কমাণ্ডার।

‘স্যর,’ বলল রেমন, ‘আমরা...’

‘জানি, বাছা,’ নরম স্বরে বললেন সিও। ‘সবই জানি।’

বেস কমাণ্ডারের পিছনে আরেক লোককে দেখল রেডিয়ো অফিসার। নতুন ওই লোককে আগে দেখেনি সে। বয়স্ক, দীর্ঘ এবং শক্তপোক্ত। চুলগুলো গাজর রঙের, মুখটা ছুঁচোর মুখের মত চোখা। পরনে সিভিলিয়ন সুট, একবারও চোখের পাতা পড়ে না তার। শীতল চোখে ঘরের চারপাশ দেখে নিল সে।

বেস কমাণ্ডার নিচু স্বরে বললেন, ‘বাছা, কিছু করার নেই, ইন্টেলিজেন্স ইণ্ডি। আমাদের হাত থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ওই মিশন।’

স্কাউট অ্যাটাক ভেহিকেল শুভ্র তুষারাবৃত টিলার চূড়া পেরুতেই দূরে চাইল রানা। সামনে বিস্তৃত উপত্যকার কোলে অতীত কীর্তি নিয়ে থম মেরে পড়ে আছে পরিত্যক্ত পাবলো-৯— তুষার ছেয়ে দিয়েছে সব দালানের ছাত ও দেয়াল।

হ্যাণ্ডার, স্টোরেজ শেড, বিশাল মেইনটেন্যান্স ওয়্যারহাউস, একপাশে পনেরোতলা কাঁচ-কংক্রিটের দানবীয় অফিস টাওয়ার, নিচু বেশকিছু দালান— এসব নিয়ে শ্রম-নগরী পাবলো-৯।

বিশফুট উঁচু রেয়ার ওয়্যার ফেন্স ঘিরেছে গোটা কম্পাউণ্ডকে। দু’মাইল দূরে রাশার উপকূল, বরফ ঢাকা সৈকতে অবিরাম মাথা কুটছে আর্কটিক সাগরের শীতল ঢেউ।

কোল্ড ওয়ার শেষে সমস্ত গুরুত্ব হারিয়ে বসেছে পাবলো-৯, নিথর পড়ে আছে মূল্যহীন মৃত মানুষের মত।

নগরীর রাস্তাগুলো নির্জন। সবই ঢেকে দিয়েছে শুভ্র তুষার।

রানার ডানদিকে মেইন মেইনটেন্যান্স ওয়্যারহাউস, আকারে

চারটে ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়। ওয়্যারহাউসের এক দেয়ালে হেলান দিয়ে দানবীয় স্তূপ তৈরি করেছে অসংখ্য লোহা-লক্কড় এবং ভাঙা যন্ত্রপাতি।

বামে প্রকাণ্ড ছাউনি, ওখান থেকে ছাতওয়ালা এক সেতু গেছে সুউচ্চ অফিস টাওয়ারে। পনেরোতলা অফিসের ছাত থেকে নেমেছে দীর্ঘ ছোরার মত সব বরফের টুকরো, মাধ্যাকর্ষণকে কাঁচ কলা দেখিয়ে দিব্যি আছে বছরের পর বছর।

শহরের উপর ভয়ানক হামলা করেছে বরফ-শীতল পরিবেশ। তুষার বা বরফ সরিয়ে নেয়ার কেউ নেই, কাজেই ফেটেছে সব দালানের জানালাগুলোর কাঁচ— ওখানে যেন অসংখ্য মাকড়সার জাল। এখানে-ওখানে কাঁচ-ভাঙা সব চৌকো গর্ত, দালানে ঢুকছে হু-হু হাওয়া।

ভুতুড়ে নগরী পাবলো-৯-এর পাতালে কোথাও থম মেরে বসে আছে ষোলোটি নিউক্লিয়ার মিসাইল।

শহরের প্রবেশ-পথের ফটক উড়িয়ে দেয়া হয়েছে আগেই। আশি কিলোমিটার গতি তুলে ওদিক দিয়ে ঢুকে পড়ল রানাদের স্কাউট। ঢালু পথ বেয়ে উঠছে কমপ্লেক্সের দিকে। আর্মাড কারের পিছনে ৭.৬২ এমএম মেশিনগান টারেটে এক মেরিন সৈনিক।

ড্রাইভার গ্রেসনের কাঁধের উপর দিয়ে কমপিউটার স্ক্রিনে চোখ রেখেছে রানা। বলল, ‘লোকেটর দিয়ে খুঁজে দেখো ডেল্টা ও মেরিন ফোর্স কোথায়।’

কি-বোর্ডে টোকা দিতে শুরু করেছে গ্রেসন। কমপিউটার স্ক্রিনে ভেসে উঠল পাবলো-৯-এর মানচিত্র।

এক মানচিত্রে দেখানো হয়েছে কমপ্লেক্সের এক পাশ।

ওদিকে মুখোমুখি দুটো ব্লক।

এক ব্লকে অফিস টাওয়ার, উল্টো ব্লকে প্রকাণ্ড মেইনটেন্যান্স শেড।

দুই বিশাল দালানের প্রথমতলায় বেশকিছু লাল বিন্দু।
বিল্ডিং এবং ছাউনির ভিতর রয়েছে ডেল্টা ও মেরিন
ইউনিট।

কিন্তু মানচিত্রের ভিতর কোথায় যেন গোলমাল রয়েছে।
এক সেকেণ্ড পর বুঝল রানা, টিপটিপ করা লাল বিন্দুগুলো
মোটেও নড়ছে না।

একদম স্থির।

শিরশির করে উঠল রানার ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। ‘সার্জেন্ট
থ্রেসন,’ নিচু স্বরে বলল, ‘গিগ্‌স্, ওয়ারেন আর ক্যালভার্টকে
নিয়ে অফিস টাওয়ার কাভার করবে তুমি। এদিকে খবির, জন ও
টমিকে নিয়ে মেইনটেন্যান্স বিল্ডিং সিকিয়ার করব আমি।’

‘ঠিক আছে, স্যার।’

ফাঁকা সরু এক রাস্তা ধরে চলেছে স্কাউট। ভাসমান কংক্রিট
ওয়াকওয়ের নীচ দিয়ে পেরিয়ে গেল গাড়ি, নানাদিকে ছিটকে
পড়ল তুষারের স্তুপ।

কয়েক সেকেণ্ড পর বিশাল মেইনটেন্যান্স ওয়ারহাউসের
সামনে ছোট পারসোনেল দরজার পাশে থামল আর্মার্ড কার।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল স্কাউটের পিছনের হ্যাচ, স্নো-
ক্যামোফ্লেজ পরনে রানা এবং অন্য তিন যোদ্ধা ছিটকে গিয়ে
দুকল ওয়ারহাউসের সংকীর্ণ পারসোনেল দরজা দিয়ে।

ওরা নেমে যেতেই বাঁক নিয়ে রওনা হলো স্কাউট, চলেছে
কাঁচ ঢাকা অফিস টাওয়ারের দরজা লক্ষ্য করে।

আর্মার্ড কারের চলে যাওয়া লক্ষ্য করেনি রানা, তার আগেই
মেইনটেন্যান্স বিল্ডিংয়ের ভিতর ঢুকে পড়েছে পিস্তল হাতে।

ওর সঙ্গে রয়েছে হেকলার অ্যাণ্ড কচ-এর পুরনো এমপি-৫-
এর পুত্র এমপি-৭। ওটা খাটো ব্যারেলের মেশিন পিস্তল।
ছোটখাটো, কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। এ ছাড়া রয়েছে ডেয়ার্ট

ঈগল সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, কে-বার ছোরা এবং পিঠের হোলস্টারে আর্মালাইট এমএইচ-১২। ওটা দেখতে দুই গ্রিপ-ওয়ালা অস্ত্রের মত—ম্যাগনেটিক গ্র্যাপলিং হুক লঞ্চার।

এই মিশনের জন্য রয়েছে স্ট্যাণ্ডার্ড কিট। বাড়তি গুলি, ছয়টা হাই-পাওয়ার্ড থার্মাইট-অ্যামাটল ডিমোলিশন চার্জ। ওগুলো যে-কোনও বড় দালানকে, তা সে যত বড়ই হোক, সেকেণ্ডে ধসিয়ে দিতে পারবে।

দু'সারি অফিস-ঘরের মাঝের করিডোর দিয়ে চলেছে রানা ও তার দলের তিনজন। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল একটা দরজার সামনে। ওখানে থামল ওরা। কোনও আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করল কান খাড়া করে।

কয়েক সেকেণ্ডে পেরিয়ে গেল, টু শব্দ নেই।

খুব সাবধানে কবাট খুলল রানা।

ওদিকে বিশাল এলাকা, একেবারে ফাঁকা।

এবার এক ধাক্কায় দিয়ে পুরো দরজা খুলে ফেলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেল।

‘ইয়াল্লা!’

ওয়্যারহাউসের এই দরজা থেকে শুরু হয়েছে ওঅর্ক এরিয়া। বহুদূর পর্যন্ত প্রকাণ্ড হ্যাণ্ডার বে, ছাতের ফাটল ধরা কাঁচ দিয়ে আসছে সাইবেরিয়ার ধূসর আকাশের মরাটে আলো।

কিন্তু সাধারণ হ্যাণ্ডার বে নয় এই ওয়্যারহাউস।

পেনাল কলোনির পুরনো কোনও মেইনটেন্যান্স ছাউনিও নয়।

মস্ত দালানের মেঝের চারভাগের তিনভাগ এলাকা জুড়ে কংক্রিটের তৈরি চারকোনা এক বিশাল গম্বুজ।

আর ওই খাদের ভেতর কংক্রিটের ব্লক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিশাল এক মঞ্চ।

তার ওপর নিশ্চিন্তে বসে আছে দু' শ' মিটার লম্বা প্রকাণ্ড এক সাবমেরিন।

সত্যিই মস্ত, কাছ থেকে মনে হলো অস্বাভাবিক বড়।

যেন বসে আছে রাজ-সিংহাসনে।

কংক্রিটের ব্লকগুলো চারপাশের আসবাবপত্র। যেন পিঁপড়ের দল তৈরি করেছে খুদে সব আকৃতি।

গুঁড়ো হওয়া বরফ ও তুষার ছেয়ে দিয়েছে সবকিছুকে।

সাবমেরিনের ওপর দিয়ে গেছে ক্রেন ও ক্যাটওয়াক। সবই দানবীয় শেডের কংক্রিট মেঝেতে মিশেছে। সরু এক গ্যাংওয়ে উঠেছে সাবমেরিনের তিনতলা উঁচু কনিং টাওয়ারে। কিছুটা দূরে শেডের উপরের ব্যালকনি। সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারের মেঝে এবং ব্যালকনির মেঝে একই উচ্চতায়।

বিস্ময় কাটিয়ে এসব তথ্য হজম করতে চাইছে রানা।

তবে প্রথমে চিনল সাবমেরিনটাকে।

ওটা টাইফুন।

ইউএসএসআর-এর নিউক্লিয়ার আর্সেনালবাহী সাগরগামী নৌযানগুলোর ভিতর সেরা যুদ্ধযান ছিল। টাইফুন ক্লাস সাবমেরিনকে বলা চলে প্রতাপশালী কমিউনিস্ট রাজের মুকুট। মাত্র ছয়টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমা লেখকদের বিভিন্ন উপন্যাস এবং হলিউড ছায়াছবি বিখ্যাত করে তুলেছে ওগুলোকে। টাইফুন ক্লাস সাবমেরিন দেখতে দারুণ আকর্ষণীয়, কিন্তু বাস্তবে ভরসা করা যেত না তার ওপর। যন্ত্রাংশ প্রতি মাসেই আপগ্রেড করতে হতো, এ ছাড়া লেগেই ছিল মেইনটেন্যান্স-এর সমস্যা। অবশ্য, ওই জলযান আজ পর্যন্ত মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় সাবমেরিন।

মেইনটেন্যান্স শেডের ভিতর সাবমেরিনের সামনের টর্পেডো বে-তে কাজ করা হচ্ছিল, এমন সময় পরিত্যক্ত হয় শ্রম-নগরী

পাবলো-৯। সাবের নাকের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে টর্পেডো টিউব। একটা একটা করে সরিয়ে নেয়া হয়েছে খোলের প্লেটগুলো।

কিন্তু আর্কটিক সাগর থেকে দুই মাইল ভেতরের কোনও মেইনটেন্যান্স শেডে কীভাবে আসে টাইফুন ক্লাস সাবমেরিন?

এর জবাব নীরবে দিল বিশাল মেইনটেন্যান্স বিল্ডিং।

টাইফুন সাবমেরিনের ড্রাই ডকের আরেক দিকে রানা দেখল, দেয়ালের মত খাড়া, উঁচু, প্রকাণ্ড এক প্লেট-স্টিল সি গেট।

ওই কবাটের ওদিকে রয়ে গেছে সাগরের পানি।

ইনডোর স্টেডিয়ামের মত এক জায়গায় প্রায় জমাট বেঁধেছে থকথকে বরফ। ওই শীতল পানিকে ড্রাই ডক থেকে দূরে রেখেছে বাঁধের মত সি গেট।

রানা আন্দাজ করল, ওই পানির নীচে রয়েছে কোনও সুড়ঙ্গ। সেটা সোজা মাটির নীচ দিয়ে চলে গেছে সাগরে। নইলে মেরামতের জন্য সাবমেরিন আসত না পাবলো-৯-এ। অনেক আগেই ধরা পড়ত আমেরিকান গুপ্তচর স্যাটালাইটের চোখে।

এখন সবই বুঝতে শুরু করেছে রানা।

পাবলো-৯ আর্কটিক উপকূল থেকে পুরো দুই মাইল ভিতরে, এবং মানচিত্রে বলা হয়েছে, ওটা রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য সশ্রম কারাগার।

কিন্তু বাস্তবে এ শহর ছিল টপ সিক্রেট সোভিয়েত সাবমেরিন রিপেয়ার ফ্যাসিলিটি।

অবশ্য, এসব নিয়ে ভাববার বিশেষ সময় পেল না রানা। কারণ ঠিক তখনই দেখল দেহগুলো।

ড্রাই ডকের গহ্বরের পাশেই পড়ে আছে: চারটে দেহ।

পরনে ইউএস সামরিক বাহিনীর তুষারের ফ্যাটিগ, দেহে সব

ধরনের আর্মার... এবং প্রত্যেকে অনেক আগেই মারা গেছে গুলি খেয়ে!

ওদিকের মেঝেতে আছে রক্তের প্রলেপ। লাশের মুখে ছলাৎ করে লেগেছে, বুক, সারাদেহেও। জমে যাওয়ার আগে ছড়িয়ে পড়েছিল মেঝেতে রক্তের স্রোত।

‘শালার মাদারফাকার,’ শ্বাস আটকে ফেলেছে কর্পোরাল টমি ম্যাগান। ‘যিশু! এরা ছিল ডেল্টা ডিটাচমেন্টের যোদ্ধা, সেরাদের সেরা!’ যুবকের চোখে রানার মতই সবুজ রে-ব্যান সানগ্লাস।

চুপ হয়ে গেছে রানা। দেখছে লাশগুলোর ইউনিফর্ম বদল করা হয়েছিল মালিকের ইচ্ছেমত। কারও ডান কাঁধের প্লেট খুলে নেয়া হয়েছে, আবার কারও স্নো গিয়ারের কনুইয়ের আস্তিন নেই।

এ কাজ করে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর ডেল্টা যোদ্ধারা।

গহ্বরের ভিতর আরও দুটো দেহ, ওগুলো পড়ে আছে তিরিশ ফুট নীচে। গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়েছে।

জমে যাওয়া রক্তের চারপাশে শত শত বুলেটের খোসা। পাল্টা গুলি করেছে ডেল্টা যোদ্ধারা।

রানার মনে হলো, এরা একইসময়ে চারপাশে গুলি করেছে, এবং তখনই মারা পড়েছে শত্রুদের হাতে।

অস্পষ্ট ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

‘সব মিলে ক’জন?’

‘এখানে চার। সবুজ টিম বলছি, অফিস টাওয়ারে ঢুকেছে আরও চারজন।’

‘ওদের কথা বাদ দাও। এদের ভেতর মাসুদ রানা কোন্‌জন?’

‘সবুজ সানগ্লাস ।’
‘স্নাইপার রেডি হও । বলামাত্র গুলি করবে ।’

একটা মৃতদেহ মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে রানার ।
প্রায় বরফের মূর্তির মত জমাট বেঁধে গেছে নিজেও ।
প্রথমে দেখতে পায়নি, কারণ দেহের উপরের অংশ বুলছিল
ড্রাই ডকের খাদের ভিতর । কিন্তু এখন পরিষ্কার দেখা গেল ।
সব মিলে ছয়টা দেহ ।
কিন্তু বিশেষ এই মানুষটির মাথা কেটে নেয়া হয়েছে গদান
থেকে ।

দৃঢ় হয়ে গেল চোয়াল, চুপ করে চেয়ে রইল রানা । মুহূর্তের
জন্য বমি এল । তারপর বিদায় নিল বাজে অনুভূতিটা ।

কাটা গদান থেকে বুলছে থকথকে, লালচে মাংস । পুরো
কাটা পড়েছে ইসোফ্যাগাস ও শ্বাসনালী ।

‘হায় আল্লা,’ চাপা স্বরে বলল খবির, পৌঁচেছে রানার পাশে ।
‘আসলে এখানে হচ্ছেটা কী, স্যর?’

বিশাল এই দালানে রানা ও তার তিন সৈনিক ভীষণ অস্বস্তি
নিয়ে দেখছে চারপাশ । ড্রাই ডকের পারে ও নীচে লাশ ।

কিন্তু ওরা জানে না, ওদের উপর চোখ রেখেছে কমপক্ষে
বিশজন লোক । তারা রয়েছে হল-এর কি স্ট্যাট্যেজিক পয়েন্ট-
এ । প্রত্যেকের পরনে একই পোশাক— স্নো ফ্যাটিগ । কিন্তু
হাতে বিভিন্ন অস্ত্র ।

নীরব উত্তেজনা নিয়ে আমেরিকান ও বাংলাদেশি যোদ্ধাদের
দিকে চেয়ে আছে তারা, কমাণ্ডার একবার খুন করতে নির্দেশ
দিলেই শুরু হবে হত্যাযজ্ঞ ।

মস্তকহীন দেহের পাশে বসেছে মাসুদ রানা, লাশটা দেখছে ।

ডেল্টা ডিট্যাচমেন্টের যোদ্ধাদের সঙ্গে আইডি ট্যাগ বা প্যাচ

নেই। কিন্তু ট্যাগ বা প্যাচ লাগল না রানার, ও ভাল করেই চেনে।
বিশেষ এই লোকটিকে। সবই বলে দিল দেহের গড়ন।

এ মেজর হার্লি অ্যাটলক, ডেল্টা ডিটাচমেন্টের নেতা।

চারপাশ একবার দেখে নিল রানা। আশপাশে কোথাও দেখা
গেল না মাথাটা। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। বিসিআই-এর একটি
খবর মনে পড়ে গেছে। আবারও হার্লি অ্যাটলকের উপর স্থির
হলো ওর চোখ। শুধু যে লোকটার মাথা কাটা হয়েছে, তা নয়,
নিয়ে যাওয়া হয়েছে...

‘মেজর রানা,’ ওর ইয়ার পিসে বিস্ফোরিত হলো একটা
কণ্ঠ। ‘সার্জেন্ট থ্রেসন বলছি। আমরা অফিস টাওয়ারে। যা
দেখছি বিশ্বাস করবেন না।’

‘দেখো বিশ্বাস করি কি না। জানাও, কী হয়েছে।’

‘অফিস টাওয়ারে আমাদের আগে আসা মেরিনরা সবাই
শেষ। আর, স্যর... মেজর কার্লটনের মাথা কেটে নিয়ে গেছে
কোন্ এক কুকুরের বাচ্চা!’

মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশীতল স্রোত নামল রানার। ঝড়ের
গতিতে ভাবতে শুরু করেছে। চোখ বোলাচ্ছে চারপাশের হল-
এ। ফাটল ধরা জানালাগুলোর কাঁচ সাত রঙা আলো ফেলছে
বরফে ছাওয়া ধূসর দেয়ালে।

পাবলো-৯ পরিত্যক্ত, কেউ নেই, কিন্তু...

কোথাও নেই আমেরিকান সন্ত্রাসীরা...

হঠাৎ করেই হারিয়েছে রেডিয়ো কন্ট্যাক্ট। এর অর্থ...

ডেল্টা ও মেরিন ফোর্সের সবাই খতম। শুধু তাই নয়, হার্লি
অ্যাটলক ও রবিন কার্লটনের মাথা কেটে নেয়া হয়েছে।

এখন বুঝতে শুরু করেছে মাসুদ রানা।

‘সার্জেন্ট থ্রেসন!’ থ্রোট-মাইকে নিচু স্বরে বলল রানা।
‘এন্ফুগি এসো! ফাঁদে ফেলেছে, বন্ধ খাঁচায় আটকে ফেলেছে

আমাদের!’

কথার ফাঁকে রানার চোখ গিয়ে পড়েছে ডকের হল-এ ছোট তুষারের এক স্তূপের উপর। ওমনি দেখেছে ওটার পিছন থেকে উঁকি দিয়েছে এক লোক। পোশাক ক্যামোফ্লেজ করা, হাতে কোল্ট কমাণ্ডো অ্যাসল্ট রাইফেল। তাক করেছে ওরই মাথা লক্ষ্য করে!

ঠিক তখনই হল-এর চারপাশ থেকে শুরু করল গুলি। বিশজন আততায়ীর গুলির তোড়ে মুহূর্তে ড্রাই ডক ফ্যাসিলিটি হয়ে উঠল রণক্ষেত্র।

বাঁচবার জন্য ডাইভ দিয়ে আরেক পাশে গিয়ে পড়ল রানা, আর তখনই ওর মাথার উপর দিয়ে হুশ-হুশ আওয়াজ তুলে বেরোল দুটো বুলেট।

রানার মতই একই কাজ করেছে লেখক টু খবির ও কর্পোরাল জন হুক, ডাইভ দিয়ে পড়েছে ডেল্টা যোদ্ধাদের লাশের মাঝে। মেঝেতে লেগে রঙিন স্ফুলিঙ্গ তুলে নানাদিকে ছুটছে অজস্র বুলেট।

কিন্তু কপাল মন্দ দ্বিতীয় মেরিন টিমি ম্যাগানের। চোখে রানার মতই সবুজ রে-ব্যান সানগ্লাস। কোনও সুযোগই পেল না সে, অন্তত বিশটা গুলি বিঁধল ওর বুক-পেটে। ঝটকা দিয়ে নাচতে নাচতে পিছিয়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল লাশটা মেঝেতে।

‘জলদি!’ গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিল রানা, ‘সাবমেরিনের নীচে!’ খবির ও জন হুককে প্রায় ক্র্যাশ-ট্যাকল করল ও, সরিয়ে দিল লাইন অভ ফায়ার থেকে। গড়াতে শুরু করেছে তিনজন, উপরের এই পার থেকে খসে পড়ল ড্রাই ডকের দিকে। এক সেকেণ্ড পর উপরের মেঝে খুবলে নিয়ে ওদের মাথার উপর দিয়ে গেল কয়েক শ’ গুলি।

রানা এবং ওর সৈনিকরা নীচে পড়ছে, তবে হেভিলি আর্মড

ফোর্সের নেতার চোখের আড়ালে সরতে পারল না।

কমাণ্ডারের নাম কার্ট কে. এবেলহার্ড, অতীতে সাউথ আফ্রিকান এলিট রেকনেসেন্স কমাণ্ডো বাহিনীর মেজর ছিল।

তা হলে এই সে বিখ্যাত মাসুদ রানা, ভাবল এবেলহার্ড। দ্রুত পড়তে দেখছে সে বাঙালি কমাণ্ডোকে। এ লোকই শেষ করেছে ইউটাহ স্টেটে বিজ্ঞানী, কর্নেল বয়েস ইংগিল্‌সকে। সত্যিই দারুণ রিফ্লেক্স লোকটার! কিন্তু, বাছা...

নিজের অবস্থান থেকে ধীরেসুস্থে নেমে এল কার্ট কে. এবেলহার্ড। সত্যিকারের নক্ষত্র ছিল সে রেকণ্ডো বাহিনীতে। প্রাক্তন ওই বর্ণবাদী বাহিনীর অনেকেই আজও তাকে মস্ত হিরো মনে করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতন্ত্র এলেও প্রথমে অনেকেই বুঝতে পারেনি এবেলহার্ড আসলে রক্তপিশাচ ও বর্ণবাদী। কিন্তু তারপর কালো এক সৈনিককে বুট ক্যাম্পে খুন করে বসল সে। যুবক সৈনিককে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড ট্রেনিংয়ের সময়। এ কাজ আগেও করেছে, কিন্তু শেষবার ধরা পড়ল।

* আসলে কার্ট কে. এবেলহার্ডের মত সৈনিক কখনও খুন না করে থাকতে পারে না। সে সাইকোপ্যাথ, সোশিওপ্যাথ, খুনি—সামরিক বাহিনী থেকে জোর করে অবসর দেয়া হলে বাধ্য হয়ে সরে যেতে হলো তাকে। জঙ্গি দেশ পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনও দেশেই সামরিক বাহিনীতে রাখা হয় না তার মত উন্মাদ বেজন্মাদের।

অবসর নেয়ার কিছু দিনের ভিতর এবেলহার্ডকে ভাড়া করা হলো বিপুল টাকার বিনিময়ে। এই বিশেষ ইউনিটের কমাণ্ড তুলে দেয়া হলো তার হাতে। এটি হয়ে উঠল দুনিয়ার সেরা মার্সেনারি অর্গানাইজেশনের স্পেশাল অপারেশন টিম। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অপারেট করে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী, বর্ণবাদী ওই কোম্পানি। নাম: একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ বা ই.এস.ওয়াই.।

ই.এস.ওয়াই. বেশিরভাগ সময় আফ্রিকান সৈরশাসকদের হয়ে কাজ করে, বদলে তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে ডায়মণ্ড মাইনিঙের মুনাফার একটা বড় অংশ। এ ছাড়া, সুযোগ পেলেই ই.এস.ওয়াই লোভনীয় সব আন্তর্জাতিক বাউন্টি হান্ট-এ অংশ নেয়।

আর আজ যে দারুণ আকর্ষণীয় বাউন্টি হান্ট শুরু হয়েছে, তাতে অংশ না নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সতেরোজন লোককে শেষ করে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। প্রতিটা মাথার জন্য মিলবে তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার করে। কাউন্সিলে ই.এস.ওয়াই-র লোক ছিল, আর তার মাধ্যমে খবর পেয়ে এরই ভিতর দুটো মাথা জোগাড় করে ফেলেছে তারা। তৃতীয় মাথাটাও আজই একটু পরে তার হাতে আসবে।

এবেলহার্ডের পাশে থামল তার রেডিয়ো অপারেটর। ‘স্যর, সবুজ টিম বলছে তারা অফিস টাওয়ারে মেরিনদের সঙ্গে লড়তে শুরু করেছে।’

আস্তু করে নড করল এবেলহার্ড। ‘তাদের জানাও, বাজ শেষ হলে যেন ব্রিজ ধরে ড্রাই ডকে ফেরে।’

‘স্যর, আরেকটা কথা,’ বলল রেডিয়ো ম্যান।

‘বলো?’

‘র্যানডল্ফ ছাদে, বলছে এক্সটার্নাল রেইডারে পাওয়া যাচ্ছে দুটো ইনকামিং সিগনাল।’ চুপ হয়ে গেল যুবক। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, ‘দুই সিগনেচার থেকে ওর মনে হয়েছে, ওই দুই যুদ্ধবিমান রাশান। একটাতে রয়েছে বাউন্টি হান্টার পোলিশ, অন্যটাতে মিস্টার ফগ।’

‘কতটা দূরে তারা?’

‘পোলিশের আসতে লাগবে পঁচিশ মিনিট। আর মিস্টার ফগের আসতে পনেরো মিনিট।’

নীচের ঠোট কামড়ে ধরল এবেলহার্ড। পোলিশ ভয়ঙ্কর চতুর বাউন্টি হান্টার। সত্যিকারের হারামজাদা লোক। আর মিস্টার ফগ রহস্যময় এক বৈজ্ঞানিক। আগেও একবার এক মেয়েকে কেড়ে নিয়েছিল ওদের হাত থেকে। কেউ জানে না সে দেখতে কেমন, বা কোথায় তার আস্তানা। শুধু জানা গেছে, সে সুঠামদেহী, চোখে থাকে সানগ্লাস। পরনে কালো আলখেল্লা।

এ ধরনের মিশন মন থেকে ঘৃণা করে এবেলহার্ড। ঘৃণা করে বাউন্টি হান্ট। সঠিক সময়ে টার্গেট দখল করলেও চুতিয়া শালার বাউন্টি হান্টাররা হাজির হয়, ছোঁ দিয়ে কেড়ে নেয় শিকার। সোজা কথায়, এক বাউন্টি হান্টার চুরি করে আরেক বাউন্টি হান্টারের মাল। হাতে পেলেই গিয়ে টাকা বুঝে নিয়ে উধাও হয়।

সামনা-সামনি দুই দল মিলিটারি লড়লে যে দল জিতেছে তাদেরকে বিজয়ী ধরে নেয়া যায়, কিন্তু বাউন্টি হান্ট জিনিসটা ঠিক তেমন নয়। বাউন্টি হান্ট-এ সে জিতবে, যে সঠিক সময়ে ফিরতে পারবে পুরস্কার নিয়ে।

ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল এবেলহার্ড: ‘পোলিশকে ঠেকাতে পারব আমি। ও একটা গুণ্ডার কিন্তু আমিও কম না। আমরা ওকে এদিকে ভিড়তেই দেব না। কিন্তু ফগ ব্যাটা... সে বড় ধরনের সমস্যা করতে পারে।’

সাবমেরিন গহ্বরের দিকে চাইল ই.এস.ওয়াই. কমাণ্ডার। মাইক্রোফোনে বলল, ‘যা করার তাড়াতাড়ি করো। দেরি না করে মাসুদ রানার মুণ্ড নিয়ে এসো আমার কাছে।’

ড্রাই ডকের দেয়াল ঘেঁষে পড়ছে মাসুদ রানা, হোসেন আরাফাত খবির ও কর্পোরাল জন হক। ওরা তিরিশ ফুট নীচে ধপ্প করে পড়ল ডেল্টা ডিটাচমেন্টের দুই যোদ্ধার লাশের উপর।

‘জলদি! মুভ! মুভ! মুভ!’

কংক্রিটের ইঁটের উপর বসে আছে বিশাল কালো টাইফুন সাবমেরিন, দুই যোদ্ধাকে ওটার নীচে টেনে নিল রানা।

একেকটা কংক্রিটের ব্লক ছোটখাট গাড়ির সমান। এমন চারটে সারি ওজন নিয়েছে বিশাল সাবমেরিনের। ফলে টাইফুনের নীচে তৈরি হয়েছে সরু সব গলি। মাথার উপর সাবমেরিনের কালো স্টিলের খোল।

আঁধার গলির ভিতর দিয়ে ঐকে বেকে ছুটতে শুরু করেছে রানা, তারই ফাঁকে থ্রোট-মাইকে বলে উঠল: 'গ্রেসন! সার্জেন্ট গ্রেসন! শুনছ?'

ব্যস্ত কণ্ঠে ভেসে এল পাল্টা জবাব: 'মেজর! শিট! বৃষ্টির মত গুলি করছে! আর সবাই শেষ, স্যার। আমি... বাজে ভাবে আহত! সরে যেতে পারব না! দুঃখিত, স্যার, আমার পক্ষে আর... ওহ... না...'

ওদিকে পটকার মত কয়েকটা গুলির আওয়াজ শুনল রানা। পরক্ষণে কেটে গেল সিগনাল।

পিছনে মোলায়েম কয়েকটা আওয়াজ শুনল রানা। চরকির মত ঘুরেই এমপি-৭ তুলল। কংক্রিটের ব্লকের তৈরি জঙ্গলের ওদিকে দড়ি বেয়ে গহ্বরে নামছে শত্রুদল।

পিছনে খবির ও জনকে নিয়ে সামনে বাড়ল রানা। ছায়াময় গলির মত জায়গা। মাথার উপর টাইফুন সাবমেরিন। পিছন থেকে আসতে শুরু করেছে বুলেট।

ওদের পিছনে কংক্রিটের গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে শত্রু। সংখ্যায় কমপক্ষে দশজন। রণকৌশল অনুযায়ী একে অপরকে কাভার দিচ্ছে, সামনে বাড়ছে ছুটে ছুটে। দীর্ঘ গলিগুলোর ভিতর ভারী গুলিবর্ষণ চলছে। ড্রাই ডকের শেষে সি গেটের দিকে ছুটছে রানার দল।

দৌড়ের ফাঁকে শত্রুদের দেখছে রানা। বুঝে নিচ্ছে তাদের

ট্যাকটিক্স। নজর রেখেছে তাদের অস্ত্র কী ধরনের। স্ট্যাণ্ডার্ড রণকৌশল ব্যবহার করছে লোকগুলো। তাড়িয়ে নিয়ে শত্রুকে কোণঠাসা করতে চাইছে। কিন্তু তাদের অস্ত্রগুলো...

‘এরা কারা?’ রানার পাশে ছুটতে ছুটতে প্রশ্ন করল খবির।

‘জানি না,’ বলল রানা। ‘তবে আঁচ করছি। কথাটা শুনতে ভাল লাগবে না তোমার।’

‘বলুন তাও?’

‘ওদের অস্ত্রগুলোর দিকে খেয়াল দাও।’

চট করে পিছনের আততায়ীদের অস্ত্রের উপর চোখ বুলিয়ে নিল খবির। সাদা মুখোশ পরা কয়েকজনের হাতে এমপি-৫, আবার অন্যদের কাছে ফ্রেঞ্চ ফ্যামাস অ্যাসল্ট রাইফেল বা আমেরিকান কোল্ট কমাণ্ডো রাইফেল। দুয়েক জনের সঙ্গে একে-৪৭ বা চায়নিজ একে-৫৬।

‘দেখেছ অস্ত্র?’ ছোট্টার ফাঁকে বলল রানা। ‘নানান জিনিস ওদের কাছে।’

‘কুকুরগুলো তা হলে মার্সেনারি?’ জানতে চাইল খবির।

‘তাই তো মনে হচ্ছে।’

‘কিন্তু আমাদের খুন করতে চায় কেন?’

‘এখনও জানি না।’

‘আমরা এখন কী করব?’ অসহায় সুরে বলল কর্পোরাল জন হক।

‘সেটাই ভাবছি,’ বলল রানা। চট করে দেখল মাথার উপরে সাবমেরিনের স্টিলের খোল। ওর চোখ খুঁজছে এসকেপ রুট।

একটা কংক্রিটের ব্লকে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, উঁকি দিল ওদিকে। দূরে দেখা গেল ড্রাই ডক পিট। এ গহ্বরের পূবে সাগরের বরফ-ঠাণ্ডা বিপুল পানিকে সরিয়ে রেখেছে ওই উঁচু স্টিলের সি গেট।

ড্রাই ডকের মেকানিক্স নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে রানা।

মস্ত টাইফুন সাবমেরিনকে এই ডকে আনতে গিয়ে নামাতে হয়েছে সি গেট। পানিতে টইটমুর হয়েছে ড্রাই ডক। নইলে ভিতরে আসত না ইয়াজদাহা নৌযান। কাজটা শেষে আবারও উঁচু করা হয়েছে সি গেট, তারপর আবারও পানি সরিয়ে খালি করেছে ড্রাই ডক। সে সময় কংক্রিটের ব্লকগুলোর উপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে সাবমেরিন। নৌযানের উপর কাজ শুরু করবার আগে পরিচ্ছন্ন, শুকনো পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হয়েছে।

আর ওই সি গেট...

এখন তীক্ষ্ণ চোখে ওদিকটা দেখছে রানা। আঁচ করছে ওই কবাটের ওপাশে রয়ে গেছে সাগরের মস্ত সুড়ঙ্গ। এবার উল্টো দিক দেখল রানা। ওদিকে সাবমেরিনের বো। ওখানেই দেখল ওদের বাঁচবার একমাত্র উপায়।

খবির ও জনের দিকে ফিরল রানা, জানতে চাইল, 'তোমাদের সঙ্গে ম্যাগ্নেট আছে?'

'জী, স্যর,' বলল জন হক।

'আছে, স্যর,' বলল খবির।

'জিনিসটা ব্যবহারের জন্যে তৈরি থাকো,' বলল রানা। চট করে আবারও দেখল প্রকাণ্ড স্টিলের সি গেট। ওটার উচ্চতা প্রায় তিনতলা, চওড়ায় কমপক্ষে নব্বুই ফুট। পিঠের হোলস্টার থেকে ম্যাগ্নেট বের করে ফেলল ও।

'আমরা কি ওই পথে বেরোব, স্যর?' জানতে চাইল জন হক, ভয়ে কেঁপে গেল সাঁতার না জানা আমেরিকান সৈনিকের গলা।

'না। উল্টো দিকে যাব। কিন্তু সেটা করতে হলে আগে উড়িয়ে দিতে হবে সি গেট।'

'সি গেট উড়িয়ে দেবেন?' হাঁ হয়ে গেল জন হক। চট করে

খবিরের দিকে চাইল।

কাঁধ ঝাঁকাল খবির। ‘ওঁর কৌশল অন্যরকম।’

ঠিক তখনই ওদের চারপাশের কংক্রিটের ব্লকে লাগল এক পশলা গুলি। সি গেটের দিক থেকে এসেছে।

কাভার নেয়ার জন্য উবু হলো রানা, চট করে উঁকি দিল ওদিকটা। পিটের ওদিকে নেমে পড়েছে কমপক্ষে আরও দশজন মার্সেনারি সৈনিক।

রানা টের পেল, শিরিষের মত শুকিয়ে গেছে গলা। পিটের মাঝখানে ওরা, আর ওদের দু’পাশে রক্ত-লোভী লোকগুলো।

এগুতে শুরু করেছে মার্সেনারিদের নতুন দল।

‘যা করার এখনই,’ খবির ও হককে বলল রানা।

চার

ড্রাই ডকের উপর থেকে নজর রেখেছে কার্ট কে. এবেলহার্ড। দেখল, মাসুদ রানা এবং ওর দুই সঙ্গীকে দু’পাশ থেকে চেপে ধরতে চলেছে মার্সেনারিরা।

শীতল হাসি হাসল কার্ট কে. এবেলহার্ড।

বড় সহজেই লোকটাকে মুঠোয় পাওয়া গেছে।

কমব্যাট ওয়েবিং থেকে দুটো থার্মাইট-অ্যামাটল ডেমোলিশন চার্জ বের করেছে রানা। চাপা স্বরে বলল, ‘খবির, হক, ম্যাগনক তৈরি?’

মুখে জবাব না দিয়ে ম্যাগলক বের করে ফেলেছে দুই সৈনিক।

‘এবার মনোযোগ দাও,’ টাইফুন সাবমেরিনের পোর্ট সাইটে সরে গেল রানা। ম্যাগলক তুলেই ফায়ার করল। এত কম রেঞ্জে তাক ফক্ষে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

জোরাল শব্দ হলো: ‘ঠং!’

রানার মত একই কাজ করল খবির ও হক।

‘ঠং! ঠং!’ দুই আওয়াজ ছড়িয়ে গেল মস্ত ড্রাই ডকে।

সাবমেরিনের পিছন দিক দেখে নিল রানা। বলল, ‘জলোচ্ছ্বাস এলেই ম্যাগলকের দড়ি গুটিয়ে নেবে। উঠবে সাবমেরিনের বাইরের দিক দিয়ে।’

‘জলোচ্ছ্বাস?’ বলল হক, ‘কিন্তু জলোচ্ছ্বাস আসবে কোথা...’

জবাব দিল না রানা। হাতের দুই ডেমোলিশন চার্জ দেখাল। চট করে টিপে দিল টাইমারের সিলেক্টর সুইচ।

থার্মাইট-অ্যামাটল চার্জে তিন রঙের টাইমার সুইচ থাকে— লাল, সবুজ এবং নীল। লাল সুইচের কারণে পাঁচ সেকেন্ড সময় পাওয়া যায়। সবুজ সুইচ সময় দেবে তিরিশ সেকেন্ড। এবং নীল পুরো এক মিনিট।

রানা টিপেছে লাল সুইচ।

দেরি না করে ছুঁড়ে দিল বেসবলের মত। উড়ে গেল ওগুলো ড্রাই ডকের মাঝ দিয়ে। মার্সেনারিদের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে লাগল প্লেট-স্টিলের সি গেটে। ঠনাৎ করে পড়ল গেটের পায়ের কাছে।

ওদিকটাই গেটের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। গেট ওখানে মিশেছে কংক্রিটের ডানদিকের দেয়ালে।

পাঁচ সেকেন্ড...

চার...

‘ভাগ্য সময় ব্যথা লাগবে...’ বলল খবির। ম্যাগহুকের দড়ি পেঁচিয়ে নিল বাম বাহুতে। দেখাদেখি একই কাজ করল জন হক।

‘ওয়ান!’ ফিসফিস করল রানা। চেয়ে আছে বাঁধের দিকে। ‘এবার!’

বুম্ করে ফাটল বোমা।

থার্মাইট-অ্যামাটল ডেমেলিশন চার্জের দুই বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিল গোটা ড্রাই ডক বিল্ডিংয়ের দেয়াল।

ঝলসে উঠল অত্যাঙ্গুল সাদা আলো। সি গেট দেখে মনে হলো সান্ধাৎ নরকের দরজা। চারপাশে ছিটকে গেল কটুগন্ধী ধোঁয়া, কংক্রিট ব্লকগুলোর গলির মাঝ দিয়ে ছুটল। ধোঁয়া ঘিরে ফেলেছে কাছের আততায়ীদেরকে। চলার পথে যা পেল, ঢেকে ফেলল। ঢাকা পড়ল রানা, খবির ও হক।

এক সেকেণ্ডের জন্য নামল থমথমে নীরবতা।

পরক্ষণে বিকট কড়াৎ! শব্দ হলো। সাগরের বিপুল পানির চাপে ভেঙে পড়েছে ক্ষতিগ্রস্ত সি গেট। কমপক্ষে এক শ’ মিলিয়ন লিটার পানি ঢুকল গহ্বরের ভিতর। ধাক্কা খেয়ে সরে গেল ধোঁয়া, সে জায়গা নিল মস্ত এক জলপ্রাচীর।

গা শিউরে দেয়া আওয়াজ তুলছে আত্মসী সাগরের পানি। গহ্বর ধরে ছুটে এল গুড়-গুড় শব্দ তুলে। পাক খেয়ে উঠছে ফেনা। জলপ্রাচীর গড়িয়ে আসছে অ্যানাকোণ্ডা সাপের মত।

উড়ে গেল কাছের মার্সেনারিরা, তাদেরকে তলিয়ে দিয়ে ছুটে গেল পানির দেয়াল পশ্চিমদিক লক্ষ্য করে। যে-কোনও সময়ে চাপা পড়বে রানা, খবির ও হক।

পরের সেকেণ্ডে ওদেরকে গিলে নিল সাগর-দানব। এক মুহূর্ত আগে ওরা যেখানে ছিল, সেখান থেকে ছোঁ দিয়ে তুলল। উপরের খোলে ঠুকে গেল মাথা, ছেঁড়া পুতুলের মত ছিটকে

চলেছে ওরা টাইফুন সাবমেরিনের বো-র দিকে ।

রক্ষা পেল না মার্সেনারিদের দ্বিতীয় দলও । গড়িয়ে যাওয়া পানির দেয়াল ছিটকে ফেলল তাদেরকে ড্রাই ডকের কংক্রিটের দেয়ালে । তলিয়ে গেল বেশিরভাগ মার্সেনারি । ভরে উঠতে শুরু করেছে দু' শ' মিটার দৈর্ঘ্যের পিট ।

অবশ্য, রানারা কেউ ছিটকে পড়ল না কংক্রিট দেয়ালে ।

সিংহের মত গর্জনরত পানির দেয়াল ওদেরকে তুলে নিতেই শক্ত করে ধরেছে ওরা ম্যাগলুক লঞ্চার, টিপে দিয়েছে ম্যাগনেটিক লকের সুইচ । বিদ্যুৎধেগে দড়ি গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে লঞ্চার ।

টাইফুন সাবমেরিনের বো-র পাশে পৌঁছে যেতেই চেষ্টা করে উঠল রানা, 'দড়ি গুটিয়ে নেয়া বন্ধ করো!'

ম্যাগলুকের গ্রিপের বাটন টিপে দিয়েছে নিজে । ফলে দড়ি টেনে নেয়া বন্ধ করেছে ক্ল্যাম্পিং মেকানিজম ।

রানার মত একই কাজ করল খবির ও হক ।

ঝটকা খেয়ে থেমে গেছে ওরা টাইফুন সাবমেরিনের বো-র পাশে । চারপাশে খলখল করে হাসছে সাগর । ওদেরকে ভিজিয়ে দিচ্ছে লক্ষ মিহি জলকণা ।

পাশেই টাইফুন সাবমেরিনের পোর্ট সাইডের খোলা টর্পেডো টিউব আগেই দেখেছে রানা ।

পাবলো-৯ পরিত্যক্ত হওয়ার সময় ওটা রিপেয়ার হচ্ছিল ।

এখন ছুটন্ত পানির সামান্য উপরে খোলা টর্পেডো টিউব ।

'ভেতরে ঢোকো!' মাইকে চেষ্টা করল রানা । 'টিউবের ভেতর!'

পানির উচ্চতা বাড়ছে । রানার নির্দেশে সাপের মত পিছলে টর্পেডো টিউবে ঢুকল খবির ও হক । এগুতে হচ্ছে জলস্রোত কেটে । সাবমেরিনের ভিতর টুকে পড়েছে সাগর ।

কয়েক সেকেন্ড পর নীরবতা নামল চারপাশে ।

সবার শেষে টর্পেডো টিউবে ঢুকেছে রানা। খাটো সুড়ঙ্গ শেষে নিজেকে আবিষ্কার করল সোভিয়েত টাইফুন-ক্লাস ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিনের পেটে।

শীতল স্টিলের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে ওরা।

ঘরের মাঝে টর্পেডোর কয়েক সারি ব্যাক, সব খালি। ছাতে পাইপের সারি। বন্ধ এ পরিবেশে আজও রয়ে গেছে ভয়ের গন্ধ, সাবমেরিনারদের ঘামের গন্ধ।

দুই খোলা টর্পেডো টিউব দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে মোটা দুই জলের ধারা। ক্রমেই ভরে উঠছে ঘর।

প্রায়াক্রমিক পরিবেশ। আলো বলতে টর্পেডো টিউব দিয়ে আসা সামান্য ধূসর আভা।

এমপি-৭-এর ব্যারেলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে নিল ওরা।

‘এসো,’ দ্রুত টর্পেডো রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। সামনে এগোচ্ছে হাঁটু পানি ভেঙে।

ওরা চলে এল টাইফুন সাবমেরিনের ভয় জাগানো সাইলো হল-এ।

দীর্ঘ ব্যারাকের মত ঘর, অনেক উপরে ছাত। পাশাপাশি বিশটি প্রকাণ্ড সাইলো, মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত। দেখলে কেন যেন মনে হয় দানবীয় চুরুট। সাইলোর পাশে নিজেদেরকে বামন মনে হলো ওদের।

এসব সাইলো পাশ কাটিয়ে ছুটতে শুরু করেছে রানা। খেয়াল করল, কোনও কোনও সাইলোর হ্যাচ খোলা।

ভিতরে মিসাইল নেই।

তবে কমপক্ষে ছয়টা সাইলোর হ্যাচ পুরোপুরি বন্ধ।

আন্দাজ করা যায় ভিতরে রয়ে গেছে মিসাইল।

‘এবার কী, স্যর?’ জানতে চাইল খবির।

‘কন্ট্রোল রুম!’ বলল রানা, ‘এদের ব্যাপারে তথ্য দরকার।’

কাছের রাং-ল্যাডার বেয়ে উঠল রানা, চলে এল ফ্লাই-এ।
তিরিশ সেকেণ্ড পর পৌছে গেল টাইফুন সাবমেরিনের
কন্ট্রোল রুমে।

চারপাশে ধুলো। ঘরের প্রতি কোণে মাকড়সার ঝুল। রানা,
খবির ও হকের ফ্ল্যাশলাইটের রশ্মিতে দেখা গেল, কোথাও
কোথাও ধুলোর তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে চকচকে ইম্পাতের
কসোল।

কমাণ্ড প্র্যাটফর্মে গিয়ে থামল রানা, ওখানেই পেরিস্কোপ।
মেঝে থেকে স্কোপ তুলল ও, ঘুরে চাইল খবিরের দিকে।

‘দেখো তো বিদ্যুৎ পাওয়া যায় কি না। সাবমেরিনের সঙ্গে
বেসের ইলেকট্রিকাল কানেকশন থাকার কথা। ওমনিবাস
সেন্ট্রাল কন্ট্রোল সিস্টেমের সুইচ খুঁজে বের করো। ওটা অন
করলেই পাব ইএসএম আর রেডিয়ো। অ্যান্টেনা অন লাইনে
থাকার কথা।’

‘জী,’ খুঁজতে শুরু করেছে খবির।

পেরিস্কোপ পুরো উপরে তোলা। জিনিসটা প্রাথমিক পর্যায়ে
রয়ে গেছে, বৈদ্যুতিক শক্তি লাগে না। স্কোপে চোখ রাখল রানা।

পরিস্কার দেখা গেল ড্রাই ডক হল। সাবমেরিনের পাশে
নাচছে সাগরের পানির ঢেউ। উপরে ড্রাই ডকের মেঝের পারে
ছয়জন মার্সেনারি, চেয়ে আছে এদিকে। এখনও ভরে উঠছে ড্রাই
ডক।

পেরিস্কোপ সরিয়ে অন্যদিকে চাইল রানা। ওর চোখ গেল
ড্রাই ডকের দোতলা উঁচু ব্যালকনির উপর।

ওখানে আরও বেশ ক’জন মার্সেনারি। তাদের ভিতর
একজন ক্ষাপা নর্তকের মত হাত নাড়ছে। নির্দেশ দিচ্ছে
বোধহয়। ছয় মার্সেনারি ছুটল গ্যাংওয়ের দিকে। ওই গ্যাংওয়ে
টাইফুন সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারের ব্যালকনির মেঝের সমান

উচ্চতায়।

লোকগুলোকে দেখছে রানা। তাড়া দিল, ‘খবির? বিদ্যুৎ পেল?’

‘কী যে কী বুঝি না, স্যর,’ হতাশ স্বরে বলল খবির। ‘রাশান ভাষা জানি না!’

চট করে ওর পাশে চলে গেল রানা। সুইচগুলো দেখতে শুরু করেছে। ফ্যাশলাইটের আলোয় পটা-পট ক’টা সুইচ টিপল। হুম্‌হুম্‌ আওয়াজ তুলে কী যেন চালু হয়েছে। জ্বলে উঠল বাতি।

‘এই যে, স্যর,’ বলল খবির।

ওর হাত থেকে ধুলোভরা হেডফোন নিল রানা। কানেশন দিল সাবমেরিনের ইলেকট্রনিক সাপোর্ট মেযারের অ্যান্টেনার সঙ্গে। শেষ জিনিসটা প্রতিটি আধুনিক সাবমেরিনেই থাকে। ইএসএম অ্যান্টেনা ঘুরন্ত স্ক্যানার। বেশিরভাগ রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি ধরবে, নজর রাখবে কোথায় কী হচ্ছে।

কানে হেডসেট বসিয়ে নিতেই কণ্ঠস্বর গুনল রানা।

‘...উন্মাদ হারামজাদা উড়িয়ে দিয়েছে সি গেট!’

‘...চুকে পড়েছে টর্পেডো টিউবে! শালারা আছে সাবমেরিনের ভেতর!’

শোনা গেল একটা শান্ত কণ্ঠ।

আবারও পেরিস্কোপে চোখ রেখেছে রানা। ব্যালকনি লেভেলে একজনকে দেখল। গম্ভীর ভঙ্গিতে কথা বলছে ওই লোক।

‘...সবুজ দল, কনিং টাওয়ারের মাধ্যমে সাবমেরিনে ঢোকো। নীল দল, আরেকটা গ্যাংওয়ে খুঁজে নাও। ওটাকে সেতু হিসেবে ব্যবহার করবে। দু’জনের দল তৈরি করবে। সাবমেরিনের সামনে দিয়ে ঢুকবে একদল, অন্যদল পিছনের এসকেপ হ্যাচ দিয়ে...’

লোকটার কণ্ঠ খেয়াল করছে রানা।

কড়কড়ে স্বরে কথা বলছে সে। উচ্চারণ দক্ষিণ আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গদের মত। শান্ত, কোনও উত্তেজনা নেই কণ্ঠে।

লোকটার দিকে চেয়ে কু ডাকতে লাগল রানার মন।

এইমাত্র বানে ভেসে গেছে কমপক্ষে বারোজন সৈনিক, তবুও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে সে। চেহারায়ে রাগের কোনও অনুভূতি নেই।

‘স্যর, রেইডার থেকে বলছি। দুটো ইনকামিং এরিয়াল কণ্ট্যাক্ট পাওয়া গেছে। একটা ইয়াক-১৪১ স্ট্রাইক ফাইটার, অন্যটা সুখোই ফাইটার, স্যর।’

জানতে চাইল কমাণ্ডার, ‘ইটিএ?’

‘বর্তমান গতি অনুযায়ী প্রথমটা পৌঁছবে পাঁচ মিনিট পর, অন্যটা এসে যাবে তার দশ মিনিট পর।’

মনে হলো চিন্তা করছে কমাণ্ডার। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘ক্যাপ্টেন হডসন, তোমার দলের সবাইকে এখানে পাঠিয়ে দাও। প্রথম ফাইটার সম্ভবত মিস্টার ফগের। দ্বিতীয়টাতে আছে বাউন্টি হান্টার পোলিশ। ওকে নিয়ে ভাবছি না, কিন্তু মিস্টার ফগ সমস্যা তৈরি করতে পারে। তার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে মোটেও পরিষ্কার নয়। প্রতিযোগীরা আসার আগেই এদিকের কাজ শেষ করতে চাই।’

‘সবাইকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে,’ জবাবে বলল ফ্রেঞ্চ কণ্ঠস্বর।

বিদ্যুৎবেগে ভাবতে শুরু করেছে রানা।

ঝড়ের মত এসে হাজির হবে লোকগুলো। কনিং টাওয়ার, ফরওয়ার্ড ও রিয়ার এসকেপ হ্যাচ গলে আসবে।

রিইনফোর্সমেন্ট আসছে তাদের।

কিন্তু আসছে কোথা থেকে?

আবারও ভাবো, নিজেকে বলল রানা।

তোমার শত্রুরা আসলে কারা?
কোনও ধরনের মার্সেনারি দল।
তারা এখানে এসেছে কেন?
বিসিআই-এ থেকে রানা শুনেছিল শুরু হতে পারে মস্ত এক
বাউন্টি হান্ট। যেন সাবধানে থাকে।
আর এখন অ্যাটলক ও রবিনের মাথা কেটে নিয়েছে তারা।
আর কী জানি? ভাবল রানা।
দক্ষিণ আফ্রিকান কমান্ডার বলেছে, তাদের প্রতিযোগীরা
আসতে শুরু করেছে।
এখন এই পরিস্থিতিতে ওর নিজের কী করা উচিত?
বেশি কিছু করার নেই।
কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না ম্যাককোল এয়ার
ফোর্স বেসে।
এখান থেকে সরে যাওয়ারও উপায় নেই।
অপেক্ষা করতে হবে কখন পৌঁছুবে রেঞ্জার ফোর্স।
কোনও ভুল না হয়ে থাকলে তারা আসবে তিরিশ মিনিট
পর।
কিন্তু এই তিরিশ মিনিট ওরা টিকে থাকবে কী করে?
সময় এখন শত্রুদের পক্ষে।
এদের প্রতিযোগীদের কথা বাদই থাক, এদের হাতে অফুরন্ত
সময়। ডালে বসে থাকা পাখির মত ওদেরকে মারতে পারবে।
ভাবছে রানা, প্রথমেই পাল্টে দিতে হবে এই পরিস্থিতি।
প্রথম কাজ হওয়া উচিত শত্রুদের অফুরন্ত সময় সংক্ষিপ্ত করে
দেয়া।
চারপাশে চাইল রানা। কন্ট্রোল রুমে জ্বলছে পাইলট
লাইটস্।
তার মানে বিদ্যুৎ আছে।

ভাল ।

তার মানে...

সিল করা ছয় মিসাইল সাইলোর কথা ভাবতে শুরু করেছে রানা ।

অন্য হ্যাচগুলোর মুখ খোলা, কিন্তু ওই ছয়টা...

ভিতরে মিসাইল থাকতে পারে ।

নিশ্চয়ই ওয়ারহেড সরিয়ে ফেলেছিল রাশানরা ।

কিন্তু মিসাইল হয়তো রয়ে গেছে হ্যাচের ভিতর ।

‘এদিকে এসো,’ জন হককে পেরিস্কোপের দিকে ইঙ্গিত করল রানা । ‘ওদের ওপর চোখ রাখো ।’

রানার হাত থেকে পেরিস্কোপ নিল কর্পোরাল । দ্রুত সামনের কন্সলের কাছে চলে গেল রানা । ‘খবির, কাজে হাত লাগাও ।’

‘কী করতে হবে, স্যর?’ জানতে চাইল খবির ।

‘জানতে চাই সাবমেরিনের মিসাইল এখনও কাজ করে কিনা ।’

পাওয়ার সুইচ টিপতেই জ্যান্ত হয়ে উঠল কন্সোল । পর্দায় ভেসে উঠল কোড স্ক্রিন । আইএসএস-এর কমপিউটার থেকে হ্যাক করা অল-পারপাস সোভিয়েত কোড বিসিআই-এর জন্য ডাউনলোড করেছিল রায়হান রশিদ, মনে আছে রানার । ম্যাককোল এয়ার ফোর্স বেসে ওই একই কোড ওকে দেয়া হয়েছিল পাবলো-৯-এর জরুরি ডিজিটাল কিপ্যাড খুলবার জন্য । ওটা ওকে মুখস্থ করিয়েছিল গলাছেলা শকুনের মত এক কর্নেল ।

ওটা ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড । আলটিমেট ইলেকট্রনিক স্কেলিটন কি, ডিযাইন করা হয়েছিল সিনিয়র সোভিয়েত পারসোনেলদের জন্য । আট ডিজিটের কোড । সোভিয়েত আমলের প্রতিটি কিপ্যাড লকে কাজ করত । একই জিনিস আমেরিকানদেরও রয়েছে, ওটা জানেন শুধু প্রেসিডেন্ট ও জনা

কয়েক অত্যন্ত সিনিয়র সামরিক অফিসার।

‘ব্যালকনিতে ছয়জনকে দেখছি, গ্যাংওয়ের দিকে আসছে!’
জানাল জন হক, ‘থ্রাউও ফ্লোরে আরও চারজন। একটা সেতু
নিয়ে এসেছে, সাবমেরিনে উঠতে চায়!’

একবার রানাকে দেখল খবির, তারপর এমপি-৭ হাতে
দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ব্যস্ত হাতে কপোলে সুইচ টিপছে রানা। একের পর এক
তথ্য আসছে পর্দায়।

হ্যাঁ, টাইফুন সাবমেরিনের সামনের সাইলোয় রয়ে গেছে
বেশ কয়েকটা মিসাইল।

তাই, আনমনে বলল রানা।

সাইলোর ভিতর রয়েছে মিসাইল, কিন্তু সরিয়ে নেয়া হয়েছে
নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড। সংখ্যায় মিসাইল ছয়টি।

আমার শুধু একটা দরকার, ভাবল রানা। খবিরের দিকে না
চেয়েই বলল, ‘খুলে দাও সাইলোর ছয় হ্যাচ। সপ্তম হ্যাচও
খোলা রাখবে।’

‘বাড়তিটা দিয়ে কী করবেন, স্যার?’ জানতে চাইল খবির।

‘পরে বলব।’

কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে গেল খবির। একমিনিট পর
খুঁজে পেল নির্দিষ্ট জিনিস। টিপতে লাগল হ্যাচ সুইচ। ওগুলো
সাইলো রুমের ডান পাশে।

অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চোখ বিস্ফারিত হলো কার্ট কে. এবেলহার্ডের।
ড্রাই ডকের মাঝে টাইফুন ক্লাস সাবমেরিন, এবং ওটার পিঠে
উঠছে তার লোক। ফরওয়ার্ড ও রিয়ার হ্যাচ গলে ভিতরে
চুকবে। কিন্তু সেজন্য বিস্মিত হয়নি এবেলহার্ড, অন্য কারণে
বিড়বিড় করে বলল, ‘লোকটা করছেটা কী?’

হাইড্রলিক কজার উপর ভর করে খুলে যাচ্ছে সাবমেরিনের
ফরওয়ার্ড মিসাইল হ্যাচ ।

‘কী করতে চান, স্যর?’ জানতে চাইল খবির ।

‘যুদ্ধের জন্যে বেঁধে দেয়া সময় বদলে দেব,’ বলল রানা ।
অন্য স্ক্রিন আনল কমপিউটারে । দেখা গেল পাবলো-৯-এর
জিপিএস কো-অর্ডিনেটস্ ।

এবার কমপিউটারকে জরুরি তথ্য দিল রানা । ওর নির্দেশ
অনুযায়ী উৎক্ষেপণ করা হবে মিসাইল । ওটা আকাশ চিরে ছুটবে
বিশ মিনিট, এরপর টার্গেট করা কো-অর্ডিনেটস্ অনুযায়ী আঘাত
হানবে ।

ছয়টি মিসাইলই কাজ করবে, এমনটা আশা করছে না রানা ।
গত কয়েক বছরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সলিড-ফিউয়েল রকেট
বুস্টারের ও-রিং সিল । হয়তো একটা মিসাইলও ফায়ার হবে
না ।

কিন্তু শুধু একটা কাজ করলেই চলবে ওর ।

এক এক করে মিসাইলগুলোকে জাগাতে চাইল রানা ।

সাড়া দিল পঞ্চম মিসাইল ।

ওটার সবুজ রঙের ‘গো’ লাইট জ্বলে উঠেছে ।

এবার কমপিউটার চাইল ফাইনাল অ্যাপ্রোভাল-কোড ।

ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড ব্যবহার করল রানা ।

অথোরাইজেশন মেনে নেয়া হলো ।

দেরি না করে ‘ফায়ার’ বাটন টিপে দিল রানা ।

আগেই আওয়াজ শুনেছে কার্ট কে. এবেলহার্ড, এবার চোখের
সামনে দেখল আশ্চর্য দৃশ্য ।

সাবমেরিনের বুকের গভীরে আওয়াজ উঠছে প্রম্মম্মম্মম্মম্ম ।

পরাশ্রমে কান ফাটিয়ে দেয়া সাঁৎ শব্দের বিস্ফোরণ হলো।
সাবমেরিনের ফরওয়ার্ড হ্যাচের একটা থেকে শৌও করে বেরিয়ে
গেল এসএস-এন-২০ ব্যালিস্টিক মিসাইল।

যেন আকাশে উঠছে স্পেস শাটল। চারপাশে ছুটল বিপুল
ধোঁয়া, উন্মাদের মত ছড়াতে শুরু করেছে, পুরো ঢেকে ফেলল
ড্রাই ডক হল। ধূসর কুয়াশায় হারাল প্রকাণ্ড টাইফুন সাবমেরিন
বা মার্সেনারিরা।

বিদ্যুৎবেগে উঠছে মিসাইল, চুরমার করল ফাটল ধরা কাঁচের
ছাত, দেখতে না দেখতে হারিয়ে গেল সাইবেরিয়ার ধূসর
আকাশ থেকে।

বিচলিত হলো না এবেলহার্ড। শান্ত স্বরে বলল, ‘তোমরা
হামলা শুরু করো। ...ক্যাপ্টেন হডসন, কোথায়
রিইনফোর্সমেন্ট?’

কেউ দিগন্ত থেকে শ্রম-নগরী পাবলো-৯কে দেখলে তার
চোখে পড়বে অবিশ্বাস্য দৃশ্য: মৃত শহরের মাঝ থেকে দীর্ঘ
ধোঁয়ার কলাম রকেটের মত উঠছে আকাশ চিরে।

এবং সত্যিই ওই দৃশ্য দেখেছে দু’জন।

তারা বসে আছে রাশান সেনাবাহিনীর জন্য তৈরি ইয়াক-
১৪১ ফাইটার জেট বিমানের ককপিটে।

ওই বিমান ছুটে চলেছে পাবলো-৯ লক্ষ্য করে।

টাইফুন ক্লাস সাবমেরিনের কন্ট্রোল রুমে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা। জন হকের কাছে জানতে চাইল, ‘ওরা কোথায়?’

‘চারপাশ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়েছে, স্যর,’ বলল কর্পোরাল। ‘কিছুই দেখছি না।’

পেরিস্কোপের ওদিকে শুধু ঘন ধূসর ধোঁয়া। জায়গাটা সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারের ছোট ঘর। কনিং টাওয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত সরু এক গ্যাংওয়ে ওখানে, চলে গেছে সোজা ব্যালকনির মেঝেতে।

‘দেখছি না কিছু...’

পেরিস্কোপ ঘষা দিয়ে গেল এক লোক। প্রকাণ্ডেহী, মুখে গ্যাস মাস্ক।

‘ওরে বাবা!’ আইপিস থেকে ছিটকে পিছিয়ে এল জন হক। ‘যিশু! ওরা চলে এসেছে! আমাদের মাথার ওপর!’

‘তাতে সমস্যা নেই,’ বলল রানা। নীচে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে এগুতে শুরু করেছে। ‘এবার আমরা সরে যাব, দেখা হবে না ওদের সঙ্গে।’

মিসাইল সাইলো হল-এ খবিরের সঙ্গে মিলিত হলো রানা ও হক। ছুটতে শুরু করেছে রানা, ওর দেখাদেখি অন্য দু’জন। মেঝেতে জমেছে এক ফুট পানি।

খালি একটা সাইলোর সামনে থামল রানা, ইশারা করল

খবির ও হককে । আগেই খোলা হয়েছে এই সাইলোর হ্যাচ ।
গোলাকার ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা ।

দৈত্যাকার চুরুটের মত মিসাইল সাইলো, উপরে উইঞ্চ ।
মনে হলো ওটা খুব ছোট । দেখা গেল সাবমেরিনের খোলা
আউটার হাল হ্যাচ । সপ্তম সাইলোর ভিতর ঢুকেছে রানা । মেঝে
থেকে শুরু করে ছাতে পৌঁছে গেছে রাং ল্যাডার ।

মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা ও তার দুই সৈনিক ।

সাইলোর ছাদ সমতলে মাথা পৌঁছে যেতেই উঁকি দিল
রানা । দেখল, সাবমেরিনের ফরওয়ার্ড এসকেপ হ্যাচের ভিতর
হারিয়ে গেল দুই মার্সেনারি । তারা ছিল মাত্র তিন মিটার দূরে ।

ভাল, ভাল রানা । এরা গিয়ে ঢুকছে সাবমেরিনের পেটে,
আর ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে ।

আরও ভাল, ড্রাই ডক ও সাবমেরিন এখনও ডুবে আছে
সাদাটে ধোঁয়ায় ।

ব্যালকনির দিকে গেল রানার চোখ ।

মার্সেনারিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকান
কমান্ডার ।

ওই লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই, ভাল রানা । সাইলো
থেকে বেরিয়েই ছুটতে শুরু করল ও । এবার রাং ল্যাডার বেয়ে
উঠে পড়বে টাইফুন সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারে । ওখান থেকে
যাবে ওদিকের ব্যালকনিতে ।

রানা এবং দু' সৈনিক তরতর করে উঠে এল কনিং টাওয়ারে,
ছুটতে লাগল সরু গ্যাংওয়ে ধরে । চলেছে সামান্য উপরের ওই
ব্যালকনির মেঝের দিকে ।

ব্যালকনির আরেক পাশে ছোট ইন্টারনাল অফিস । দরজায়
দাঁড়িয়ে রেডিয়োতে নির্দেশ দিচ্ছে মার্সেনারি কমান্ডার । ধোঁয়ার
মাঝে সাবমেরিনের দিকে চেয়ে আছে । পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক

সশস্ত্র বডিগার্ড ।

ধূসর ধোঁয়ার কাভার নিয়ে কনিং টাওয়ার থেকে ব্যালকনির দিকে ছুটছে রানা ও দুই সৈনিক ।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর লাফিয়ে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকান মার্সেনারি কমাণ্ডার এবং তার বডিগার্ড ।

‘খবরদার!’ কানের কাছে গর্জে উঠেছে রানা ।

একই সময়ে গুলি করল বডিগার্ড ও জন হক ।

বুকে রানার গুলি নিয়ে ছিটকে পড়ল বডিগার্ড ।

আগেই তার গুলি খেয়ে ধপ্ করে পড়ে গেছে জন হক ।

তখনই হোলস্টার থেকে ছোঁ দিয়ে পিস্তল নিল মার্সেনারি কমাণ্ডার, দেখল খুবই কাছে মাসুদ রানা । ডাইভ দেয়ার পর গড়িয়ে যাওয়ার ফাঁকে গর্জে উঠল রানার ডেয়ার্ট ইগল । ওর দুই গুলি বিঁধল কার্ট কে. এবেলহার্ডের বুকে এবং হাতে ।

ঝটকা খেয়ে চারফুট পিছিয়ে গেল লোকটা । পিস্তল পড়েনি হাত থেকে । ধাক্কা খেল অফিসের বাইরের দিকের দেয়ালে । বসে পড়েছে মেঝেতে ।

‘হক! ঠিক আছ?’ জানতে চাইল রানা । উঠে দাঁড়িয়ে এক লাথিতে উড়িয়ে দিল এবেলহার্ডের পিস্তল ।

কাঁধে গুলি খেয়েছে জন হক, কুঁচকে রেখেছে মুখ ।

ওর ক্ষত পরীক্ষা করল খবির ।

‘মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে ।’

এবেলহার্ডেরও তেমন কিছুই হয়নি । স্নো গিয়ারের নীচে ছিল বুলেট ভেস্ট । অফিসের বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে । বিদ্যুটে চেহারা করে বামহাতে টিপে ধরেছে আহত ডান কজি ।

তার কপালে ডেয়ার্ট ইগলের নলের মুখ ঠেকাল রানা । ‘কে তুমি, এবং এখানে কেন?’

কেশে চলেছে এবেলহার্ড। শ্বাস নিতে চাইছে হাঁপিয়ে।

‘আরেকবার বলব: তুমি কে, এবং এখানে কেন?’

কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিস করল সে, ‘আমার নাম... কার্ট কে. এবেলহার্ড... একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র সঙ্গে আছি।’

মার্সেনারি, মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, ‘এখানে কেন তোমরা? কী কারণে আমাদেরকে খুন করতে চাইছ?’

‘সবাইকে না, মেজর। শুধু তোমাকে।’

‘আমাকে এত বিশেষ খাতির করার কারণ?’

‘ডেল্টা ডিটাচমেন্টের মেজর হার্লি অ্যাটলক, মেরিন ফোর্সের মেজর রবিন কার্লটন আর তোমাকে চেয়েছি আমরা।’

‘কেন?’

‘এসব জেনে লাভ কী তোমার?’ বাঁকা হাসল এবেলহার্ড।

কথা বাড়াবার সময় নেই। দেরি না করে লোকটার আহত কজির উপর ডান বুট চাপিয়ে দিল রানা। সামান্য মাড়িয়ে দিতেই উফ করে উঠল লোকটা।

সরাসরি রানার চোখে চাইল। চোখ থেকে ঝরছে গোন্ধুরের বিষ।

‘তোমাদের মাথার ওপর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। যারা তোমাদের মাথা কাটবে, তারা বাউন্টির পুরস্কার পাবে।’

বুকের ভিতর ভয়ের শিহরন টের পেল রানা।

বামহাতে বুক পকেট থেকে মোচড়ানো কাগজ বের করল এবেলহার্ড। ওটা বাড়িয়ে দিল। ‘পড়ে দেখো।’

প্রায় ছোঁ দিয়ে কাগজটা নিল রানা। পড়তে শুরু করেছে।

ওটা মানুষের নামের লিস্ট।

রানা চট করে দেখে নিল, ওই লিস্টে আছে হার্লি অ্যাটলক, রবিন কার্লটন এবং ওর নাম।

প্রতিশোধ নেয়ার জন্য চকচক করছে চোখ, এবেলহার্ড বলে

উঠল, ‘এবার তুমি দুনিয়ার সেরা বাউন্টি হান্টারদের দেখবে, মেজর। একই কথা খাটে তোমার মত অন্য সবার বেলায়ও। দরকার পড়লে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবীদের আটকে রাখবে বাউন্টি-হান্টাররা, যে গর্তেই লুকাও, সেখান থেকে বের করে আনবে তোমাদের।’

শীতল অনুভূতি নামল রানার মেরুদণ্ড বেয়ে।

ঘনিষ্ঠদের বন্দি করে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করতে পারে বাউন্টি হান্টাররা।

কেন যেন নিশাত সুলতানা আর তিশার কথা মনে পড়ল রানার। ওরা আছে আফ্রিকায়— কঙ্গোর মাউন্ট স্ট্যানলি পর্বতে, ইউএন-এর হয়ে লড়ছে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এক রক্তপিশাচ ওয়ার লর্ডের বিরুদ্ধে।

চট করে বর্তমানে ফিরল রানা।

‘কী কারণে মাথা কাটছ তোমরা?’ জানতে চাইল।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ বের করল এবেলহার্ড।

আবারও ডান বুট বাড়িয়ে দিল রানা রক্তাক্ত কজির দিকে।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, ব্যাখ্যা দিচ্ছি,’ দাঁত খিঁচিয়ে বলল এবেলহার্ড। ‘তোমার মাথার দাম তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার। ওই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে আরও ষোলজনের মাথার ওপর। ফ্রান্সের এক দুর্গে এসব মাথা পৌঁছে দিলেই টাকা পাওয়া যাবে। আগে কখনও এত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি। শেষে হয়তো দেখবে, তোমাদের সংগঠন থেকেই বড়কর্তারা পাগল হয়ে উঠেছে যার যার লোকের মাথা কাটতে।’

‘বাংলাদেশের কেউ আমার গায়ে একটা টোকাও দেবে না,’ গর্ব নিয়েই বলল রানা।

ভীষণ বাঁকা হাসল এবেলহার্ড। ‘আমাদের কাছে তথ্য আছে, রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে যাদের আসার কথা, সেসব রেঞ্জার

ফোর্ট লিউইস থেকে এখনও রওনাই হয়নি। হবেও না। যা করার করতে হবে তোমার নিজেকেই। মনে রেখো, মেজর রানা, তুমি এখানে একা... আর আমরা তৈরি তোমার জন্যে। আমরা ঠিকই কেটে নেব তোমার মাথা।’

মগজে ঝড় চলছে, দ্রুত ভাবতে শুরু করেছে রানা।

এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, আগে ভাবেনি। অবশ্য বিসিআই থেকে সামান্য আভাস ওর কাছে পাঠানো হয়েছিল। দু’দিন আগে এ-ও জানিয়ে দেয়া হয়, ওটা অনিশ্চিত তথ্য।

ভাবনার ভিতর এবেলহার্ডকে অদ্ভুত একটা কাজ করতে দেখল রানা। দ্বিতীয়বারের মত চোখ সরিয়ে নিল লোকটা। কিছু একটা দেখছে ওর পাশ দিয়ে পিছনে।

আধ পাক ঘুরে চাইল রানা। চমকে উঠেই বিস্ফারিত হলো ওর দুই চোখ।

ড্রাই ডকের মাঝের লেকে জমতে শুরু করেছে বরফ, কিন্তু গভীর থেকে বলকে উঠছে আগ্নেয়গিরির লাভার মত বুদ্ধদ। জোরালো ঠাস্-ঠাস্ আওয়াজ তুলে ফাটল পাতলা বরফের সাদা আস্তরণ।

বুদ্ধদের ভিতর দিয়ে উঠে আসছে কী যেন।

ওটা কি প্রকাণ্ড কোনও তিমি?

না, ভুস্ করে ভেসে উঠল স্টিলের কালো খোল।

ওটা সোভিয়েত আমলের অ্যাকুলা-ক্লাস অ্যাটাক সাবমেরিন!

অ্যাকুলা সাবমেরিন খুব বেশি বিক্রি হয়নি, তবে আন্তর্জাতিক আর্মস মার্কেটে ক্রমেই বিখ্যাত হয়ে উঠছে। কিছুদিন হলো বিক্রি করছে রাশান সরকার, এতে আসছে বিপুল টাকা।

রানা বুঝে গেছে, একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ আসলে রাশার কাস্টমার। অথবা উল্টোটাও হতে পারে।

বরফ জমতে থাকা লেকে সামনে বাড়ছে অ্যাকুলা। খুলে

গেছে হ্যাচ, বেরিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র মার্সেনারি। তীরে নামবার জন্য গ্যাংওয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েক সেকেণ্ড পর ডাঙায় নামবে তারা।

কুঁচকে গেল রানার ভুরু।

এখন ওকে মোকাবিলা করতে হবে কমপক্ষে তিরিশজন মার্সেনারির।

শয়তানির হাসি হাসল এবেলহার্ড।

‘হাসতে থাকো!’ বলল রানা। চট করে হাতঘড়ি দেখল। ‘আমাকে ধরার জন্যে বেশি সময় পাবে না। নেমে আসছে কেয়ামত। তখন থাকবে না এই বেস। তার আগ পর্যন্ত যত খুশি ফুটি করো।’

খটাং আওয়াজ হলো।

এবেলহার্ডের নাকের হাড়ে নামিয়ে এনেছে রানা ডেয়ার্ট ঈগলের নল।

কাত হয়ে ধুপ করে মেঝেতে পড়ল লোকটা, অচেতন।

‘জলদি!’ খবিরের পাশে চলে গেল রানা। ‘ওকে ধরে তোলো।’

জন হককে উঠতে সাহায্য করল দু’জন মিলে।

টলছে কর্পোরাল। ‘আমি নিজেই দাঁড়াতে পারব,’ বলল। আর তখনই বিস্ফোরিত হলো ওর বুক। ছিটকে বেরোল একগাদা রক্ত। ঠোঁটে জমা হলো ছোট কয়েকটা রক্তাক্ত বুদ্ধ। ফুটো হয়ে গেছে ফুসফুস। রক্তে ভিজে গেল রানার চেস্টপ্লেট।

অবাক চোখে দেখল খবির, নিভে এল জন হকের চোখের আভা। পড়ে গেল ও গ্রিল করা ক্যাটওয়াকে, মারা গেছে। পিছন থেকে গুলি করা হয়েছে তাকে। হঠাৎ হাজির হওয়া সাবমেরিনের মার্সেনারিরা নামছে ড্রাই ডকের হল-এ।

বিমর্ষ চোখে একবার কর্পোরালের লাশ দেখল রানা। মানতে

কষ্ট হচ্ছে, খবির এবং ও ছাড়া ওর টিমের কেউ বেঁচে নেই!

চট করে চারপাশ দেখল রানা।

পরিত্যক্ত সাইবেরিয়ান বেসে আটকা পড়েছে ওরা দু'জন।
ওদেরকে খুন করতে আসছে কমপক্ষে চল্লিশজন মার্সেনারি। ওর
পাশে লড়তে পারে এমন যোদ্ধা মাত্র খবির। আসবে না কোনও
রিইনফোর্সমেন্ট।

পালাতে পারবে না কোথাও!

খবিরের দিকে চেয়ে ইশারা করল রানা, ছুটতে শুরু করল
দু'জন।

প্রাণ বাঁচাতে হবে। অন্তত চেষ্টা করতে হবে শেষ পর্যন্ত।

এক পশলা গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তিনদিকের
প্লাস্টারবোর্ড দেয়াল।

রানাকে খুন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে একসেকিউশন
সলিউশন ফর ইউ-র নতুন গ্রুপ। উঠে আসছে রাং ল্যাডার
বেয়ে। ড্রাই ডক হল ধরে পালাতে শুরু করেছে তাদের শিকার।

কিন্তু ভাগতে দিলে চলবে না, বিসিআই-এর মাসুদ রানার
মুণ্ডু চাই-ই চাই।

মার্সেনারিদের যারা ঢুকেছে টাইফুন সাবমেরিনে, এখন বুঝে
গেছে পালিয়ে গেছে মাসুদ রানা।

তারা আবারও বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ডেকে, হাতে
আগুন ঝরানো অস্ত্র।

পশ্চিমদিক লক্ষ্য করে লেজ তুলে ভাগছে রানা ও খবির।
উঠতে হবে কংক্রিটের ওভারপাস সেতুর উপর।

ওই সেতু গেছে ড্রাই ডক থেকে পাবলো-৯-এর অফিস
টাওয়ারে।

সেতুর দিকে ছুটবার সময় রানা দেখল, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে
একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র মার্সেনারিরা— কেউ কেউ

উঠছে ব্যালকনিতে । অন্যরা দেখেছে মেঝেতে দুই পলাতক,
চলেছে ড্রাই ডকের সেতুর দিকে ।

একটা বিষয় বুঝেছে রানা: মার্সেনারিরা আসার আগেই
যেভাবে হোক যেতে হবে অফিস টাওয়ারে, নেমে পড়তে হবে
ওই সেতু থেকে । যদি তা না পারে, আটকা পড়বে পনেরোতলা
দালানে ।

ওভারপাস সেতু ধরে পাখির মত উড়ে চলেছে দু'জন ।
পিছনে পড়ছে ফাটল ধরা কংক্রিটের বুকো জানালার ফ্রেম ।

তীরের মত সেতু পেরোল ওরা, ঝড়ের গতিতে ঢুকল অফিস
টাওয়ারে । ওখানেই ব্রেক কষে থেমে গেল ।

ওরা আছে এক ব্যালকনির শুরুতে ।

ছোট ক্যাটওয়াক । পনেরোতলা দালানে এমন অনেকগুলো
আছে । সঙ্গে অসংখ্য মই ।

মাঝের মস্ত গোলাকার জায়গা একেবারেই ফাঁকা ।

এটা আসলে কোনও অফিস টাওয়ারই নয় ।

ফাঁকা গ্লাস ও স্টিলের কাঠামো ।

নকল জিনিস ।

দেখলে মনে হয় দানবীয় গ্রিনহাউস ।

চারপাশের চিড় ধরা কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা গেল
সাইবেরিয়ার মৃত প্রকৃতি ।

আকাশছোঁয়া দালানের মেঝের দিকে চেয়ে সবই বুঝে গেল
রানা ।

চারটে প্রকাণ্ড আইসিবিএম মিসাইল সাইলো ডেবে আছে
মেঝেতে । মাথার অনেক উপরে দালানের নকল ছাত । আজ
পর্যন্ত ইউএস স্পাই স্যাটালাইট খুঁজে পায়নি এর অস্তিত্ব ।

রানা আঁচ করল, পাবলো-৯-এর অন্য 'অফিস দালান'ও
একই জিনিস ।

একতলা নীচে সাইলোর পাশে দশটা মৃতদেহ ।
আগে আসা মেরিন কর্পসের সৈনিক ও অফিসার, একটু দূরে
সার্জেন্ট গ্রেসনের স্কোয়াড ।

সবাই মৃত ।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা ।

কাউন্টডাউন চলছে ।

টিকটিক করে নেমে চলেছে সময় ।

সঠিক সময়ে পাবলো-৯-এ ফিরবে সাবমেরিনের মিসাইল ।

১৫:৩১...

১৫:৩০...

১৫:২৯...

তাড়া দিল রানা, 'নীচে নামতে হবে ।'

কাছের রাং-ল্যাডার লক্ষ্য করে ছুটল ওরা ।

তখনই পিছন থেকে এল এক ঝাঁক বুলেট ।

মনে মনে কপাল চাপড়াল রানা ।

আগেই একতলার মেঝেতে পৌঁছে গেছে মার্সেনারিরা । ড্রাই
ডক ওয়্যারহাউস থেকে তুষার ভরা রাস্তা ধরে এসেছে এই
টাওয়ারে ।

কী যেন বিড়বিড় করল রানা ।

'এবার কী, স্যার?' জানতে চাইল খবির ।

'উপায় নেই, ওপরে ওঠো,' বলল রানা ।

মই বেয়ে ঝড়ের মত উঠতে লাগল ওরা ।

কয়েক সেকেন্ড পর মনে হলো, বাঁদরের মত বেয়ে উঠতে
হচ্ছে রাং-ল্যাডার, কিন্তু ওপরে কলার কাঁদি নেই!

মার্সেনারিদের গুলি এড়াতে চাইছে, লাফিয়ে উঠছে ব্যালকনি
বা পরের মইয়ে । দশতলা উঠবার পর থামল রানা । প্রথমবারের
মত সাহস করে নীচে চাইল ।

ধক্ করে উঠল ওর বুক । মন থেকে বিদায় নিল সব আশা ।
মন বলে দিল: রানা রে, এবার আর পারলি না তুই!

টাওয়ারের মেঝেতে কংক্রিট মিসাইল সাইলোর চারপাশে
জড় হয়েছে মার্সেনারি ফোর্সের সবাই ।

সংখ্যায় কমপক্ষে পঞ্চাশজন ।

দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল তারা, মাঝে দাঁড়াল এক লোক ।

সে কার্ট কে. এবেলহার্ড ।

ভচকে যাওয়া নাক থেকে টপটপ করে রক্ত পড়ছে এখনও ।

একবার হাতে পেল ব্যাটা কী করবে, ভাবতে গিয়ে স্বস্তি
পেল না রানা । ওদেরকে ধাওয়া করতে প্রথমেই মই বেয়ে
পাঠাবে মার্সেনারি । ওদের গুলি ফুরিয়ে গেলে খুন করবে যেমন
ভাবে খুশি ।

ওরা সিটিং ডাক ।

কোনও স্ট্র্যাটেজি নেই ।

ফাঁকা টাওয়ারে গমগম করে উঠল এবেলহার্ডের কণ্ঠ:
'মেজর রানা! ভাল দৌড়াতে পারো! কিন্তু পালাতে পারবে না
কোথাও! জানেই বাঁচবে না!' প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কথাটা ।

কমব্যুট ওয়েবিং থেকে কী যেন বের করেছে লোকটা ।

জিনিসগুলো চিনল রানা । থমকে দাঁড়িয়ে গেল ।

জিনিসগুলো ছোট এবং সিলিগারের মত ।

থার্মাইট-অ্যামাটল ডেমোলিশন চার্জ ।

সংখ্যায় চারটে ।

রানার সঙ্গে মৃত মেরিনদের কাছ থেকে পেয়েছে বোধহয় ।

পরীক্ষার এবেলহার্ডের পরিকল্পনা বুঝল রানা ।

চার মার্সেনারির হাতে একটা করে চার্জ দিল লোকটা ।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল দালানের চারদিকের চার পিলার ।

ঝট্ করে ওয়েবিং থেকে নিয়ে ফিল্ড বিনকিউলার চোখে

লাগাল রানা ।

থার্মাইট চার্জগুলোর রঙিন সুইচ চোখে পড়ল— লাল, সবুজ ও নীল ।

‘টাইমার চালু করো!’ নির্দেশ দিল এবেলহার্ড ।

থার্মাইট-অ্যামাটল চার্জের নীল টাইমার বাটন টিপল লোকগুলো ।

নীল টাইমার মানে একমিনিট, ভাবল রানা ।

মস্ত ঢোক গিলল ও ।

মাত্র ষাট সেকেন্ড পাবে খবির আর ও, তারপর চুরমার হবে কাঁচের দালান ।

হাতঘড়ির স্টপওয়াচ চালু করল রানা ।

০০:০১...

০০:০২...

০০:০৩...

‘মেজর রানা, ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করব তোমার লাশ! তখন কেটে নেব ওই মগজহীন মাথাটা! প্রস্রাব করব তোমার গলার ভেতরে! ...সোলজার্স, আউট!’

আশপাশে ঢিল পড়লে যেভাবে চমকে যায় পাখি, সেভাবে ছিটকে গেল মার্সেনারিরা । ছুটতে শুরু করেছে সবাই গ্রাউণ্ড ফ্লোরের একসিট লক্ষ্য করে ।

অসহায় চোখে চেয়ে রইল রানা ও খবির ।

কাঁচ ঢাকা জানালার এপাশ থেকে চাইল রানা । নীচে বরফ ঢাকা জমিন ।

দালান থেকে বেরিয়ে চারপাশ ঘিরে ফেলেছে মার্সেনারিরা, হাতে উদ্যত অস্ত্র ।

অজান্তে ঢোক গিলল রানা ।

খবির আর ও অসহায়ভাবে আটকা পড়েছে কাঁচের দালানে ।

এবং সবই বিস্ফোরিত হবে মাত্র বায়ান্ন সেকেন্ড পর!
মার্সেনারিদের দিকে চেয়ে আছে রানা, তখনই শুনল অদ্ভুত
জোরালো আওয়াজ।

শুরু হয়েছে গুমগুম শব্দ।

কোনও জেট ফাইটার বিমান।

‘ওটার কথা আগেও শুনেছি,’ চাপা স্বরে বলল রানা।

‘কী বললেন, স্যর?’ জানতে চাইল খবির।

‘তখন টাইফুন সাবমেরিনে ছিলাম। মার্সেনারি কমান্ডারকে
জানিয়েছিল এরিয়াল কন্ট্রোলার কথা। ইয়াক-১৪১ স্ট্রাইক
ফাইটার। ওটাতে করে আসছিল “মিস্টার ফগ” নামের কেউ।’

‘সে কি বাউন্টি হান্টার?’

‘খুব সম্ভব এদের প্রতিযোগী। ইয়াক-১৪১ ফাইটার নিয়ে
আসছে। আর ইয়াক-১৪১ হচ্ছে...’ থেমে গেল রানা। ‘এসো,
খবির! জলদি!’

কাছের রাং-ল্যাডারে পৌঁছে গেল ওরা।

দেরি না করে মই বেয়ে উঠতে লাগল তীরের গতিতে।

যেতে হবে অফিস টাওয়ারের ছাতে।

কয়েক সেকেন্ড পর ছাতের হ্যাচ ঝটকা দিয়ে খুলল রানা,
উঠে এল খোলা আকাশের নীচে। এক সেকেন্ড পর ওর পাশে
দাঁড়িয়ে পড়ল খবির। সাইবেরিয়ার হিমশীতল কনকনে হাওয়ায়
থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে দু’জন।

স্টপওয়াচের সংখ্যাগুলো উপরে উঠছে।

০০:২৮

০০:২৯

০০:৩০

পাবলো-৯-এর পরিত্যক্ত সব দালান ও সাইবেরিয়ার বরফ
ঢাকা টিলাগুলোর ভিতর খুবই ছোট দুটো আকৃতি রানা ও খবির।

৫-বাউন্টি হান্টার্স-১

ছাতের কিনারায় চলে গেল রানা, খুঁজছে ইঞ্জিনের আওয়াজের
উৎস ।

০০:৩২

০০:৩৩

০০:৩৪

ওই যে!

নিচু গম্বুজ মাথায় নিয়ে এক দালান, তার পাঁচ শ' গজ দূরে
পশ্চিমে ভাসছে ইয়াকোভ্লেভ-১৪১ স্ট্রাইক ফাইটার ।

ব্রিটেনের হ্যারিয়ার ফাইটারের আদলে তৈরি হয়েছে রাশান
ফাইটার, আজ পর্যন্ত যত বিমান তৈরি হয়েছে, তার ভিতর
সবচেয়ে কুৎসিত আকাশযান ।

চৌকো দেহ, পিছনে মোটা আফটারবার্নিং ইঞ্জিন । ওটাকে
সুন্দর করবার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি ।

কজার সাহায্যে আফটারবার্নার ঘুরিয়ে নামিয়ে নেয়া হয়,
একই জায়গা থেকে উঠতে-নামতে পারে বিমান, ভাসতে পাড়ে
হেলিকপ্টারের মত ।

০০:৩৮

০০:৩৯

০০:৪০

এমপি-৭ বের করে ভাসমান ইয়াকের নাক লক্ষ্য করে
ম্যাগার্বিনের তিরিশটা গুলি খরচ করল রানা ।

আকর্ষণ করতে চাইছে মনোযোগ । এতে কাজও হলো ।

সেই যুগে টেরোডাকটিলের খাবারে বাগড়া দিলে বোধহয়
এমনই করত, বাতাসে ভর করে সরে গেল ইয়াক-১৪১ ফাইটার
জেট । মনে হলো রানা এবং খবিরকে দেখতে পেয়েছে পাইলট ।
হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল কুশী বিমান, দ্রুত ছুটে এল কাঁচের
টাওয়ারের দিকে ।

‘আসেন, ফগা ভাই!’ বোকার মত চিৎকার করল খবির।

০০:৪৮

০০:৪৯

০০:৫০...

কাছে চলে এসেছে ইয়াক-১৪১, থামল টাওয়ারের পঞ্চাশ
গজ উপরে।

যথেষ্ট কাছে আসেনি।

পাইলটকে পরিষ্কার দেখল রানা। ফ্লাইট হেলমেটের কারণে
মুখ দেখা গেল না, কুঁচকে রেখেছে ভুরু।

ব্যস্ত হাতে ইশারা করছে খবির। ফাটিয়ে ফেলছে গলা।

০০:৫১

০০:৫২

০০:৫৩

কয়েক ফুট সামনে বাড়ল জেট বিমান।

পঁয়তাল্লিশ গজ সামনে আকাশযান।

০০:৫৪

‘আল্লার দোহাই!’ চেষ্টা খবির।

চট করে ছাতের মেঝের দিকে চাইল রানা।

এবার ফাটবে থার্মাইট চার্জ।

০০:৫৫

‘দেরি হয়ে গেছে,’ বলল রানা। ঘুরে চাইল খবিরের দিকে,
চোখে ইশারা। চট করে বের করল মেরিনদের ম্যাগলুক।

ওকে দেখে একই কাজ করল খবির।

‘আমি যা করি, ঠিক তাই করো,’ বলল রানা। ‘নইলে বাঁচবে
না!’

পনেরোতলা ছাত থেকে দৌড় শুরু করল ওরা!

০০:৫৬

ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে, তিন সেকেন্ড পর কিনারায় পৌঁছেই
ঝাঁপ দিল।

০০:৫৭

মাত্র তিন সেকেন্ড পর একমিনিট ছুঁয়ে দিল স্টপওয়াচ।

বেড়ে থাকা প্যারাপেট থেকে উড়াল দিয়েছে রানা ও খবির,
আর তখনই ওদের নীচে বিস্তারিত হলো গোটা দালানের নীচের
অংশ। চারপাশে ছিটকে গেল কংক্রিটের ধূসর ধুলোর মেঘ।

পুরো দুই শ' ফুট উঁচু দালানের সমস্ত কাঁচের দেয়াল, কংক্রিট
পিলার ও ছাত একই জায়গায় ভুশ করে বসে গেল। রানা ও
খবিরের নীচে যেন মস্ত কোনও গাছ ভূমিসাৎ হলো।

ইয়াক-১৪১ বিমানের পাইলট অবাক বিস্ময় নিয়ে চেয়ে
রইল। চোখের সামনে থেকে উধাও হয়েছে পনেরোতলা বাড়ি।
মুড়মুড় করে গুঁড়ো হলো সব, ধীরগতিতে রওনা হলো নীচে।

মস্ত এক মেঘের কুণ্ডলী তৈরি করল ধুলো।

দ্বিধান্বিত হয়ে উঠেছে জেট বিমানের পাইলট।

কয়েক সেকেন্ড আগে ছাতে দেখেছে রানাকে। এ-ও জানে
বাউন্টির লিস্টে আছে রানা। ওখান থেকে এক লোককে নিয়ে
লাফিয়ে পড়ে রানা। আর তখনই ধসে গেল বাড়িটা।

কিন্তু কোথাও দেখা যাচ্ছে না রানা বা সেই লোকটাকে।

ভেসে উঠছে ছাতার মত প্রকাণ্ড ধুলোর মেঘ, ছেয়ে ফেলেছে
আধ মাইল এলাকা।

বিশ্বস্ত সাইটের উপর চক্কর কাটল পাইলট। খুঁজছে কোথায়
গিয়ে পড়েছে ওই দুজন।

ওই সাইট চারদিক ঘিরে ফেলেছে একসেকিউশন সলিউশন
ফর ইউ মার্সেনারিরা। বাড়ি ভেঙে পড়তেই দৌড়ে সামনে বাড়ল।

কিন্তু কোথাও নেই মাসুদ রানার লাশ।

অস্ত্রগুলো তৈরি রাখল পাইলট, নামতে লাগল একটু দূরের

একটা বাড়ির ছাতে ।

পাবলো-৯-এর ছোট এক দালানের ছাতে নামল ইয়াক-১৪১
অ্যাটাক জেট বিমান । পিছনের রিয়ার থ্রাস্টার উড়িয়ে দিল ছাতে
জমা সব আর্বজনা ।

বিমান নেমে আসতেই খুলে গেছে ক্যানোপি, বেরিয়ে এল
দীর্ঘদেহী, সুঠাম এক লোক । হাতে রেমিংটন বন্দুক ।

দশফুট দূরে গিয়ে থামল । নীচে চাইল ছাতের কিনারা থেকে ।

বিমান থেকে নেমেছে তাল গাছের মত লম্বা সাত ফুটি এক
লোক । বসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ।

তখনই পিছন থেকে বলে উঠল কে যেন: ‘অস্ত্রটা ফেলো!’

ঘুরেও চাইল না কালো আলখেল্লা পরা লোকটা ।

আড়ষ্ট হয়ে গেছে সাত ফুটি ।

ইয়াক-১৪১-এর পেটের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা,
হাতে উদ্যত এমপি-৭ । নল তাক করেছে লোকদুটোর দিকে ।

‘তোমার বোধহয় রওনা হয়ে যাওয়া উচিত, রানা,’ গম্ভীর
কণ্ঠে বলল কালো আলখেল্লাধারী । এবং বলেছে সে খাস বাংলা
ভাষায়!

‘কুয়াশা!’ চমকে গেল রানা ।

সেই কুয়াশা! বছরখানেক আগে ম্যাহোনি হলে গুঁর সঙ্গে শেষ
দেখা । আটকা পড়েছিলেন আহত অবস্থায় । বস্টনে জियोভান্নি
গুইদেরোনির আস্তানা ম্যাহোনি হল জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে
যাওয়ার পর আবার গিয়েছিল রানা ওখানে কুয়াশার খোঁজে । দুর্গের
মত বাড়িটা থেকে কোন্ গুহা খুঁজে নিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা
করেছিল কুয়াশা, সেটা দেখে এসেছে নিজ চোখে । নিশ্চিত হয়ে
পরবর্তী একমাস ধরে মহানন্দে, বিপুল উদ্যমে ফেনিস কাউন্সিলের
সর্বনাশের কাজটা সেরেছিল ও ।

সেই কুয়াশা! হারিয়ে গিয়েছিল কুয়াশার অন্তরালে।

‘যদূর জানি, বিপদের মুখে আছে তোমার বান্ধবী তিশা,’ ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা। ‘ওরা ওকে তুলে আনতে চাইছে।’

কুয়াশার সঙ্গী ধীর গতিতে ঘুরে দাঁড়াল, চোখে-মুখে বিন্দুমাত্র চিন্তার ছাপ নেই।

কাঁচের টাওয়ার ধসে পড়তেই ছাত থেকে খোলা আকাশে লাফিয়ে পড়েছে রানা ও খবির, এবং পনেরোতলা থেকে পড়বার সময় ব্যবহার করেছে ম্যাগন্থক। ম্যাগনেটিক হেড গিয়ে লেগেছে ইয়াক ফাইটারের নাকের নীচে। সামান্য ঠক্ আওয়াজ শুনতে পায়নি কুয়াশা। আকাশ থেকে পড়তে শুরু করে হঠাৎ করেই থেমে গেছে রানা এবং খবিরের পতন।

এরপর বিমান ক্যবের দালানের ছাতে নেমে আসবার আগেই ইন্টারনাল স্পুলার ব্যবহার করেছে ওরা, উঠে এসেছে ফাইটারের নাকের কাছে। নীচে উড়ছিল ঘন ধুলো, ওদেরকে দেখেনি মার্সেনারিরা।

ফাইটার বিমান ল্যান্ডিংয়ের সময় অসুবিধা হয়েছে, ছাতের অজস্র ধুলোবালি ও আবর্জনা লেগেছে চোখে-মুখে। তবে ক্ষতি হয়নি ওদের।

ইয়াক-১৪১ নামতেই নীচ থেকে গড়িয়ে সরে গেছে ওরা।

তখন রানার সহজ পরিকল্পনা ছিল: যেভাবে হোক দখল করবে বিমানটা।

খবির চেনে না রহস্যমানব বৈজ্ঞানিক কুয়াশা বা তার সঙ্গীকে, তাদের দিকে তাক করে রেখেছে অস্ত্র। ব্যাটা আবার বাংলা বলে!

‘আপনিও কি বাউন্টি হান্ট করছেন?’ কুয়াশার কাছে জানতে চাইল রানা।

‘না,’ আস্তে করে মাথা নাড়ল বিজ্ঞানী।

‘এখানে এলেন কীভাবে?’

‘জানা ছিল তোমার গর্দান নিতে চাইছে বাউন্টি হান্টাররা। কাজেই খোলা ছিল চোখ-কান। জানলাম, ফ্রান্সের এক দুর্গে তোমাদের মাথা পৌঁছে দিলে প্রতি জনের জন্যে দেবে তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার।’

‘আপনি জানেন কোন্ দুর্গে নিতে হবে?’

‘ফো’ট্রেস দো শ্যাটিয়ন।’

‘ফো’ট্রেস দো শ্যাটিয়ন,’ বিড়বিড় করল রানা। ‘এত টাকা কারা দিচ্ছে, জানেন? আমাদেরকে খুন করতে চাইছে কেন?’

মাথা নাড়ল কুয়াশা। ‘এখনও জানতে পারিনি। আমার লোক খোঁজ-খবর করছে। ...এবার রানা, তোমার রওনা হয়ে যাওয়াই ভাল।’

‘আপনাদেরও থাকার উপায় নেই,’ বলল রানা। চট করে হাতঘড়ি দেখল। ‘এগারো মিনিট পর চারপাশ নরক করে দেবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল।’

‘তুমি রওনা হও, আমাদের অন্য ব্যবস্থা আছে,’ বলল কুয়াশা।

বিজ্ঞানীর চোখে চাইল রানা। বুঝে গেল, যা বলবার বলে দিয়েছে প্রতিভাবান মানুষটা।

ঘুরেই বিমানের মইয়ের দিকে চলল রানা, কয়েক সেকেন্ডে উঠে পড়ল ককপিটে।

রানাকে যেন বন্দুক হাতে রক্ষা করছে মস্ত মনের রহস্যময় বিজ্ঞানী কুয়াশা।

রানার পিছনের সিটে বসে খবির বলল, ‘স্যর, একদিন আমেরিকানদের এই কচুর ম্যাগজক সত্যিই কাজে আসবে না। সেদিন...’

‘তুমি নেতিবাচক মনের লোক, খবির। এখন থেকে ইতিবাচক চিন্তা শুরু করো, নইলে নিজেও সুখী হবে না, কাউকে সুখীও

করতে পারবে না।’

ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রানা, আগেও ব্যবহার করেছে হ্যারিয়ার বিমান, বুঝতে অসুবিধা হলো না কীভাবে চালাতে হবে ইয়াক-১৪১ স্ট্রাইক ফাইটার জেট।

ভার্টিকাল টেক-অফ থ্রাস্টার চালু করল রানা, ছাত থেকে ভেসে উঠল বিমান। ব্যবহার করল আফটারবার্নার, বিদ্যুৎদ্বিগে ছুটতে শুরু করেছে বিমান সাইবেরিয়ার টিলাগুলোর মাথা ছুঁয়ে।

নিচু দালানের ছাতে ঢ্যাঙা সঙ্গীর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। যেন মস্ত এক কালো বাদুড়, পতপত করে উড়ছে তার কালো আলখেল্লা।

ছয়

পিছনে হারিয়ে গেছে পরিত্যক্ত রাশান ইন্সটলেশন। চুপ করে বসে আছে রানা ইয়াক-১৪১ স্ট্রাইক ফাইটারের ককপিটে।

পিছনের সিট থেকে বলল খবির, ‘স্যর, কী ভাবছেন? আমরা কি ওই দুর্গে যাব?’

‘যাওয়া উচিত,’ বলল রানা। ‘তবে আপাতত ওখানে যাওয়া জরুরি নয়।’

এবেলহার্ডের কাছ থেকে পাওয়া বাউন্টি লিস্ট পকেট থেকে বের করল রানা। ‘জরুরি এটা,’ আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল কাগজে। ভাবছে, এই পনেরোজনের মাঝে মিল কোথায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে: প্রত্যেকে এরা লড়াকু মানুষ হিসাবে

আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ।

ব্রিটেনের লোক স্কট এম. ক্যাপলান, কাজ করে এসএএস-এ, রিচার্ড কে. ডসন এমআই-৬-এর নাম করা গুপ্তচর । ইন্ডী রাষ্ট্র ইজরায়েলের আইএএফ-এ কাজ করে পাইলট আব্রাম অ্যামনন । মেজর জেনারেল রেইমণ্ড কে. গ্র্যাঞ্জার ইউএসএ-এর মেরিন-বাহিনীর লোক । আমেরিকার ওই বাহিনীতে এত কম বয়সে তাঁর মত অত উচ্চ পদে খুব কম লোকই পৌঁছতে পেরেছে ।

মিডল-ইস্টের লেবানন ও সৌদির দুই সন্ত্রাসী আজিজ আমিন এবং হোসেন আলাল রয়েছে তালিকায় ।

হোসেন আলাল... ভাবতে শুরু করেছে রানা ।

ওই লোক ছিল ওসামা বিন লাদেনের বামহাত ।

উত্তর আফগানিস্তানে তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে আমেরিকান বাহিনী । তাদেরই আরেকদল খুঁজছে তাকে কঙ্গোর মাউন্ট স্ট্যানলি পর্বতে । ওখানে রয়েছে তিশা ও নিশাত ।

কুয়াশার বক্তব্য মনে পড়ল রানার ।

বিজ্ঞানী বলেছিল: ‘যদূর জানি, বিপদে আছে তোমার বান্ধবী তিশা ।’

এবার কার্ট কে. এবেলহার্ডের কথাগুলো খচখচ করতে লাগল রানার মনে ।

লোকটা বলেছে: ‘দরকার পড়লে আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবীদের আটকে রাখবে বাউন্টি-হান্টাররা... গর্ত থেকে বের করে আনবে তোমাদের ।’

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা ।

কঙ্গোর মাউন্ট স্ট্যানলি পর্বতে খোঁজা হচ্ছে হোসেন আলালকে । তার মাথা নেয়ার ফাঁকে তিশা বা নিশাতকে আটকে ফেললে ক্ষতি কী বাউন্টি হান্টারদের?

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না রানার ।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তের দিকে সেট করল ইয়াকের অটো-পাইলট। গন্তব্য আফ্রিকার কঙ্গো।

সার্জেন্ট খবিরকে নিয়ে মাসুদ রানা পাবলো-৯ ত্যাগের এগারো মিনিট পর ইন্সটলেশনের আকাশে দেখা দিল সাদা ধোঁয়ার দীর্ঘ আঙুল। নামছে টাইফুন সাবমেরিনের এসএস-এন-২০ মিসাইল। বিশ মিনিট আগে ওটাকে উৎক্ষেপ করা হয়েছিল।

বজ্রপাতের মত সুপারসনিক গতিতে আসছে পাবলো-৯ লক্ষ্য করে।

ছয় হাজার ফুট...

তিন হাজার ফুট...

এক হাজার ফুট...

পর মুহূর্তে ড্রাই ডকের চার শ' ফুট উপরে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো ভয়ঙ্কর মিসাইল।

লক্ষ-কোটি টুকরো হয়েছে পটকার মত।

পাশ থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট এক লেসার-গাইডেড মিসাইল ধ্বংস করে দিয়েছে ওটাকে।

কোনও ক্ষতি না করেই মিসাইলের চকচকে টুকরো ঝরঝর করে ঝরে পড়ল পাবলো-৯-এর বুকে।

ধোঁয়া সরে যেতেই শ্রম-নগরীর আকাশে দেখা দিল দ্বিতীয় ভাসমান ফাইটার জেট বিমান।

ওটা আগে আসা বিমানের চেয়ে সরু, দৈর্ঘ্যে ঢের বেশি। দেহ কালো রঙের। অন্য রং বলতে শুধু নোজ কোন্ সাদা। বিমানের ডানাদুটো ঢালু হয়ে সামান্য সামনে বেড়েছে। ককপিটে বসতে পারে দু'জন।

কালো বিমান সুখোই এস-৩৭। রাশার তৈরি, মৌমাছির মত ভাসতে পারে, পুরনো ইয়াক-১৪১ বিমানের চেয়ে অনেক

আধুনিক । বেশ কিছুদিন হলো চোরাই অস্ত্র বাজারে বিক্রি হচ্ছে এ জিনিস ।

সাইবেরিয়ান বেসের ওয়্যারহাউসের আকাশে ওটা যেন কোনও বাজপাখি । নীচে চেয়ে পরিস্থিতি বুঝতে চাইছে পাইলট ।

রাস্তাগুলো নির্জন, কোথাও দেখা গেল না একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র মার্সেনারি ।

কয়েক মিনিট সাভেইল্যাস করবার পর প্রকাণ্ড ড্রাই ডক ওয়্যারহাউসের একপাশে খোলা জমিতে নেমে এল বিমান ।

ককপিট থেকে নামল মাঝারি আকৃতির এক লোক, হাতে এএমডি অ্যাসল্ট রাইফেল । জিনিসটা হাঙ্গেরির তৈরি, একে-৪৭-এর মতই । অবশ্য সামনে রয়েছে হ্যাণ্ডগ্রিপ ।

চারপাশ দেখে নিল সে ।

শহরে মাসুদ রানাকে খুঁজতে শুরু করবে কি না ভাবছে ।

কিন্তু তার ডানদিকের বরফ ঢাকা জমি থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দীর্ঘদেহী এক লোক, ডানহাতে অস্ত্র । বামহাতে খপ করে ধরল পাইলটের ঘাড় । তা মাত্র তিন সেকেন্ডে জন্য ।

নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারিয়ে চলে পড়ল পোল্যাণ্ডের বাউন্টি হান্টার । ছেড়ে দিতেই মুখ খুবড়ে পড়ল তুষারে ।

একটু দূরের ড্রাই ডক ওয়্যারহাউসের আড়াল থেকে বেরোল সাত ফুটি দানব । পিটপিট করে দেখছে বসকে ।

কুয়াশা একপলক দেখল বাউন্টি হান্টারকে, তারপর স্যাণ্ডাৎকে পাহারা দিতে ইশারা দিল । নিজে চলে গেল ড্রাই ডকের ছোট এক গেটের সামনে ।

এদিক দিয়েই ভিতরে ঢুকেছিল মাসুদ রানা ।

সাদা তুষারের বুকে বিক্ষিপ্ত সব পদচিহ্ন ।

ড্রাই ডক ওয়্যারহাউসে ঢুকল কুয়াশা ।

কেউ নেই ।

ভিতরে রয়ে গেছে গোলাগুলির কটু ধোঁয়া ।
ড্রাই ডকের মাঝে চুপ করে বসে আছে টাইফুন সাবমেরিন ।
উধাও হয়েছে একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ
মার্সেনারিরা ।

কোথাও দ্বিতীয় কোনও সাবমেরিন নেই ।
মেঝেতে ডেল্টা ডিটাচমেন্ট সৈনিকদের লাশ, কেটে নেয়া
হয়েছে একটা লাশের মাথা ।

পুরস্কার সংগ্রহ করছে বাউন্টি হান্টাররা ।
ঝুঁকে একটা লাশ স্পর্শ করল কুয়াশা ।
দেহ এখনও উষ্ণ ।
রানার সঙ্গে আসা আমেরিকান সৈনিক টমি ম্যাগানের লাশ ।
ড্রাই ডকের পাশে উপুড় হয়ে ভাসছে কয়েকটা মৃতদেহ ।
মাপা পদক্ষেপে সি গেটের পাশে চলে গেল কুয়াশা । দেখে
নিল কীভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে সুড়ঙ্গের ফটক ।

মনে মনে রানার প্রশংসা না করে পারল না বিজ্ঞানী ।
সঙ্গীরা মারা যাওয়ার পর ফাঁদে আটকা পড়েছিল বাঙালি
গুপ্তচর । তখন উড়িয়ে দিয়েছে ড্রাই ডকের সি গেট । যেসব
মার্সেনারি ওর পিছু নিয়েছিল, তাদেরকে শেষ করেছে জলোচ্ছ্বাস
তৈরি করে ।

প্রকাণ্ড দালানের মাঝের লেকের পারে থামল কুয়াশা ।

মেঝের ছাপগুলোর দিকে চাইল ।

লোকগুলোর পায়ে ছিল কমব্যাট বুট ।

এরা বোধহয় পরে এসেছে ।

বুটের সোলের ছাপ নানা ধরনের ।

ভেজা জায়গা মাড়িয়ে এদিকের মেঝেতে উঠেছে ।

কুয়াশা আঁচ করল, দ্বিতীয় কোনও সাবমেরিন এসেছিল ।

তার মানেই একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ ।

খুব দ্রুত সরে পড়েছে তারা ।

অনেক বেশি জলদি ।

যে বা যারা বাউন্টি হাণ্টের আয়োজন করেছে, সে বা তারা এদেরকে নতুন কোনও তথ্য জোগান দিয়েছে ।

একটা আওয়াজ শুনল কুয়াশা, বাট করে ঘুরে চাইল ক্ষিপ্ত বেজির মত । উঁচু করে ধরেছে খাটো ব্যারেলের রেমিংটন ৮৭০ পাম্প শটগান ।

ওই আওয়াজ এসেছে ওয়ারহাউসের দোতলার ব্যালকনি থেকে ।

কয়েক সেকেন্ডে কাছের রাং-ল্যাডারের পাশে পৌঁছে গেল কুয়াশা, দ্রুত উঠে এল ছোট, ইন্টারনাল অফিসের ব্যালকনিতে ।

অফিসের দরজার কাছে পড়ে আছে দুটো দেহ ।

প্রথমজন মারা গেছে ।

অন্যজন সম্ভবত মার্সেনারি । পাশেই ফ্রেঞ্চদের তৈরি অ্যাসল্ট রাইফেল । লোকটা এখনও জীবিত ।

তবে বেশিক্ষণ নেই সে ।

গুলি লেগেছে মুখে, উড়ে গেছে চোয়ালের বড় একটা অংশ ।

লোকটাকে আরেকবার দেখল কুয়াশা । চোখে কোনও করুণা নেই ।

মার্সেনারি ডানহাত বাড়িয়ে দিল কুয়াশার দিকে । চোখে মিনতি । ‘ভাই... দয়া করুন... সাহায্য করুন...’

এক পলক দেখল কুয়াশা ।

এই লোক বাঁচবে না ।

‘কারও কিছু করার নেই, চুপচাপ মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করো,’ ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা ।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে মার্সেনারি । ‘তা হলে মেরে রেখে যান, সেটাই অনেক দয়া হবে । ওভাবে বাঁচতে দিন!’

ঘুরে চাইল কুয়াশা, পরক্ষণে বন্দুকের এলজি শেল গেঁথে দিল
লোকটার মগজে ।

পাঁচ মিনিট পর কালো, সরু সুখোই অ্যাটাক ফাইটারের
সামনে হাজির হলো কুয়াশা । ওর পিছন পিছন বিমানের ককপিটে
উঠে পড়ল সাত ফুটি মইয়ের মত লোকটা ।

একমিনিট পেরুবার আগেই আকাশে ভাসল ফাইটার, চলেছে
পশ্চিম লক্ষ্য করে ।

সুখোই রওনা হতেই নড়ে উঠেছে বাউন্টি হান্টার পোলিশ ।
উঠে বসে চেয়ে রইল খুইয়ে বসা ফাইটারের দিকে । তার কাছে
তথ্য আছে, বুঝতে পারল কোথায় চলেছে ওই বিমান ।

সরু হয়ে গেল পোলিশের দুই চোখ ।

সাত

অক্টোবরের ১৩ তারিখ ।

ব্রিটানি, রিপাবলিক অভ ফ্রান্স ।

ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়ন ।

ফ্রান্সের রক্ষা উত্তর-পশ্চিম এলাকায় পাহাড়ি এক দুর্গ ওটা,
অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ।

১২৮৮ সালে তৈরি করেছিল উন্মাদ এক কাউন্ট— জ্যান দো
শ্যাটিয়ন ।

মোটোও সাধারণ কোনও ফ্রেঞ্চ দুর্গ নয় এ ফো'ট্রেস ।

ফ্রান্সের বেশিরভাগ ফোর্টিফায়েড দালান তৈরির সময় দুর্গের

সৌন্দর্যের দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে, কিন্তু ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়ন নির্মাণকালে এর ব্যবহারিক যৌক্তিকতার উপর জোর দেয়া হয়।

গম্ভীর চেহারার কুৎসিত, পাথরের দুর্গ।

নিরেট পাথরের পুরু দেয়াল জায়গায় জায়গায় ক্ষত-বিক্ষত। সে আমলের অন্যান্য দুর্গের তুলনায় ঢের আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহৃত হয়েছে। নির্মাণের সময় জায়গা বাছাই করা হয়েছিল দক্ষতার সঙ্গে, ফলে সেসময় এ দুর্গ আক্রমণ ছিল আত্মঘাতী।

মূল কারণ: এ দুর্গ তৈরি হয়েছে একটামাত্র প্রকাণ্ড পাথরখণ্ডের উপর। ওই পাথর উঠে এসেছে সাগরের বুক থেকে। দানবীয় বোল্ডার ও মস্ত দুর্গ রয়েছে উপকূলের উঁচু জমি থেকে পুরো ষাট গজ দূরে। মাঝে ডাইনীর মত খলখল করে হাসছে খ্যাপা সাগর।

পাতাল থেকে সাগর-ফুঁড়ে-ওঠা পাহাড়ের তিনদিকে দুর্গের পুরু প্রাচীর। ওদিকে সোজা খাড়াভাবে সাগরে নেমেছে পাহাড়। ওই ভিত্তির পায়ে ঠোট ছোঁয়াচ্ছে আটলান্টিক। দুর্গ রয়েছে পুরো চার শ'ফুট ওপরে।

স্থলভূমির সঙ্গে যোগাযোগ বলতে ষাট গজ দীর্ঘ পাথরের সেতু। দুর্গের দিকে সেতুর প্রথম বিশ গজ ড্রব্রিজ, প্রয়োজনে তুলে নেয়া যায়।

এ মুহূর্তে ড্রব্রিজ পেরিয়ে দুর্গের আঙিনায় পা রাখল দুই বাউন্টি হান্টার। একবার দেখে নিল গম্ভীর, কালো, প্রকাণ্ড দুর্গটাকে। এত উপরে আটলান্টিকের ঝোড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিতে চাইছে তাদেরকে।

দুই বাউন্টি হান্টার তাদের মাঝে সাদা একটা বাক্স বহন করছে। বাক্সের উপর আঁকা রেড ক্রস। নীচে লেখা:

‘হিউম্যান অর্গান: দু নট ওপেন— এক্সপ্রেস ডেলিভারি।’

ফো'ট্রেসের সাত শ' বছরেরও বেশি পুরনো পোর্টকালিসের

সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল দুই বাউন্টি হাণ্টার। এক মুহূর্ত পর ইন্তত করে ঢুকে পড়ল দুর্গের ভিতর।

উঠানে ঢুকতেই ছোটখাটো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর পরনে কড়া ইস্ত্রি করা সুট। নাকের উগায় ঝুলছে ওয়ায়ার ফ্রেমের পিন্স-নেয।

‘শুভ সকাল, মোসিউস্,’ বললেন ভদ্রলোক। ‘আমি মোসিউ ড্যাবলার। ...আপনাদেরকে কী সাহায্য করতে পারি?’

দুই আমেরিকান বাউন্টি হাণ্টারের পরনে সুয়েড জ্যাকেট ও জিন্স। পায়ে কাউবয় বুট। পরস্পরকে দেখল তারা।

আকারে বড়জন ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল, ‘আমরা এসেছি দু’একটা বাউন্টির পুরস্কার নিতে।’

মোসিউ ড্যাবলার ভদ্রতা করে হাসলেন। ‘নিশ্চয়ই। ...আর, কী নাম আপনাদের?’

প্রকাণ্ডেহী বাউন্টি হাণ্টার জানাল, ‘আমি ফ্যারেল, অ্যালেক্স ফ্যারেল। টেক্সাস রেঞ্জার। ...আর এ আমার ভাই নাইজেল।’

সম্মান দেখিয়ে বাউ করলেন ড্যাবলার। ‘আচ্ছা, বিখ্যাত ফ্যারেল ব্রাদার। আসুন, ভেতরে যাওয়া যাক।’

দুই বাউন্টি হাণ্টারকে পথ দেখিয়ে মস্ত এক গ্যারাজে নিয়ে এলেন তিনি। ভিতরে দেখা গেল দুর্লভ, দামি গাড়ির কালেকশন। শুরুতেই লাল রঙের ফেরারি মডেনা, পাশেই রূপালি পোর্শ জিটি-২, এরপর অ্যাস্টন মার্টিন ভ্যানকুইশ। এ ছাড়া রয়েছে বেশকিছু রেসিং র্যালি কার। আর, এই শো-রুমের ঠিক মাঝখানে রাজার মত গর্বিত ভঙ্গিতে বসে আছে একটা গাড়ি, চকচকে কালো এক ল্যামবোরঘিনি ডায়াবলো।

সুপারকারগুলো দেখে মুগ্ধ হয়েছে দুই আমেরিকান বাউন্টি হাণ্টার। তাদের পরিকল্পনা ঠিক চললে শীঘ্রি তারাও দু’একটা আমেরিকান পেশিবহুল গাড়ি ব্যবহার করবে।

‘ওগুলো কি আপনার, স্যর?’ ঘোঁৎ করে উঠল অ্যালেক্স ফ্যারেল। মোসিউ ড্যাবলারের পিছনে হেঁটে চলেছে।

সামান্য হেসে চুপ করে কিছু যেন ভাবলেন ড্যাবলার। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, ‘না, ওগুলো আমার নয়। আমি সুইটযার-ল্যাণ্ডের সামান্য এক ব্যাঙ্কার, কাজ করছি ক্লায়েন্টের হয়ে। ফাণ্ড বাটোয়ারা করে দেব। ...এসব গাড়ি দুর্গের মালিকের, আমার নয়।’

গ্যারাজের শেষে পাথরের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিচু এক সমতলে নামিয়ে আনলেন ড্যাবলার দুই ফ্যারেল ভাইকে।

তারা যেন প্রবেশ করেছেন মেডিইভেল আমলে।

পৌছে গেলেন গোলাকার পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা অ্যান্টি-রুম। এ ঘর থেকে ডানে গেছে সরু সুড়ঙ্গ। পাতালপুরির দু’পাশের দেয়ালে ধিকিধিকি জ্বলছে মশাল। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে হলদেটে আগুনের আলোছায়া।

এখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন মোসিউ ড্যাবলার। ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই ভাইয়ের ছোটজনের উদ্দেশে বললেন, ‘তরুণ মোসিউ নাইজেল, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আপনার ভাই আর আমি পরীক্ষা করব বাউন্টি।’

ছোট ভাইকে নিশ্চিত করতে মাথাটা সামান্য নড করল অ্যালেক্স ফ্যারেল।

প্রকাণ্ডদেহী ফ্যারেলকে নিয়ে আবারও হাঁটতে লাগলেন ড্যাবলার। মশালের আলো ভৌতিক করে তুলেছে পরিবেশ।

সুড়ঙ্গ শেষে অপূর্ব এক অফিস কামরা। একদিকের গোটা দেয়াল পিকচার উইণ্ডো। ওদিক দিয়ে দেখা গেল আদিগন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের অকল্পনীয়, অপরূপ দৃশ্য।

পাথরের সুড়ঙ্গের শেষে দাঁড়িয়ে পড়লেন মোসিউ ড্যাবলার। ‘প্লিয, আপনার কোনও আপত্তি না থাকলে কেসটা দিন।’

সাদা মেডিকেল ট্রান্সপোর্ট বাক্স ড্যাভলারের হাতে তুলে দিল
বাউন্টি হান্টার।

মোসিউ ড্যাভলার বললেন, ‘এখানে একটু অপেক্ষা করতে
হবে।’

অফিসে গিয়ে ঢুকলেন ড্যাভলার, দরজার বাইরে রয়ে গেল
টেক্সান বাউন্টি হান্টার। সে এখনও পাথুরে সুড়ঙ্গ।

ডেস্কের সামনে গেলেন ড্যাভলার, ওখান থেকে তুলে নিলেন
ছোট রিমোট কন্ট্রোল, টিপ দিলেন নির্দিষ্ট বাটনে।

ঘটাং! ঘটাং! ঘটাং!

সুড়ঙ্গের ভিতর আটকা পড়ল অ্যালেক্স ফ্যারেল।

ছাত থেকে নেমেছে ইস্পাতের দেয়াল।

প্রায় বাস্তবের মত করে তুলেছে সুড়ঙ্গ।

একইসময়ে দুই ইস্পাতের দেয়াল আড়াল করেছে গোলাকার
পাথরের অ্যান্টি-রুমের দুই দরজা।

উপরের ওই গ্যারাজে যাওয়ার উপায় নেই এখন।

সবু সুড়ঙ্গে ঢুকবার মুখেও পুরু ইস্পাতের দেয়াল।

ওদিকে রয়ে গেছে নাইজেল ফ্যারেলের বড় ভাই।

তৃতীয় ইস্পাতের দেয়াল আলাদা করেছে সুড়ঙ্গ থেকে
অফিস।

নিজ অফিসে আলাদা হয়ে গেছেন মোসিউ ড্যাভলার।

প্রতিটি ইস্পাতের দরজায় রয়েছে খুদে থার্মোপ্লাস্টিকের
জানালা।

নিজ নিজ বন্দিশালা থেকে বাইরে দেখতে পাবে দুই বাউন্টি
হান্টার।

ছাতের স্পিকারে ভেসে এল মোসিউ ড্যাভলারের কণ্ঠ:
‘জেন্টলমেন, শান্ত থাকুন। নিশ্চয়ই বোঝেন, কোটি ডলারের
বাউন্টি হান্টে কত মানুষ আগ্রহী হবে? অল্প কথায় বলা যায়:

অনেকেই টাকার লোভে নিজের কপাল ঠুকে দেখতে চাইবে। আমি আপনাদের অসম্মান করছি না। তবে আপাতত যেখানে আছেন, ঠিক সেখানেই থাকবেন— আর আমি পরীক্ষা করব আপনারা সঠিক মানুষের মাথা এনেছেন কি না।’

মেডিকেল ডেলিভারি বাক্স ডেস্কের উপর রাখলেন ড্যাবলার, দক্ষ হাতে খুলে ফেললেন ঢাকনি।

তাঁর দিকে ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে আছে দুটো বিচ্ছিন্ন মুণ্ড।

একজনের মুখে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ছিট-ছিট দাগ, চেয়ে আছে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে।

অন্য মাথাটার বেহাল অবস্থা। খুব পুড়ে গেছে বামপাশ।

মোটোও বিরক্ত মনে হলো না ড্যাবলারকে।

দু’হাতে সার্জিকাল গ্লাভস্ পরে নিল, শান্ত চেহারায় বাক্সের ভিতর থেকে বের করে আনল রক্তের দাগওয়ালা মাথাটা। কমপিউটারের পাশের স্ক্যানিং ডিভাইসে রাখল।

‘আচ্ছা! এ মস্তক কার বলে দাবি করছেন আপনি?’ ইন্টারকমে অ্যালেক্স ফ্যারেলের কাছে জানতে চাইল ড্যাবলার।

‘ইজরায়েলি ডেনিস ই. ম্যাকিন,’ বলল বাউন্টি হান্টার।

‘ডেনিস ই. ম্যাকিন,’ কমপিউটারের কিবোর্ডে কয়েকটা টোকা দিল ড্যাবলার। ‘হুম... মোসাদ এজেন্ট... ডিএনএ-র কোনও রেকর্ড নেই। বেশিরভাগ ইজরায়েলির মতই। তাতে কিছু যায় আসে না। এ বিষয়ে আমাকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্য উপায় ব্যবহার করতে হবে।’

কাটা মাথার নীচে স্ক্যানিং ডিভাইস চালু করল ড্যাবলার।

সিএটি স্ক্যানারের মতই, বিচ্ছিন্ন মাথার উপর বেশ কয়েক ধরনের লেসার বিম ব্যবহার করল যন্ত্রটা।

স্ক্যানিং শেষে রক্তাক্ত মাথার মুখ হাঁ করল ড্যাবলার, কয়েকটা দাঁত ধরল লেসার স্ক্যানারের উপর।

কিবোর্ডে আবারও কয়েকটা বাটন টিপল।

কমপিউটারের রেকর্ডের সঙ্গে ছিন্ন মাথার অ্যানালাইসিস করা রেকর্ড মিলাতে শুরু করেছে।

বিপ্ করে উঠল কমপিউটার।

মাথা দুলিয়ে হেসে ফেলল মোসিউ ড্যাবলার।

‘ক্রস-রেফারেন্স অনুযায়ী স্কোর পাওয়া গেল ৮৮.২৩%। আগেই আমাকে বলা হয়েছে, ভেরিফিকেশন করার সময় ৭৫% বা তার বেশি মিললে বাউন্টির টাকা বুঝিয়ে দিতে হবে। জেন্টলমেন, প্রথম মাথার ক্র্যানিয়াল শেপ এবং ডেন্টাল রেকর্ড অনুযায়ী এ লোকই মোসাদের মেজর ডেনিস ই. ম্যাকিন। আপনারা এখন তেত্রিশ মিলিয়ন ডলারের মালিক।’

পাথরের আলাদা খাঁচার ভিতর হাসল দুই বাউন্টি হাণ্ডার।

এবার দ্বিতীয় মাথা নিল ড্যাবলার। জানতে চাইল, ‘আর ইনি কে?’

টেক্সাস রেঞ্জার অ্যালেক্স ফ্যারেল বলল, ‘আজিজ আমিন। হামাসের লোক। তাকে পেয়েছি মেক্সিকোতে। ড্রাগ লর্ডের কাছ থেকে এক চালান এম-১৬ রাইফেল কিনছিল।’

‘সত্যি, কী আশ্চর্য,’ বলল ড্যাবলার।

দ্বিতীয় মাথাটা জায়গায় জায়গায় পুড়ে কালো। দাঁতের অর্ধেক উধাও। গুলি বা হাতুড়ির আঘাতে এমন হতে পারে।

ক্র্যানিয়াল এবং ডেন্টাল লেসার টেস্ট শুরু করল ড্যাবলার।

শ্বাস আটকে অপেক্ষা করছে দুই বাউন্টি হাণ্ডার। বুঝতে শুরু করেছে, কেন ড্যাবলার দুই মাথা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখছে।

করোটি এবং ডেন্টাল রেকর্ড থেকে মিলল ৭৮.৭৬% স্কোর।

মোসিউ ড্যাবলার বলল, ‘সন্দেহ নেই মারাত্মক আগুন এবং বুলেটের ক্ষতির কারণে পার্সেন্টেজ হয়েছে ৭৮.৭৬%। আর আপনারা তো জানেনই, আমাকে আগেই বলে দেয়া হয়েছে, কী

করতে হবে। ছিন্ন মস্তকের ৭৫% মিললে বা তার চেয়ে বেশি মিললে আমি বুঝিয়ে দেব পুরো টাকা।’

এক কান থেকে আরেক কানে চলে গেল দুই ভাইয়ের হাসি।

‘কিন্তু কথা রয়ে যায়, নির্দিষ্ট ব্যক্তির ডিএনএ-র রেকর্ড না পেলে তখন দিতে হবে পুরস্কার,’ বলল ড্যাবলার। ‘কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার রেকর্ড অনুযায়ী এই লোকের ডিএনএ-র স্যাম্পল আছে।’

মুখ থেকে দপ্ করে নিভে গেল দুই ভাইয়ের হাসি। দূর থেকে পরস্পরের দিকে চাইল।

‘ও, হ্যাঁ, আমার রেকর্ড অনুযায়ী,’ আবারও শুরু করল ড্যাবলার, ‘উনিশ শ’ আটানবুই সালে স্কটল্যান্ডে বন্দি হয় আজিজ আমিন। গ্রেফতার করা হয়েছিল বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে। তখন রক্তের স্যাম্পল নেয়া হয় তার। এবং রেকর্ড করা হয় ডিএনএ।’

কথাটা শুনেই ভীষণ ভয় পেল অ্যালেক্স ফ্যারেল।

মোসিউ ড্যাবলার ততক্ষণে পোড়া মাথার বাম গালে হাইপোডারমিক নিডল গেঁথে দিয়েছে। সংগ্রহ করছে রক্ত।

ওই শুকিয়ে যাওয়া রক্ত রাখা হলো কমপিউটারের পাশের এক অ্যানালাইসার-এ।

একবার বিপ্ করে উঠল যন্ত্রটা।

আগের মত মৃদু আওয়াজ নয়, জোরালো।

ভুরু কুঁচকে ফেলল ড্যাবলার, হঠাৎ করেই গম্ভীর হয়ে গেছে। তাকে এখন মারাত্মক বিপজ্জনক লোক বলে মনে হচ্ছে।

‘জেন্টলমেন...’ বলল সে।

বরফের মূর্তির মত জমে গেছে দুই বাউন্টি হান্টার।

চুপ হয়ে গেছে সুইস ব্যাঙ্কার, ভঙ্গি দেখে মনে হলো তাকে ভীষণ অপমান করা হয়েছে। ‘জেন্টলমেন, এই মাথা নকল। এটা

আজিজ আমিনের মাথাই নয়।’

‘দাঁড়ান, একমিনিট...’ বলে উঠল অ্যালেক্স ফ্যারেল।

‘মিস্টার ফ্যারেল, দয়া করে চুপ করো,’ বলল ড্যাবলার।
‘কসমেটিক সার্জেরি যথেষ্ট ভাল ছিল। ডাক্তার ভাল প্লাস্টিক সার্জেন। ভিশুয়াল আইডেন্টিফিকেশন উধাও করতে পোড়ানো হয়েছে মাথা। চালাকি করেছে তোমরা। কিন্তু এসব কৌশল পুরনো। নতুন করে বসিয়ে নেয়া হয়েছে দাঁত। কিন্তু তোমরা জানতে না তার ডিএনএ-র রেকর্ড আছে আমাদের হাতে।’

‘না, জানতাম না,’ ঘড়ঘড় করে বলল অ্যালেক্স ফ্যারেল।

‘ম্যাকিনের মাথাও তা হলে নকল?’

‘ওটা জোগাড় করেছে আমাদের পরিচিত এক বাউন্টি হাণ্টার,’ মিথ্যা বলল অ্যালেক্স। ‘সে বলেছিল ওই মাথা...’

‘কথা যাই হোক, তোমরা আমার কাছে এনেছ, মোসিউ ফ্যারেল। কাজেই দায়-দায়িত্ব তোমাদের। পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সততা এ মুহূর্তে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। বলো, ম্যাকিনের মাথাও কি নকল?’

‘হ্যাঁ,’ চোর-চোর চেহারা করল অ্যালেক্স।

‘তোমরা আইন ভেঙেছ, মিস্টার ফ্যারেল। এটা ভয়ঙ্কর অপরাধ। এ ধরনের জালিয়াতি পছন্দ করেন না আমার ক্লায়েন্ট। আমি কি তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে বোঝাতে পারলাম?’

একটা কথাও বলল না অ্যালেক্স ফ্যারেল।

‘কিন্তু এ পরিস্থিতির কথা ভেবেই আমাকে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে,’ বলল ড্যাবলার। চাইল অ্যালেক্সের চোখে।
‘মোসিউ ফ্যারেল, তুমি যে টানেলে আছ, ওটা কী তা জানো?’

‘না।’

‘ও-আচ্ছা, আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম তোমরা আমেরিকান। নিজেদের প্রেসিডেন্টের নাম ছাড়া দুনিয়ার ইতিহাস বলতে কিছুই

জানো না। বড়জোর জানো প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীর নাম।
তোমাদের জানার কথা নয় মেডিইভেল আমলে কী ধরনের যুদ্ধ
চলত ইউরোপে। ... তোমরা কি জানো এ বিষয়ে?’

চুপ করে রইল অ্যালেক্স ফ্যারেল।

কাঁধ ঝাঁকাল ড্যাভলার। ‘মোসিউ ফ্যারেল, তুমি যে টানেলে
আছ, আগে সেখানে আটক করা হতো দুর্গে হামলাকারীদেরকে।
ওই টানেল ধরে আসত শত্রু সৈনিক, আর তখন দেয়ালের নালা
থেকে ছিটকে পড়ত ফুটন্ত তেল। ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে মরত
লোকগুলো।’

ঝট করে টানেলের দু’দিকের দেয়াল দেখল অ্যালেক্স
ফ্যারেল।

দেয়ালে সত্যিই ছাতের কাছে বাস্কেট বলের সমান সব গর্ত!

‘অবশ্য, পরবর্তীতে সামান্য আধুনিকীকরণ হয়েছে এই
দুর্গের,’ বলল ড্যাভলার। ‘নইলে নতুন টেকনোলজি কাজে
লাগানো যেত না। এবার ছোট ভাইয়ের দিকে দেখো।’

চরকির মত ঘুরল অ্যালেক্স, পিংপং বলের মত হয়ে উঠেছে
দুই চোখ। পুরু ইস্পাতের দরজায় বসানো প্লাস্টিকের জানালা
দিয়ে চাইল ছোট ভাইয়ের দিকে।

‘এবার, বিদায় দাও ভাইকে,’ স্পিকারে বলল ড্যাভলার।

অফিসের ভিতর আবারও উঁচু করে ধরেছে রিমোট কন্ট্রোল।
নতুন একটা বাটন টিপল।

মুহূর্তে শুরু হলো যান্ত্রিক গুঞ্জন।

ওটা চালু হয়েছে নাইজেলের গোলাকার অ্যান্টি-রুমে।

ক্রমেই বাড়ছে গুঞ্জন।

যেন লাখ লাখ ভিমরুল উড়তে শুরু করেছে।

প্রথমে মনে হলো কিছুই হচ্ছে না নাইজেল ফ্যারেলের।
তারপর হঠাৎ করেই ঝটকা খেল সে। বুকে এসে ঠেকল চিবুক।

ডানহাতে খামচে ধরল বুক। পরক্ষণে চেপে ধরল দুই কান।
পরের সেকেণ্ডে দুই কান থেকে ছিটকে বেরোল তাজা রক্ত।

বিকট চিৎকার জুড়েছে সে।

অসহায় চোখে ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইল অ্যালেক্স
ফ্যারেল। তার চোখের সামনে ঘটছে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা।

তীব্র হয়ে উঠেছে গুঞ্জনের আওয়াজ, হঠাৎ করেই বিস্ফোরিত
হলো তার ছোট ভাইয়ের বুক। ছিটকে বেরোল গোটা বুকের
খাঁচা। ফিনকি দিয়ে নানাদিকে গেল রক্ত, সঙ্গে মাংস ও শিরা।

অ্যান্টি-রুমের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল নাইজেল ফ্যারেল।

তার আগেই চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে দৃষ্টি।

ছিন্নভিন্ন বুক নিয়ে মরে পড়ে থাকল সে।

ভীষণ চমকে গেছে অ্যালেক্স ফ্যারেল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল,
সেখানেই চরকির মত ঘুরল। মুক্তির জন্য চারপাশে চাইল।

পালাবার পথ নেই কোথাও!

গলা ফাটিয়ে চাঁচিয়ে উঠল অ্যালেক্স ফ্যারেল, ‘হারামজাদা-
কুত্তার বাচ্চা! তুই বলেছিলি সৎ থাকলে আমাদেরকে ছেড়ে দিবি!’

শীতল হাসল ড্যাবলার। ‘বোকা আমেরিকান! ভাবছ প্রাণ-
ভিক্ষা চাইবে আর মাফ পেয়ে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে? আমি
বলেছিলাম, সততা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এই
ক্ষেত্রে আমি ঠিক করেছি, তোমাদেরকে সাহায্য করব না।’

ছোট ভাইয়ের ক্ষত-বিক্ষত লাশ চোখে পড়ছে জ্যেষ্ঠ
ভাইয়ের। ‘তা হলে ওর মত করে আমাকে শেষ করবি তুই?’

বাঁকা হাসল ড্যাবলার। ‘ওভাবে নয়। তোমার মত নই, আমি
ইতিহাসের ভক্ত। কখনও কখনও পুরনো পথ অনেক বেশি
আনন্দদায়ক।’ রিমোট কন্ট্রলের তৃতীয় বাটন টিপল সুইস
ব্যাঙ্কার।

ছাতের গর্তগুলো থেকে অ্যালেক্স ফ্যারেলের উপর ঝরঝর

করে ঝরতে শুরু করল উত্তপ্ত তেল। সব মিলে এক হাজার লিটার।

এক ফোঁটা তেল পড়তেই ছ্যাৎ করে পুড়ছে চামড়া ও মাংস। মাত্র কয়েক সেকেন্ডে পুড়ে গেল অ্যালেক্স ফ্যারেলের গোটা মুখ। পোশাকে যেখানে লাগল তেল, সে অংশের চামড়া পুড়িয়ে ঢুকল মাংসের ভিতর।

ধুপ করে মেঝেতে পড়ল সে। ছটফট করতে করতে বিকট আতর্নাদ ছাড়ছে।

ভয়ঙ্কর কষ্ট থামল একসময়। মারা গেছে লোকটা।

কেউ শুনল না তার শেষ আতর্নাদ।

আটলান্টিক মহাসাগরের অনেক উপরে ব্রিটানির উপকূলে ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়ন, সবচেয়ে কাছের শহর কমপক্ষে বিশ মাইল দূরে।

আট

সেন্ট্রাল আফ্রিকা।

অক্টোবর ১৪।

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অভ দ্য কঙ্গো।

এ দেশ কঙ্গো ফ্রি স্টেট, বেলজিয়ান কঙ্গো, রিপাবলিক অভ কঙ্গো বা যায়ার নামে বারবার পরিচিত হয়েছে— গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত এক জনবহুল রাষ্ট্র।

প্রথম গৃহযুদ্ধে এ দেশের সরকারকে ক্ষমতা থেকে ফেলে

দিয়ে বিপুল খনিজ-সম্পদ দখল করবার জন্য হামলা শুরু করেছিল রুয়ান্ডা ও ইউগান্ডার সেনাবাহিনী। এবং উনিশ শ' আটানব্বুই সালে আবারও দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। শান্তি-চুক্তি হলো দু'হাজার তিন সালে, কিন্তু পূর্ব অঞ্চলে আসলে থামেইনি লড়াই।

বাস্তব কথা: অসহায় কোটি কোটি মানুষের জন্য কিছুই করতে পারেনি ইউএনও।

দু'হাজার নয় সালে কঙ্গোর বুকে প্রতিমাসে খুন হতো পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ। আজ পর্যন্ত মারা গেছে বিশ থেকে চুয়ান্ন লাখ মানব সন্তান। তাদের নব্বুইভাগ লড়াইয়ের কারণে খুন হয়নি, তাদেরকে মরতে হয়েছে ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়ার মত রোগের আক্রমণে। খাবারের অভাবে ধুকছে মস্ত এই দেশ, অথচ ঠিকভাবে চাষবাস করলে এবং খনিজ-সম্পদ আহরণ করলে এ দেশ হতে পারত স্বর্গ। দুর্ভিক্ষ এবং ছড়িয়ে পড়া মহামারীর মত রোগে মরছে লাখে লাখে মানুষ, তাদের বড় অংশ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু।

নতুন পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে: প্রতিবছর চার লক্ষ নারী ধর্ষিত হচ্ছে ওখানে।

বাসস্থান, পানি, খাবার এবং ওষুধের অভাবে নরক হয়ে আছে গোটা দেশ।

খুনি ওয়ার লর্ডদের সরিয়ে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে শেষপর্যন্ত এ দেশে নাক গলিয়েছে ইউএন।

মাউন্ট স্ট্যানলি পর্বতমালার পূর্বাঞ্চল।

এ অঞ্চল যেন দাউ দাউ আগুনে পোড়া নরক।

গরমের জন্য নয়, চারমাস হলো নতুন করে লড়াই বেধেছে এদিকে।

মাউন্ট স্ট্যানলি এলাকায় ইউএন-এর শান্তিবাহিনী রুখতে

চাইছে ইউগাণ্ডা সরকার সমর্থিত রক্ত-পিশাচ, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ওয়ারলর্ড কিলাই বাবাম্বার বাহিনীকে। নইলে নতুন করে খুন হবে লাখে লাখে মানুষ, দেশের অন্য সব অংশে ছড়িয়ে পড়বে যুদ্ধ।

এ দেশে ইউএন-এর শান্তিবাহিনীতে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, মালয়েশিয়া এবং আরও কয়েকটি দেশের সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈনিক।

নিজেদের কয়েকজন অফিসার ও সৈনিক পাঠিয়ে দিয়েই দায়িত্ব সেরেছে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সরকার, কিন্তু গ্যাট মেরে বসে আছে নেতৃত্বে। বরাবর তা-ই করে ওরা। এসব অফিসার-সৈনিকরা রয়ে যাচ্ছে অন্য দেশের অফিসার ও সৈনিকদের পিছনে। সোজা কথায়, গাঁ বাঁচিয়ে চলছে তারা। মরলে কালো চামড়ার মানুষ মরুক। সিএনএন, ফক্স টেলিভিশন বা বিবিসির সাংবাদিকরা এখানে এসে এসব দেখেও দেখছে না, যদিও জানে তাদের বাহিনী কী করছে। বড় করে দেখানো হচ্ছে সামান্য ক'জন সামরিক অফিসার ও তাদের সৈনিকদের। ভঙ্গি নেয়া হচ্ছে, আসল লড়াই যেন তারাই করছে।

ক'দিন হলো বৃষ্টির দেখা নেই, ধুলোর ঝড় তৈরি করে ছুটছে লেফটেন্যান্ট তিশা করিমের আট চাকার হালকা আর্মার্ড ভেহিকেল। আর মাত্র দু' শ' গজ পেরুলেই পৌঁছবে ওয়ারলর্ড কিলাই বাবাম্বার নতুন ঘাঁটি পাহাড়ি খনির সুড়ঙ্গ-মুখে।

দ্রুতগামী এলএসভির চারপাশে লাগছে শিলাবৃষ্টির মত একরাশ গুলি, পিছন থেকে খনির মুখে অসীম দক্ষতায় আর্টিলারি কাভারেজ দিচ্ছে বাঙালি সৈনিক সার্জেন্ট হালিম পাঠান।

গত পাঁচ দিনে এটা শান্তিবাহিনীর নবম হামলা।

পাহাড়ের জটিল সুড়ঙ্গ-পথ দখল করতে চাইছে তারা।

আটদিন আগে জানা গেছে, দলের সেরা সৈনিকদের নিয়ে ফ্রেঞ্চদের পরিত্যক্ত খনির ভিতর ঘাঁটি গেড়েছে কিলাই বাবাম্বা।

এরা সত্যিকারের টেরোরিস্ট।

এদের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা দিচ্ছে এ খনি, মিথেন গ্যাসের মৃত্যুফাঁদ।

কয়লা থেকে বেরোয় মিথেন, অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস। পরিবেশে পাঁচ শতাংশ থাকলে বিস্ফোরিত হতে পারে। সামান্য আগুনের ফুলকি থেকেই নরক হয়ে উঠতে পারে চারপাশ।

পরিত্যক্ত খনির ভিতর তাজা অক্সিজেন সরবরাহে রয়েছে চিমনির মত ভেন্ট, কিন্তু সম্ভব ছিল না সুড়ঙ্গগুলোর গভীরে বাতাস পাঠানো।

এককথায়: আক্রমণকারী বাহিনী চাইলেও এখানে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না।

গত কয়েকদিনে বোবা গেছে: কিলাই বাবাম্ভার সৈনিকরা আত্মসমর্পণ করবে না। এ খনির আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ-পথগুলোকে নিজেদের শেষ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে।

খনি-মুখে রয়েছে রি-ইনফোর্সড কংক্রিট আর্চওয়ে, বড় যে-কোনও ট্রাক ঢুকবে।

শুরু থেকেই প্রতি-আক্রমণ করছে বাবাম্ভার সৈনিকরা। এরা সেরা। তবে দলের অনেকে ইতিমধ্যে আবারও ফিরেছে নিজ দেশে।

খনি-মুখ থেকেই খাড়া প্রাচীরের মত আকাশে উঠেছে পাহাড়। ওখানে ছড়িয়ে অবস্থান নিয়ে স্লাইপিং করছে কিলাই বাবাম্ভার বারো-চোদ্দজন দক্ষ সৈনিক।

পাহাড়ের আরও অনেক উপরে, চূড়ায় রয়েছে খনির দুই এয়ার ভেন্ট। প্রতিটি দশ মিটার চওড়া শাফট, খনি থেকে সোজা উঠেছে আকাশে। ওগুলোর মাধ্যমে তাজা বাতাস ঢুকবার কথা খনিতে। কিন্তু কিছুদিন আগে কিলাই বাবাম্ভার সৈনিকরা ওই দুই শাফটের উপর ক্যামোফ্লেজ ঢাকনি বসিয়েছে। ফলে ভিতরের

লোকগুলোর উপর চোখ রাখবার উপায় নেই গুপ্তচর বিমানের ।

ওই দুই শাফট দখল করতে হবে এখন জাতিসঙ্ঘ বাহিনীকে ।

খনির ভিতর ঢুকে উড়িয়ে দিতে হবে ভেন্টদুটোর ঢাকনি, ওখানে বসাতে হবে টার্গেটিং লেসার । তা হলেই নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে নেবে সি-১৩০ বোমারু বিমান, নিখুঁতভাবে বোমা ফেলতে পারবে শাফটে ।

ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা ও লেফটেন্যান্ট তিশা করিমের কাজ শেষে ওদের দলের একমাত্র কর্তব্য হবে একুশ হাজার পাউণ্ড ওজনের অর্ডন্যান্স বোমা পড়বার আগেই লেজ গুটিয়ে ভেগে যাওয়া ।

আজ ভোরের প্রথম এবং দ্বিতীয় আক্রমণ সফল হয়েছে ।

সুড়ঙ্গ-পথের মুখ দখল করে নিয়েছে বাঙালি-ভারতীয়-নেপালি এবং মালয়েশিয়ান সৈনিকরা ।

অবশ্য তৃতীয় আক্রমণ ছিল আত্ম-বিস্ফোরণ ।

রাশার তৈরি রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেডের ক্রস-ফায়ারে পড়েছে শান্তিবাহিনীর সৈনিকরা । দুটো হালকা সাঁজোয়া যান বিধ্বস্ত হয়েছে, বাঁচতে পারেনি একজন সৈনিকও ।

নিশাত সুলতানা ও তিশা করিমের আক্রমণ চতুর্থ প্রচেষ্টা ।

ওদেরকে এগোবার সুবিধা দেয়ার জন্য শত্রুদের গুলি আকর্ষণ করছে আরও দুটো রণযান । এদিকে নিশাত ও তিশার পিছু নিয়ে আসছে আট চাকার আরও একটি সাঁজোয়া যান ।

তারা প্রায় পৌঁছে গেছে খনি-মুখের কাছে ।

খনির ভিতর শত্রু অবস্থানে ফেলছে মর্টার শেল ।

এতে কাজ হচ্ছে ।

অন্য দুই রণযানে লাগছে অটোমেটিক অস্ত্রের গুলি, চারপাশে বিস্ফোরিত হচ্ছে আরপিজি । কাভার নেয়া অবস্থান থেকে ছিটকে সামনে বাড়ছে তিশার এলএসভি-২৫ । পিছনে আসছে দ্বিতীয়

আট চাকার রণযান।

খনি-মুখের উপরের পাহাড়ে গিয়ে পড়ছে মর্টার শেল, এদিকে তীরের মত চলেছে এলএসডি দুটো, কয়েক সেকেণ্ড পর ঢুকে পড়ল অন্ধকার খনির ভিতর। থেমে গেল গুলিবর্ষণ, কিন্তু নিশাত-তিশা এবং ওদের সৈনিকরা ঢুকে পড়েছে নতুন এক নরকে।

আমেরিকান বড় অফিসারদের কেউ কেউ ভরসা রাখতে শুরু করেছে কালো চোখের, কালো চুলের, মিষ্টি চেহারার তিশার উপর। তারা শুনেছে: স্বয়ং আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তিশা করিমের প্রশংসা করেছেন তাদের চেয়ে ঢের বড় অফিসারদের কাছে। এরা আরও শুনেছে: গোপন এক ইউএস এয়ার ফোর্স বেসে প্রেসিডেন্টের প্রাণরক্ষা করেছিল এ মেয়ে।

সেসব বাদই যাক, দেখতে তিশা দারুণ সুন্দরী। অবশ্য কেউ তল খুঁজে পায়নি ওর। মিষ্টি হেসে সবাইকে কীভাবে যেন এড়িয়ে যায়। দু'একজন আগ্রহী হলেও সামান্যতম প্রশ্নই পায়নি। আর একটি ব্যাপার কারও চোখ এড়ায়নি: নিজের জন্য তিশার সামান্যতম চিন্তা করতে হয় না, কারণ ভয়ঙ্কর এক মহিলা ওকে সর্বক্ষণ আড়াল করে রাখে, যেন আপন ছোট বোন।

সে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। ছয় ফুট দৈর্ঘ্য নিয়ে মস্ত এক দৈত্য যেন। এক পা নকল, কিন্তু সৈনিক হিসেবে দক্ষতা তাতে এক বিন্দু কমেনি।

মাউন্ট স্ট্যানলি পাহাড়ে আজকের হামলার নেতৃত্বে রয়েছে সে। পাশে রয়েছে তিশা।

রানার ইয়াক-১৪১ অ্যাটাক ফাইটার জেট প্রায় দুই মাক গতি তুলে বাতাস চিরে ছুটে চলেছে পশ্চিম লক্ষ্য করে। মাটির মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলেছে বিমান।

প্রায় একদিন হতে চলল পাবলো-৯-এর লড়াই পিছনে ফেলে

এসেছে রানা ও খবির।

এ সময়ে রাশার নভোসিবিরস্ক-এর পরিত্যক্ত এক সামরিক বিমানবন্দরে নেমে তেল খুঁজে নিয়ে ইয়াক-১৪১ অ্যাটাক ফাইটারের পেট পুরিয়ে নিয়েছে রানা, বিশ্রাম নিয়েছে ওরা। সেখান থেকে রওনা হওয়ার পর নেমেছে কাজাখস্তানের আরেকটি পরিত্যক্ত এয়ারপোর্টে। এরপর থেমেছে তুরস্কের আরমির-এ, তখন বিসিআই-এর স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে ফিউয়েল জোগাড় করেছে। ওখান থেকে নেমেছে রানা মিশরের নিউ ভ্যালি গভার্নোরেট-এর কাছে এক মরুভূমিতে। তখন এক মিশরীয় বন্ধুর সহায়তা নিয়েছে। ট্রাকে করে তার আনা ফিউয়েল সংগ্রহ করে চলে এসেছে সে ডিআর কঙ্গোর মাউন্ট স্ট্যানলি পর্বতমালায়।

এবার খুঁজে নিতে হবে রানাকে ইউএন-এর ক্যাম্প, নামতে হবে ইয়াক-১৪১ অ্যাটাক ফাইটার নিয়ে।

শেষবার যখন ফিউয়েল নিয়েছে, তখন মিশরীয় বন্ধু যথেষ্ট হাই অকটেন আনতে পারেনি। কাজেই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে জরুরি রসদ।

অবশ্য এ নিয়ে বেশি ভাবছে না রানা। ওর গর্দান থেকে মাথা আলাদা করতে চাইছে বাউন্টি হান্টাররা, কিন্তু তিশা, নিশাত ও খবিরের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ও। স্থির করেছে, দেরি না করে সতর্ক করবে তিশা-নিশাতকে, খুলে বলবে কেন ওদেরকে জিম্মি করতে চাইছে একদল রক্তপিশাচ।

সাইবেরিয়া থেকে রওনা হওয়ার সময় রানা ঠিক করেছে, ভুলেও বিশ্বাস করবে না আলাস্কার কোনও এয়ার বেসকে। কাজেই একটু আগে ইউএস-এর ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির দুর্বল এক স্যাটেলাইটের ফ্রিকোয়েন্সি খুঁজে নিয়েছে।

ওর পরিচয় ভেরিফাই হতেই সরাসরি পেণ্টাগনের সাইফার অ্যাণ্ড ক্রিপটোঅ্যানালাইসিস ডিপার্টমেন্টের কেভিন কনলনের সঙ্গে

এইমাত্র যোগাযোগ করেছে ও।

‘হ্যাঁ, বলুন, কেভিন কনলন বলছি,’ তরুণ কণ্ঠ শুনল রানা ইয়ারপিসে।

‘হাই, কনলন, আমি মাসুদ রানা,’ বলল রানা।

‘আরেহু, মেজর রানা!’ চমকে গেছে যুবক। ‘অনেকদিন হলো দেখা নেই আপনার! কেমন আছেন? আজ কী ধ্বংস করলেন?’

‘মৃদু হাসল রানা। ‘তেমন কিছুই না। শুধু গত চব্বিশ ঘণ্টায় বন্যা তৈরি করেছি একটা টাইফুন-ক্লাস সাবমেরিনের ভেতর, লঞ্চ করেছি রাশান একটা ব্যালিস্টিক মিসাইল, ওটা সম্ভবত ধুলো করে দিয়েছে এক ড্রাই ডক আর মস্ত ওয়্যারহাউস।’

‘তা হলে তো কোনও কাজই করেননি, মেজর!’

‘আরও কিছু করতে হলে তোমার সহায়তা দরকার,’ কাজের কথায় এল রানা।

‘নির্দিধায় বলে ফেলুন।’

এয়ার বেস যিরো নাইন দুর্ঘটনার পর রানার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে কেভিন কনলনের, পছন্দ করে ওরা পরস্পরকে। রানা, নিশাত, তিশা এবং খবিরের মত কেভিন কনলনও প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সাহসিকতার জন্য পেয়েছিল ক্লাসিফায়েড মেডাল।

রানার সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে তার এরপর। রানা এজেন্সির অফিসেও এসেছে। প্রতিবার তাকে লাঞ্চ বা ডিনার না খাইয়ে ছাড়েনি রানা। মুগ্ধ হয়ে গেছে আমেরিকান যুবক বাঙালি একদল যুবক-যুবতীর নিঃস্বার্থ আন্তরিক আচরণ দেখে। ওরা একদম আপন করে নিয়েছিল কনলনকে।

সেসব অতীতের কথা, বর্তমানে পাহাড়ি এলাকার উপর দিয়ে তীর গতিতে ছুটে চলেছে ইয়াক-১৪১। রানা মনের চোখে দেখল ডেভিড কনলনকে— পেণ্টাগনের আগারথাউণ্ড ঘরে কমপিউটারের সামনে বসে আছে যুবক, পরনে মুক্স টি-শার্ট, জিন্স, পায়ে নাইকি,

নাকে চশমা, একের পর এক চিবিয়ে চলেছে চিউইং গাম। যেন গ্রাজুয়েট কলেজের কল্ল-কাহিনির হ্যারি পটার। কিন্তু এই হ্যারি পটার যে-কোনও কোড ক্র্যাক করার ব্যাপারে সত্যিকারের জিনিয়াস।

‘আসলে কী ধরনের সাহায্য চাই, রানা?’ জানতে চাইল কনলন।

‘তিনটে বিষয়ে জানতে চাই, কনলন,’ বলল রানা।

‘বলে ফেলুন।’

‘প্রথম কথা: খুঁজে বের করতে হবে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অভ দ্য কঙ্গোর মাউন্ট স্ট্যানলি পাহাড়ে ঠিক কোথায় আছে তিশা করিম। নির্দিষ্ট জিপিএস লোকেশন দরকার।’

‘যিগু, বলেন কী! ওটা তো অপারেশনাল ইনফর্মেশন। জানতে চাওয়ার ক্লয়ারেন্স নেই আমার। ওই তথ্য খুঁজতে গেলে আমাকে গ্রেফতারও করতে পারে।’

‘ক্লয়ারেন্স জোগাড় করো,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। ‘সেজন্য যা করবার করো। আমাকে যে মিশনে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল, সেখান থেকে পালাতে হয়েছে। খুন হয়ে গেছে ছয়জন তরতাজা মেরিন সৈনিক। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আমেরিকান সামরিকবাহিনীর কেউ। ফাঁদে ফেলা হয়েছিল, একদল বাউন্টি হান্টারের হাতে তুলে দিয়েছিল আমাদেরকে। প্রায় কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না, কনলন।’

‘ঠিক আছে, আমি দেখছি। আর অন্য দুটি বিষয় কী?’

একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র কমান্ডার এবেলহার্ডের কাছ থেকে পাওয়া মানুষের নামের লিস্ট বের করল রানা। ‘এই লিস্টের নাম অনুযায়ী তাদের বর্তমান অবস্থান জানতে চাই।’

বাউন্টি লিস্টের নামগুলো একে একে জানাল রানা।

‘এদের মাঝে অনেক মিল। ক্যারিয়ার হিস্ট্রি, স্লাইপিং স্কিল,

চুলের রং... যা পাও জানাও। ভাল হয় প্রতিটি ডেটাবেসে ক্রস-চেক করলে।’

‘ঠিক আছে। ...বেশ, আর তিন নম্বর গুরুত্বপূর্ণ কাজ?’

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা, ভাবছে। ‘তৃতীয় কাজ: খুঁজে বের করো সাইবেরিয়ার পাবলো-৯ রাশান বেস। জানা দরকার কেন ওখানে অ্যাম্বুশ করা হলো আমাদেরকে। কে করাল কাজটা।’

অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার ভিতর ব্রেক কষে পিছলে থেমে গেল তিশা করিমের আট চাকার এলএসভি। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গাড়ির পিছনের দুই কবাট, লাফিয়ে নামল ছয়জন সৈনিক, হাতে উদ্যত অস্ত্র।

এলএসভি থেকে নেমে পড়ল নিশাত ও তিশা, ওদের পরনে কাদাটে রঙের ফ্যাটিং, একই রঙের হেলমেট ও বডি আর্মার। হাতে এমপি-৭ এবং পিস্তল আকৃতির ক্রসবো।

গুহার এ অংশ চওড়া, ছাত অনেক উঁচু। দেয়ালগুলো কংক্রিট দিয়ে তৈরি। মেঝের বুক চিরে দূর আঁধারে হারিয়ে গেছে ট্রেনের লাইন। ওদিকের সুড়ঙ্গ বেশ খাড়াভাবে নীচে নেমে গেছে। এ ধরনের সুড়ঙ্গকে বলা হয় ড্রিফট, এ পথেই নামতে হয় খনির ভিতর।

‘রক বার্ড, আমি নিশাত,’ থ্রোট মাইকে বলল মহিলা ক্যাপ্টেন। ‘আমরা ভেতরে ঢুকে পড়েছি। ...আপনারা কোথায়?’

এক ভারতীয় কণ্ঠ বলল, ‘রক বার্ড বলছি, ক্যাপ্টেন নিশাত। ভগবান, এখানে নরক নেমেছে! আমরা আছি খনির পুর্বের কিনারায়! ড্রিফট থেকে দুই শ’ ফুট নীচে! দুই শাফটের সামনে বাস্কার করে অপেক্ষা করছে ওরা, আর...’

সিগনাল হারিয়ে গেল।

‘রক বার্ড? রক বার্ড?’ তিশার দিকে চাইল নিশাত।

আস্তু করে মাথা দোলাল তিশা ।

পাশে দাঁড়ানো দু' সৈনিককে বলল, 'আফজাল, কৃষ্ণ, ওপরে গিয়ে আরপিজির ফক্সহোলগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা নিন। ইন্টারনাল টানেল থাকার কথা। শেয়ালগুলোকে শেষ করার পর খনিতে নামতে পারব আমরা।'

'জী, লেফটেন্যান্ট,' রওনা হয়ে গেল বাংলাদেশ ও নেপালের দুই সৈনিক।

'অন্যরা আমাদের সঙ্গে চলো,' নির্দেশ দিল নিশাত।

মাউন্ট স্ট্যানলি পর্বতমালার উপর দিয়ে ছুটছে রানার অ্যাটাক ফাইটার জেট বিমান। চিত্তিত হয়ে উঠেছে রানা, যা ফিউয়েল আছে তাতে বড়জোর দশ মিনিট চলবে ইয়াক-১৪১, আরপরও আকাশে রয়ে গেলে বিধ্বস্ত হবে।

এমন সময় আবারও জেগে উঠল রেডিয়ো।

কেভিন কনলন।

'শুনছেন, রানা? দু'চারটে তথ্য পেলাম। তিশা করিমের খোঁজ পাওয়া গেছে। তার ইউনিট আছে কর্নেল ক্লিণ্ট ওয়াই. উডের অধীনে।' ধীরে ধীরে বলে গেল সে জিপিএস কোঅর্ডিনেটস্।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। টাইপ করে ট্রিপ কমপিউটারে তুলে নিয়েছে কো-অর্ডিনেটস্।

এবার বলল কনলন, 'আপনার ওই লিস্টের ব্যাপারে। কয়েকটা তথ্য পেয়েছি। পনেরোজনের সাতজনের নাম সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি ন্যাটোর পারসোনেল ডেটাবেসে। স্কট এম. ক্যাপলান, জে ওয়েলন, চার্লস আর. কোসলোস্কি, স্টিফেন আর. এডওয়ার্ডস, রবিন এন. কার্লটন, জন আর. রেইসার্ট আর আপনি। ন্যাটোর নয় সালের ডিসেম্বরের "জয়েন্ট সার্ভিস এমএনআরআর স্টাডি"তে আছেন আপনারা। ব্রিটিশদের সঙ্গে

আমেরিকানদের কোনও জয়েন্ট মেডিকেল স্টাডি মনে হচ্ছে। আপনি ওদের মাঝখানে কোথা থেকে কীভাবে কাবাবের হাড়ি হলেন, বুঝলাম না।’

‘কোথায় করা ওই পরীক্ষা?’ জানতে চাওয়ার পর মনে পড়ল রানার। নুমার তরফ থেকে ববি মুরল্যাও আর ওকে পাঠানো হয় টেস্ট-এ। বিসিআই অনুমতি দেয়ায় গিয়েছিল রানা।

তথ্য দিল কনলন: ‘ইউএসএএমআরএমসি। আর্মি মেডিকেল রিসার্চ অ্যাণ্ড মেটেরিয়াল কমাণ্ড।’

‘ওটার বিষয়ে আরও তথ্য জোগাড় করা যায়?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘আর কী জানলে?’

‘আজ ভোরে কাজাখস্তানের আকাশে অচেনা এক এয়ারক্রাফট থেকে ট্রান্সমিশন ধরেছে আমাদের ইশেলন স্পাই স্যাটালাইট। আপনার ওই লিস্টের কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পড়ে শোনাচ্ছি: “বেস, আমি হেণ্ড্রিক। কঙ্গোতে ধরা পড়েছে জেনারেল রেমণ্ড কে. গ্র্যাঞ্জার। এখন কঙ্গোর মাউন্ট স্ট্যানলির খনির দিকে চলেছি। লিস্টের বেশ কয়েকজনকে পেয়ে যাব ওখানে। একই জায়গায় চারজন, ভাবা যায়? স্কট এম. ক্যাপলান, এরিখ টি. সৌলে, চার্লস আর. কোসলোস্কি আর আলাল হোসেন। তা ছাড়া, ওখানে পেতে পারি মাসুদ রানার বান্ধবীকে।” ’

গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

বলে চলেছে কনলন: ‘একটা নোটিফিকেশন দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ওই লোকের কথা বলবার ভঙ্গি ব্রিটিশদের মত। আর ওই কণ্ঠের মালিক আসলে...’ থেমে গেল সে।

‘বলো?’ তাড়া দিল রানা।

আবারও পড়ছে কনলন: ‘ওই কণ্ঠ চেনা গেছে, ওটা ডেভিড এন. হেণ্ড্রিকের। ব্রিটিশ ওই এসএএস-এর প্রাক্তন কর্নেলের

কলসাইন ছিল “দ্য ডেভিল”।’ চুপ হয়ে গেল কনলন। কয়েক মুহূর্ত পর শুরু করল আবার, ‘দু’হাজার দশ সালের দিকে সে ছিল বিশাল লোক, কিন্তু তারপর কোর্ট মার্শাল হয়। তার খাতির ছিল এসএসএস-এর প্রধানের সঙ্গে। বাজে এক লোক। নাম ছিল জুলিয়াস বি. গুগারসন।’

‘হ্যাঁ, জুলিয়াস বি. গুগারসনকে চিনতাম,’ বলল রানা।

‘ডেভিড এন. হেব্রিকের দশবছরের জেল হয়, কিন্তু হোয়াইটমুর প্রিয়নে নেয়ার সময় পালিয়ে যায়। খুন করে ফেলে যায় দশজন প্রহরীকে। সে এখন আছে ফিল্যান্স বাউন্টি হাণ্টিং অর্গানাইজেশন কন্টিনেন্টাল সোলজার-এর সঙ্গে। ইউনিট ৬৬, বা সিএস-৬৬-এর প্রধান। কাজ করছে পর্তুগালে। ...রানা, আপনি আমাকে এ কী নরকে ঠেলছেন?’ শুকনো হাসল কনলন। ‘তাই বলে অবশ্য ভয় পাচ্ছি না।’ চুপ হয়ে গেল সে।

‘বুঝতে পারছি খুবই সতর্ক থাকতে হবে, নইলে আমার গর্দান নেবে এরা,’ চট করে একবার খবিরকে দেখল রানা।

‘আর আপনার বলা সেই পাবলো-৯,’ বলল কনলন, ‘ওটার ব্যাপারে শুধু জানতে পেরেছি: উনিশ শ’ সাতানব্বুই সালের মে মাসে ওই ফ্যাসিলিটি বিক্রি করে দেয়া হয় এক আমেরিকান কোম্পানি, স্করপিয়ন শিপিং কোম্পানির কাছে। ওই কোম্পানির যে শিপিং বিজনেস আছে, শুধু তাই নয়, তাদের অয়েল ইন্টারেস্টও আছে। সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে দশ হাজার হেক্টর জমি কিনে এক্সপ্লোরেশন করার সময় তাদের ভাগে পড়ে পাবলো-৯।’

এক মুহূর্ত ভাবল রানা, তারপর বলল, ‘আর কিছু?’

‘না, আর কিছু না।’

‘তোমাদের আইএসএসএস-এর কাছ থেকে কিছু তথ্য পেলে ভাল হতো,’ বলল রানা।

‘কী বিষয়ে জানতে চান?’

‘বৈজ্ঞানিক কুয়াশা সম্পর্কে। জানা জরুরি ওদের মূল্যায়ন
কেমন। ওদের সঙ্গে তার টঙ্কর লেগেছিল কেন।’

‘আমি খোঁজ নেব,’ কথা দিল তরুণ অ্যানালিস্ট।

‘অনেক ধন্যবাদ, কেভিন,’ বলল রানা। ‘নতুন কিছু পেলে
জানিয়ে দিয়ো।’

‘নিশ্চয়ই, ঠিক আছে।’

রেডিয়ো থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে আফটারবার্নার চালু
করল রানা।

সাত মিনিট পর মৌমাছির মত ভাসতে ভাসতে মাটির দিকে
নামতে লাগল ইয়াক-১৪১। বিমানের নীচে ছিটকে উঠছে বিপুল
ধুলো। একটু দূরেই আমেরিকান সব ভেহিকেল ও কমাণ্ড তাঁবু।

নয়

কালো ফাইটার সামরিক শিবিরের মাঝে নেমে আসতেই চারপাশ
থেকে ওটাকে ঘিরে ফেলেছে সৈনিকরা। আনঅথোরাইযড রাশান
বিমান দেখে ভয়ঙ্কর চেহারা করেছে মেরিনরা, হাতে উদ্যত অস্ত্র।
কিন্তু ক্যানোপি খুলে রানা ও খবির নামতেই ওদেরকে চিনে
ফেলল মেরিন অফিসার মেজর জন কালাহান। সৈনিকদের মাঝে
দিয়ে এগিয়ে এল সে, চোখে বিস্ময়। মেরিন বাহিনীতে অত্যন্ত
সম্মানিত লোক মাসুদ রানা, তার কারণে এ বাহিনীকে অন্য চোখে
দেখতে শুরু করেছে আমেরিকার অন্যসব বাহিনী।

হাত বাড়িয়ে রানার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল সে। ‘আপনি হঠাৎ কোথা থেকে?’ জানতে চাইল।

‘পরে বলব,’ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল রানা। ‘আগে আমাদেরকে নিয়ে চলুন কর্নেল উডের কাছে।’

আস্তু করে মাথা দোলল মেজর কালাহান। একদল মেরিন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে রানা ও খবিরকে এস্কাউট করল অফিসার।

পাহাড়ের ছোট এক টিলার নীচে কমাণ্ড তাঁবু। খনির মুখ থেকে তিন হাজার গজ দূরে। ধুলোভরা ঝোপঝাড় ও গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ওদিক থেকে ফিরছে দুটো রণযান।

কর্নেল উড দাঁড়িয়ে আছে ম্যাপ টেবিলের সামনে, গলা ফাটিয়ে ফেলছে রেডিয়োতে।

আসবার সময় মেজর কালাহান জানিয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় মেজাজ অত্যন্ত খাটো কর্নেলের, কাজেই সে নিজে তাঁবুর ভিতর ঢুকতে চায় না।

সামান্যতম ইতস্তত না করেই কর্নেলের গুহায় ঢুকে পড়ল রানা ও খবির।

চৌচিই চলেছে লোকটা: ‘আরে, বললেই হলো? কীভাবে কী করবে আমি শিখিয়ে দেব? অত বুঝি না, ওদিকের রেডিয়ো সিগনাল চালু করো! দরকার হলে খনির ভেতর অ্যাণ্টেনার কেবল নেবে! বোমারু বিমান আসার আগেই ওদেরকে সরে আসতে বলতে হবে!’

লোকটা সামান্য থামতেই বলল রানা, ‘কর্নেল উড, আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি, কিন্তু আসতে হলো জরুরি কাজে। ...আমি মেজর মাসুদ রানা, ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা আর লেফটেন্যান্ট তিশা করিমকে দরকার আমার। ওরা...’

টেবিলের সামনে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল। ‘কী? কোন্ চুতিয়া তুমি, শালা!’

‘নামটা মাসুদ রানা,’ আবারও বলল রানা, শান্ত রাখছে মেজাজ। ‘জানি ওই খনির ভেতর ওয়ারলর্ডের বাহিনী আছে, কিন্তু আরও খারাপ কেউ থাকতে পারে। তারা বাউন্টি হান্টা...’

‘মেজর, তুমি এমওএবি বোমা নিয়ে সি-১৩০ হারকিউলিস বোমারু বিমানের পাইলট না হয়ে থাকলে, আমি তোমার কথা শুনতে চাই না। বাইরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকো...’

‘আরে! ওটা কী?’ বাইরে চেষ্টা করে উঠেছে কে যেন।

তাঁর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল কর্নেল। একই সময়ে রানা ও খবিরও। কিছুক্ষণের জন্য ওরা দেখল বিশাল এক রাশান ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার বুলতে শুরু করেছে খনি-মুখের সামনে। নেমে পড়ল ওটা ধুলো উড়িয়ে।

কপ্টার থেকে লাফিয়ে নামল মুখোশ পরা কমপক্ষে বিশজন লোক। ছুটে চুকে পড়ল খনির ভিতর।

লোকগুলো গুহায় হারিয়ে যেতেই আবারও আকাশে উঠল রাশান কপ্টার, কামান দাগতে শুরু করেছে কিলাই বাবাম্বার স্লাইপারদের উপর। একমিনিট পেরুনের আগেই কপ্টার নিয়ে সম্ভ্রষ্ট মনে পাহাড়ের উত্তরদিকে রওনা হয়ে গেল পাইলট, দেখতে না দেখতে হারিয়ে গেল চূড়াগুলো টপকে।

‘এটা কী হলো?’ পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে কর্নেল।

‘এমআই-১৭,’ জানাল স্পটার, ‘গায়ে রাশান ইনসিগনিয়া! স্যর, ওরা যারা নামল, সবাই স্পেৎন্যায ইউনিটের লোক!’

‘শালার চুতিয়া দেশ, পুরো চুতিয়া...’ বিড়বিড় করল কর্নেল। ঘুরে চাইল। ‘ঠিক আছে, এককথায় বলো কী চাও, মেজর।’

কিন্তু আশপাশে নেই মাসুদ রানা বা হোসেন আরাফাত খবির।

ভুরু কুঁচকে গেল উডের। তখনই দেখল চাকা পিছলে সামনে বাড়ছে একটু দূরের এক লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল। ভিতরে কেলে

ব্যাটা মাসুদ রানা আর তার ঝোপের মত মোটা ভুরুওয়ালা চ্যালা!
খনির সামনের নো-ম্যান'স-ল্যাণ্ড লক্ষ্য করে ছুটছে রণযান।
পিছনে একগাদা ধুলো।

খনির উপরের পাহাড় থেকে শুরু হয়েছে গুলি। খটাখট
লাগছে চাকাগুলোর আশপাশে।

লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল ডুন বাগির মত, উইণ্ডস্ক্রিন রা আর্মার
নেই। কিন্তু ড্রাইভার ও প্যাসেঞ্জারের জন্য খাঁচা তৈরি করেছে
একরাশ রোল বার। এ হালকা রণযান তুলতে পারে তুমুল গতি,
একদিক থেকে আরেকদিকে সরে অবিশ্বাস্য দ্রুত।

এলএসভি নিয়ে খনির কাছে বৃত্তাকারে ঘুরছে রানা, তৈরি
করছে বিপুল ধুলো, লুকিয়ে পড়ছে ওই মেঘেরই ভিতর। এখন
আর আশপাশে আসছে না স্নাইপারদের গুলি।

একটু পর খনি মুখের দিকে গাড়ির নাক তাক করল রানা।

আবারও পশলা পশলা বুলেট আসতে লাগল।

তখনই হঠাৎ করেই খনি-মুখের উপরের পাহাড়ে কয়েকটা
বিস্ফোরণ হলো। ছয়জন স্নাইপারের আস্তানা উড়ে গেল আকাশে।
ঝরঝর করে নীচে পড়ছে ধুলো, মাটি ও পাথর।

থেমে গেছে গুলি।

খনির ভিতর থেকে হামলা করেছে কেউ, শেষ করে দিয়েছে
স্নাইপারদের ঘাঁটি।

মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরল রানা, সাঁৎ করে
দুকে পড়ল খনি-সুড়ঙ্গের ভিতর।

সমতল থেকে ছয় শ' ফুট নীচে পাথুরে সুড়ঙ্গ ধরে হেঁটে চলেছে
তিশা করিম। ঘুটঘুটে আঁধারে বাতি বলতে হেলমেট ও এমপি-৭-
এর ফ্ল্যাশলাইট।

তিশার সঙ্গে মাত্র তিনজন সৈনিক।

একটু পর পর মিথেনোমিটার দেখছে তিশা। ওই যন্ত্র মাপছে পরিবেশের মিথেনের মাত্রা।

আপাতত দেখিয়ে চলেছে: ৫.৮১%।

তার মানে, পরিস্থিতি ভাল নয়।

ওরা এখনও রয়ে গেছে খনির বাইরের দিকের অংশে।

এদিকটা যেন জটিল গোলকধাঁধা।

চৌকো, নিচু সব সুড়ঙ্গ। রেলগাড়ির সুড়ঙ্গের মত আকৃতির, সবই ডানদিকে বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে দূরে। কিছু গেছে গাঢ় আঁধারে, অন্যগুলো হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে কানাগলির মত।

চারপাশ ধূসর রঙের।

পাথুরে দেয়াল, নিচু ছাত, এমন কী ওই ছাত ধরে রাখা কটকট আওয়াজ তোলা পিলার-বিমও ধূসর।

চারপাশের সবকিছুতে ভুতুড়ে ধূসর ছাইয়ের মত পাউডার।

ওই পাউডার থেকে রক্ষা নেই কিছুর। লাইমস্টোনের গুঁড়ো, এ দিয়ে দেয়ালগুলোর অত্যন্ত দাহ্য কয়লার গুঁড়োর তেষ্ঠা মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফলে তৈরি হয়েছে আরও বেশি বিপজ্জনক আগুনের ফাঁদ।

খাড়া ড্রিফট টানেল শেষে এক নেপালি কমাণ্ডার দেখা পেল তিশা। রেডিয়ো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাকে পাঠানো হয়েছিল বার্তাবাহক হিসাবে।

‘এখান থেকে বামে কনভেয়ার বেল্ট,’ জানাল সে। ‘ওখান থেকে বেল্ট গেছে শত্রুদের ব্যারিকেডে। বেল্ট থেকে সরবেন না, সরলে হারিয়ে যাবেন।’

নেপালি কমাণ্ডার কথা অনুযায়ী ছুটতে শুরু করেছে তিশার দল। আরও দু’শ’ মিটার যাওয়ার পর বাঁক নিল পাথুরে টানেল। ওখানে দেখা গেল ভাসমান কনভেয়ার বেল্ট।

মিথেনোমিটার দেখিয়ে চলেছে:

* ৫.৭২%...

৫.৬৩%...

খনির এত গভীরে কমতে শুরু করেছে মিথেনের মাত্রা।

ভাল, ভাবল তিশা।

তখনই চারপাশ দেখে ফিরল নিশাত সুলতানা। তিশার পাশে ছুটবার ফাঁকে বলল, 'বুঝলে, তিশা, রানা আর তুমি এবার বিয়েটা করে ফেললে...'

'আপা, থাক্ না এসব,' আপত্তির সুরে বলল তিশা।
খোলামেলা আলোচনা ভাল লাগছে না তার।

এই মিশন শেষে রানার সঙ্গে ওর যাওয়ার কথা ইতালি। বিখ্যাত 'অ্যারোস্টাডিয়া ইতালি' এয়ার শো হবে মিলানে। হৈ-চৈ পড়ে গেছে, নাসার রকেট বিমান এক্স-১৬এস ওখানে প্রথমবারের মত দেখানো হবে। ওটা আজ পর্যন্ত মানবসৃষ্ট সবচেয়ে দ্রুতগামী বিমান। এয়ার ফিল্ড থেকে সামান্য দূরে চমৎকার এক ভিলা ভাড়া নিয়েছে রানা, জানিয়ে দিয়েছে নিশাত আর খবিরকে, ওদেরকেও যেতে হবে ওর সঙ্গে। আর ধরে নিয়েছে নিশাত, এবার হয়তো সত্যি সত্যি ভালবাসার মেয়েটিকে বিয়ে করবে মাসুদ রানা।

'রানা কিন্তু তোমাকে সত্যি...'

নিশাতকে থামিয়ে দিল তিশা, 'ও তো কিছু বলেনি, আপা।'

'ক'দিন আগে বলছিল, তিশা যদি ফিরিয়ে দেয়... আমি বললাম...' থেমে গেল নিশাত।

ওরা পৌছে গেছে বাঁকে। ওদিক থেকে আসছে গুলির আওয়াজ।

আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে ওরা। থেমে গেছে আলাপ।

ওদিকে উঁকি দিল ওরা।

দূরে দেখা গেল আঁধারে হেলমেটের ফ্ল্যাশলাইটের বাতি। ছায়ার মত ছোট্টাছুটি করছে মিত্রপক্ষের কয়েকজন। ব্যারেল ও

বাক্সের মত পুরনো মাইনিং ইকুইপমেন্টের তৈরি এক ব্যারিকেডের
আড়াল নিয়েছে তারা।

ওই ব্যারিকেডের ওদিকে গুরুত্বপূর্ণ এয়ার ভেন্ট।

বন্ধ, চৌকো, নিচু ছাতের সুড়ঙ্গের এই দুনিয়া যেন চেপে
বসতে চাইছে বুকের উপর। সামনে ফাঁকা জায়গা দেখে স্বস্তির
ভাব এল ওদের মনে।

ওদিকটা কমপক্ষে সাততলা।

জ্বলজ্বল করছে ফসফরাস ফ্লোর, যেন কোনও পাতাল
ক্যাথেড্রাল।

ছাত ফুঁড়ে সোজা উঠেছে দশ মিটার চওড়া দুই এয়ার ভেন্ট।
আর তার নীচে তুমুলভাবে লড়াই চলছে দুই দল যোদ্ধার।

কিলাই বাবাম্বার যোদ্ধারা পুরোপুরি প্রস্তুত।

প্রকাণ্ড গুহায় নিজেদের শক্তপোক্ত ব্যারিকেড তৈরি করেছে
তারা। মিত্রবাহিনীর ব্যারিকেড অনেক নাজুক।

বাবাম্বার লোক ব্যবহার করেছে বড় সব মাইনিং ইকুইপমেন্ট।
তার ভিতর রয়েছে পরিত্যক্ত সব ভেহিকেলের হেমিস্ফেরিকাল
ড্রিল, ফ্রন্ট-এণ্ড লোডার, কয়লাভরা টিপ-ট্রে ও পুরনো সাদা
হামভির মত ট্রাক। শেষেরগুলো ড্রিফটরানার।

মিত্র ব্যারিকেডের পিছনে পৌঁছে গেল নিশাত, তিশা এবং
ওদের সৈনিকরা।

গুহার আরেকদিকে শত্রুদল। সংখ্যায় কমপক্ষে এক শ' জন।
পরনে কাদাটে সাদা শার্ট ও ছেঁড়া প্যান্ট। কয়লার গুঁড়োর কারণে
ভূতের মত লাগল লোকগুলোকে।

নানান অস্ত্র তাদের হাতে।

একে-৪৭, এম-১৬এস এবং আরপিজি।

পাতাল-গুহায় পাহাড়ের উপর থেকে তাজা বাতাস আসছে,
ফলে নিশ্চিন্তে গুলি ছুঁড়ছে।

তিশা এবং নিশাত আলাদা হয়ে গেল ।
ব্যারিকেডের দু'পাশে অবস্থান নিয়েছে ।
মিত্রবাহিনীর সৈনিকদের সংখ্যা বড়জোর বিশ ।
বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও মালোয়েশিয়ার যোদ্ধা ।
এদের নেতা ভারতীয় মেজর জয়ন্ত মিত্র খেয়াল করেছে
নিশাত ও তিশার দল পৌঁছে গেছে ।

‘একে বলে রক্তাক্ত দুঃস্বপ্ন!’ গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে
বলল সে । ‘কোনওভাবেই সরবে না এরা! আর একটু পর পর...
হায় রাম! ওই যে আসছে আরেকটা! অ্যাই, গুলি করে ফেলে
দাও!’

চট করে মিত্র ব্যারিকেডের উপর দিয়ে ওদিকে চাইল তিশা ।
সামনের ব্যারিকেডের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এক
কিশোর বয়সী আফ্রিকান ছেলে, এখনও গোঁফ জন্মায়নি তার ।
ছিটকে এল মোটরসাইকেলে চেপে, বামহাতে একে-৪৭ অ্যাসল্ট
রাইফেল ।

‘বাবা কিলাই বাবাম্মা!’ চিৎকার ছাড়ছে, সেসঙ্গে গুলিবর্ষণ ।
তিশার মনে হলো, কিশোর সৈনিকদের ড্রাগে অভ্যস্ত করে
তুলেছে ওয়ারলর্ড । নইলে এভাবে আত্মহত্যা করত না কেউ ।
ছেলেটার বুকে ব্যাণ্ডেজের মত চার খণ্ড সিঁটা ।
তাকে গেঁথে ফেলল উপমহাদেশীয় তিন সৈনিক । থেমে গেল
তাদের অটোমেটিক রাইফেল ।

ছুটন্ত মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে গেল আত্মঘাতী কিশোর ।
মেঝেতে পড়তেই ভেসে উঠল একরাশ ধুলো, আর তখনই
বিস্ফোরিত হলো দেহটা ।

এক সেকেণ্ড আগে সে ছিল, পরের সেকেণ্ডে উধাও ।
তিশার দিকে চাইল মেজর জয়ন্ত মিত্র । ‘এরা পুরো উন্মাদ!
একটু পর পর একজন একজন করে আসছে মরতে! তবে বড়

কথা, আমাদের ব্যারিকেডের কাছে আসার আগেই শেষ করতে পারছি! বোধহয় পিছনে সাপ্লাই গুহা! জেনারেটর, গ্যাসোলিনের অভাব নেই, সঙ্গে প্রচুর খাবার, পানি আর অ্যামিউনিশন! মনে করি না আগামী এক বছরে ওরা নড়বে ওখান থেকে!’

‘আমরা যদি এদেরকে ঘুরে পিছনে যাই?’ বলল তিশা, ডানদিকে একসারি সুড়ঙ্গের দিকে ইশারা করল।

‘না, ওদিকে বুবি-ট্র্যাপ! ট্রিপ ওয়ায়ার! ল্যাণ্ড মাইন! ওদিকে পাঠিয়ে শেষ করেছি আমার দুইজন ট্রেইণ্ড সৈনিক! লড়াইয়ের জন্যে বেশ ক’দিন ধরে অপেক্ষা করছে এরা! মুখোমুখি লড়াই ছাড়া উপায় নেই! আমার আরও লোক দরকার!’

তখনই দেখা গেল, পিছনের সুড়ঙ্গে অস্ত্রের ব্যারেলের ফ্ল্যাশলাইট।

ওদের অন্তত আরও বিশজন সৈনিক আসছে।

‘যাক, রিইনফোর্সমেন্ট,’ খুশি হয়ে বলল মেজর মিত্র।

রওনা হয়ে গেল সে।

ওদিকে চোখ রেখেছে তিশা, দেখল ওই দলের নেতার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল মেজর।

অবাক তো, ভাবল তিশা। কর্নেল উড বলেছিল পরের টিম আসবে কমপক্ষে বিশ মিনিট পর। তা হলে এরা এত দ্রুত পৌঁছায়...

তিশা দেখল, হাত নেড়ে ব্যারিকেড দেখাল মেজর মিত্র। পরিস্থিতি বোঝাতে শুরু করেছে। নতুন দলের দিকে পিঠ দিয়েছে সে। আর তখনই নতুন দলের নেতা ঝট করে কী যেন বের করল বেল্ট থেকে। জিনিসটা চালাল মেজর মিত্রের ঘাড়ের উপর।

প্রথমে বুঝল না তিশা, কী ঘটছে।

সামান্যতম নড়ল না মেজর জয়ন্ত মিত্র।

পরক্ষণে সবই বুঝল তিশা, হতবাক হয়ে গেল।

ছটকে একদিকে রওনা হয়েছে মেজরের মাথা। এক সেকেণ্ড
দাঁড়িয়ে থেকে ধড়াস্ করে মেঝেতে পড়ল বেচারার প্রাণহীন ধড়।

চমকে যাওয়ারও সময় পেল না তিশা, গর্জে উঠেছে নতুন
দলের সাবমেশিনগান।

গুলি শুরু করেছে পিছন থেকে।

বিদ্যুৎবেগে স্টিলের মিনি-স্কিপগুলোর ওপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল
তিশা। চারপাশে বিঁধছে বুলেট। এক সেকেণ্ড পর তিশার পাশে
ঝাঁপিয়ে নেমে এল নিশাত এবং ওর দলের অন্য দুই সৈনিক।

মিত্রপক্ষের অন্যান্য অফিসার ও সৈনিকের কপাল এত ভাল
নয়।

পিছন থেকে আসা বুলেটের ঝড় শেষ করে দিয়েছে সবাইকে
খোলা জায়গায়। অসংখ্য রক্তাক্ত গর্ত তৈরি হয়েছে তাদের দেহে।
থরথর করে কাঁপছে লাশগুলো গুলি খেয়ে।

‘আল্লা, এ কী!’ জং ধরা স্টিলের মিনি-স্কিপের দেয়াল ঘেঁষে
বসে পড়েছে তিশা।

ওরা আটকা পড়েছে দুই দলের মাঝে।

একদল সামনে।

একদল পিছনে।

ওদের অবস্থা স্যাণ্ডউইচের মত।

‘আমাদের বাঁচতে হবে,’ তিশার কানের কাছে বলল নিশাত।
‘এসো!’

‘কোথায়, আপা?’

‘এদিকে!’

লাফ দিয়ে উঠে নিশাতের পাশে ছুটল তিশা।

পিছনে আসছে দলের দুই সৈনিক।

মিনি-স্কিপের ওদিকে দুই ব্যারিকেডের মাঝের সুড়ঙ্গ ধরে
ছুটে গিয়ে বেড়ালের ক্ষিপ্ত গতি তুলল ওরা।

তিশা ও নিশাত যখন পাতাল-সুড়ঙ্গ ধরে ছুটছে, ওই একই সময়ে খনি-মুখে গুহার ভিতর ব্রেক কষে থামল রানা ও খবিরের লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল।

সামনের ড্রিফটের মেঝেতে রোলার কোস্টারের মত ট্র্যাক দেখল রানা। দূরে, বহু নীচে গেছে দুই সমান্তরাল লাইন। তখনই পাশের এক টানেল থেকে ছিটকে বেরোল দুই লোক।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা ও খবির, হাতে এমপি-৭ সাবমেশিনগান। একই কাজ করল লোকদুটো।

‘আফজাল না?’ জানতে চাইল রানা, কুঁচকে গেছে ভুরু। ‘আফজাল হোসেন?’

‘স্যর, আপনি?’ অস্ত্র নামিয়ে নিল ডানদিকের লোকটা। ‘আরেকটু হলে আপনাকে খুনই করে ফেলতাম, স্যর!’

এইমাত্র পাহাড়ের উপর কিলাই বাবাম্মার স্লাইপারদের শেষ করে ফিরেছে তারা।

আফজালের পাশের লোকটার নাম কৃষ্ণ গোপাল হাওলাদার।

‘লেফটেন্যান্ট তিশাকে খুঁজছি,’ বলল রানা। ‘সে কোথায়?’

‘নীচে, স্যর,’ বলল আফজাল।

তিরিশ সেকেন্ড পর লাইট স্ট্রাইক ভেহিকলে চেপে ঢালু ড্রিফট বেয়ে নীচে রওনা হয়ে গেল রানা, পাশে খবির। ভাগাভাগি করে রসেছে রিয়ার গানারের সিটে অন্য দুই সৈনিক।

দূরে গিয়ে পড়েছে এলএসভির হেডলাইট। তিরিশ ডিগ্রি ঢালু পথ, বুক চিরে রেলগাড়ির লাইন।

পথের শেষে পৌঁছে এলএসভির গিয়ার নিউট্রাল করল রানা, পরক্ষণে ব্যবহার করল ব্যাক গিয়ার। বনবন করে উল্টো ঘুরতে লাগল চাকাগুলো। নেমে যাওয়ার গতি কমছে।

রানার স্ট্যাটেজি কাজে এল, কয়েক সেকেন্ডে কমে গেল নীচে

যাওয়ার গতি । পরের দশ গজ যাওয়ার পর আবারও এলএসভির
ফাস্ট গিয়ার ফেলল রানা, গতি তুলল গাড়ির ।

ড্রিফট টানেলের শেষে গোলকধাঁধার মত জায়গা ।

পাশ কাটাল ওরা নেপালি কমাণ্ডার লাশ ।

পুরোপুরি খোলা জায়গায় নিশাত, তিশা এবং ওদের দুই সৈনিক ।

মাত্র তিরিশ গজ দূরে শত্রুদের ব্যারিকেড ।

ওখানে রয়েছে কমপক্ষে দুই শ' ড্রাগ অ্যাডিক্ট আফ্রিকান
সৈনিক ।

তিশাদের দলটাকে শেষ করে দেয়ার মস্ত সুযোগ তাদের ।

তিশা ধরেই নিয়েছে, এবার মরতে হবে ওদেরকে ।

কিন্তু মরতে হলো না ।

অবশ্য গুলির আওয়াজ পেল তিশা ।

ওই গুলি শুরু হয়েছে শত্রুদলের ব্যারিকেডের পিছনে ।

ভুরু কুঁচকে গেল তিশার । আগে কখনও এমন গোলাগুলির
আওয়াজ শোনেনি ।

গুলি চলছে বড় দ্রুত ।

অস্ত্রটা হতে পারে ছয় ব্যারেলের মিনি-গান ।

এরপর যা দেখল তিশা, অবাক না হয়ে পারল না ।

কিলাই বাবাম্বার ব্লকেড উড়ে যাচ্ছে গুলির ঝড়ে ।

ব্যবহার করা হচ্ছে কমপক্ষে এক লাখ হাইপারভেলোসিটি
বুলেট ।

হলুস্থূল পড়ে গেছে কিলাই বাবাম্বার বাহিনীর ভিতর ।
নিজেদের ব্যারিকেড টপকে পালাতে চাইছে সবাই । ছুটে আসছে
নো-ম্যান্স-ল্যাণ্ড লক্ষ্য করে । পিট্রি খাওয়া কুকুরের মত ভেগে
আসছে । একটু আগে একইভাবে তিশাদেরকে খতম করতে
চাইছিল তারা ।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝল তিশা।

ওদের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর একদল লোক ধাওয়া করেছে
ড্রাগ অ্যাডিক্ট টেরোরিস্টদেরকে।

নিজেদের ব্যারিকেড ফেলে পালাচ্ছে আফ্রিকানরা, কোমরে-
পিঠে-মাথায় বুলেট খেয়ে মরছে। নানাদিকে ছিটকে পড়ছে
লাশগুলোর কাঁচা মাংস ও রক্ত।

ব্যারিকেড পেরুব্বার সময় টুকরো টুকরো হয়ে গেল এক
আফ্রিকান টেরোরিস্ট। এক মুহূর্ত আগে সবুজ টার্গেটিং লেসার
স্থির হয়েছিল তার উপর।

সবুজ লেসার... ভাবল তিশা।

‘তিশা!’ পাশ থেকে চেষ্টাল নিশাত, ‘কী হচ্ছে বুঝতে পারছ?’

‘বোধহয়,’ পাল্টা জানাল তিশা। ‘আমরা এখানে দুই দল নই,
কমপক্ষে চারটা দল! আপা, আসুন! জলদি!’

‘কোথায় যাবে?’

‘একটা কাজ নিয়েই তো এসেছি। আসুন, সেটা শেষ করি!’

কুঁজো হয়ে নো-ম্যান্স-ল্যাণ্ড ধরে ছুটতে লাগল নিশাত ও
তিশা। ঢুকে পড়ল কনভেয়ার বেল্টের নীচে। ছুটছে বামদিকের
এয়ার ভেন্ট লক্ষ্য করে।

ভাসমান কনভেয়ার বেল্টের উত্তরাংশে পৌঁছে গেল, আর
তখনই ব্যারিকেডের ওদিক থেকে তাড়া খেয়ে এল মাঝবয়সী চার
টেরোরিস্ট।

তাদের তিনজন আছড়ে-পাছড়ে উঠল কয়েকটা বাস্তুর
উপর। ওগুলো রাখা ছিল সিঁড়ির ধাপের মত। উপরের বাস্ত্ব
থেকে লাফ দিয়ে কনভেয়ার বেল্টে নামল তারা। চতুর্থজন টিপে
দিল কসোলের পেটমোটা সবুজ বাটন।

সগর্জনে চালু হয়ে গেল কনভেয়ার বেল্ট।

পরের মুহূর্তে দেখা গেল, বেল্টের উপরে ওঠা তিন টেরোরিস্ট



রওনা হয়েছে তুমুল গতি তুলে ।

চলেছে মিত্র ব্যারিকেডের দিকে ।

চতুর্থজন লাফিয়ে উঠল বেণ্টে, সে-ও রওনা হলো দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে ।

‘বেণ্টের গতি দেখেছ!’ বলল নিশাত ।

‘আপা, চলুন!’ শত্রু ব্যারিকেডের দিকে ছুটছে তিশা ।

খোলা জায়গা পেরিয়ে পৌঁছে গেল ওরা মজবুত ব্যারিকেডের ওপাশে । জায়গাটা সাততলা ক্যাথেড্রালের মত ।

মৃদু ওয়াটের ইলেকট্রিক সাদা বাতি জ্বলছে, চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে ভুতুড়ে আলো ।

পরিস্কার ওরা বুঝল, কী কারণে ব্যারিকেড টপকে পালাতে চেয়েছে কিলাই বাবাম্বার সৈনিকরা ।

হাজির হয়েছে কালো পোশাক পরা পনেরোজন কমাণ্ডো ।
চোখে সবুজ রঙের নাইট-ভিশন গগলস ।

টেরোরিস্টদের পিছনে উত্তর-পূর্বের ছোট টানেল থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা ।

তাদের হাতের অস্ত্র দেখে চমকে গেছে তিশা-নিশাত ।

ওই জিনিসের ভয়েই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে টেরোরিস্টরা ।

এ দলের সৈনিকের হাতে মেটালস্টর্ম এম১০০ অ্যান্টি রাইফেল ।

রেল গান ।

মেটালস্টর্ম অস্ত্রে সাধারণ মুভিং পার্টস্ থাকে না । প্রতিটি বুলেটের জন্য ট্রিগার হিসাবে কাজ করে র‍্যাপিড-সিকোয়েন্স ইলেকট্রিক শক । ফলে মাত্র এক মিনিটে ফায়ার করা যায় দশ হাজার গুলি । ধাতুর ঝড় তৈরি করে, কাজেই নাম হয়েছে অস্ত্রের মেটালস্টর্ম ।

নতুন এই দলের লোকগুলোর চোখে ভুতুড়ে সবুজ লেসার-

সাইটিং ডিভাইস ।

আপাতত এদের পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত তিশা ঠিক করল,
এরা কৃষ্ণ-হরিৎ ফোর্স ।

এদের একটা বিষয় বড় অস্বাভাবিক ।

এরা পাত্তাই দিচ্ছে না ওদেরকে । তাড়া করছে পলায়নরত
টেরোরিস্টদের ।

চারপাশে হুলুস্থূল ।

এই সুযোগে বামের এয়ার ভেন্টের ধুলোময় মেঝেতে পৌঁছল
তিশা । ব্যস্ত হাতে বসাল মেঝেতে নাক উঁচু করা মর্টার লঞ্চার ।

একমিনিট পর গলা উঁচিয়ে বলল তিশা: ‘ক্লিয়ার!’

টিপে দিল ট্রিগার ।

জোরালো ‘হুম্প’ আওয়াজ তুলে আকাশে রওনা হলো মর্টার
রাউণ্ড । রকেটের মত উধাও হলো এয়ার ভেন্ট ধরে ।

পরক্ষণে পাহাড়ের উপর থেকে এল বিকট ‘বুম!’ আওয়াজ ।

ছয় শ’ ফুট উপরের পাহাড়ে আঘাত হেনেছে মর্টার শেল ।

হাজারো টুকরো হয়ে উড়ে গেল কিলাই বাবাম্মার দলের
বসানো ক্যামোফ্লেজ ঢাকনি ।

ঝরঝর করে নীচে পড়ল আবর্জনা ।

একই সময়ে গুহার ভিতর এল ধূসর প্রাকৃতিক আলো ।

আবর্জনার বৃষ্টি শেষে আবারও সামনে বাড়ল তিশা, ওকে
ঘিরে রেখেছে দলের অন্যরা । দেরি না করে শাফটের নীচে বসিয়ে
দিল তিশা আধুনিক কমপ্যাক্ট লেসার ডাইয়োড ।

টিপে দিল সুইচ ।

সঙ্গে সঙ্গে চিমনি থেকে বেরিয়ে আকাশ স্পর্শ করল
অত্যুজ্জ্বল রক্তিম লেসার বিম ।

‘অল ইউনিটস্, নিশাত সুলতানা বলছি,’ রেডিয়ো করল
নিশাত । ‘আপনারা মনোযোগ দিন! সেট করা হয়েছে লেসার! দশ

মিনিটের ভেতর হাজির হবে বোমারু বিমান! এবার ত্যাগ করুন
খনি এলাকা!’

ইউএন-এর সামরিক শিবিরে কসোলের সামনে পিঠ সোজা করে
বসল কমিউনিকেশন অফিসার। হড়বড় করে বলল, ‘কর্নেল! খনি
থেকে বেরুচ্ছে টার্গেটিং লেসার। আমাদের কাজ শেষ।’

এক পা সামনে বাড়ল কর্নেল উড।

‘সি-১৩০-এর সঙ্গে যোগাযোগ করো, জানিয়ে দাও ওরা
লেসার পাবে। এভ্যাকিউয়েশন ক্রুদের বলো খনির-মুখে অপেক্ষা
করতে। কেউ বেরোলে সরিয়ে নেবে। দশ মিনিট পর ইতিহাস
হবে ওই খনি। সবাইকে আশপাশ থেকে সরে যেতে বলো।’

একইসঙ্গে ঘুরে চাইল নিশাত, তিশা এবং ওদের দুই সৈনিক।

ওরা রয়ে গেছে কিলাই বাবাম্বার ব্যারিকেডের পিছনে।

এবার বেরিয়ে যেতে হবে খনি-মুখের ঢালু পথ ধরে।

মাত্র কয়েক গজ যেতেই থামতে হলো ওদেরকে।

কিলাই বাবাম্বার ব্যারিকেডের সামনে নো-ম্যান্স-ল্যাণ্ডে
দাঁড়িয়ে আছে চার টেরোরিস্ট। তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে কৃষ্ণ-
হরিৎ ফোর্স। মেটালস্টর্ম রাইফেলের বিম পড়ছে শত্রুদের মুখে।

ব্যারিকেডের পিছন থেকে উঁকি দিল তিশা।

কৃষ্ণ-হরিৎ দলের নেতা সামনে বাড়ল, খুলে ফেলল স্কি-
মাস্ক। নামকরা পুরুষ মডেলদের মত দৃঢ় চোয়াল, সত্যিকারের
হ্যাণ্ডসাম। দু’চোখ নীল। টেরোরিস্টদের একজনকে বলল, ‘তুমি
আলাল? ...আলাল হোসেন?’

থুতনি বাঁকা করে ঘাড় কাত করল আরব।

‘আমিই আলাল হোসেন,’ আড়ষ্ট স্বরে বলল, ‘তুমি চাইলেও
আমাকে খুন করতে পারবে না।’

কৃষ্ণ-হরিৎ দলের নেতা জানতে চাইল, ‘কেন পারব না?’

‘কারণ আমার রক্ষাকারী স্বয়ং আল্লা,’ বলল আলাল হোসেন।
‘তুমি জানো না? আমাকে পাঠানো হয়েছে মুসলিম জাহানকে উদ্ধার করতে!’ গলা চড়ে গেল তার, ‘রাশানদের জিজ্ঞেস করো! মুজাহিদিনদের শেষ করেছে, তাজিক জেলখানায় পাতাল-ঘরে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে— কিন্তু ঠিক ছিলাম আমি। জিজ্ঞেস করো আমেরিকানদের! আফ্রিকান এম্বেসির ওপর ড্রুজ মিসাইল হামলা হলেও আমি ছিলাম পুরো সুস্থ!’ গলা আরও চড়ছে তার, ‘জিজ্ঞেস করো মোসাদকে! ওরা জানে! তাদের বারোজন আততায়ী আমাকে খুন করতে চেয়ে খতম হয়ে গেছে নিজেরাই! দুনিয়ায় কোনও বাপের ব্যাটা নেই যে আমাকে খুন করতে পারে! আমাকে পাঠানো হয়েছে আল্লার তরফ থেকে! আমি আল্লার বার্তাবাহক! কেউ পারবে না আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে!’

‘তুমি ভুল ভাবছ,’ নরম স্বরে বলল কৃষ্ণ-হরিৎ দলের নেতা। পরক্ষণে এক হাতে আলালের চুলের ঝুঁটি চেপে ধরল সে। বলল, ‘দ্যাখো, পারে কি না!’

বলেই ডানহাতের ম্যাচেটি চালিয়ে ঘ্যাঁচ করে কেটে নিল কল্লাটা। লাশ মেঝে স্পর্শ করবার আগেই ঘুরে দাঁড়াল সে।

বিস্ফারিত হলো তিশার চোখ।

সামান্য হাঁ হয়ে গেছে নিশাত।

চেয়ে আছে তিশা ও নিশাত ।

অলসভঙ্গিতে আলাল হোসেনের কাটা মাথা সাদা মেডিকেল
বাক্সের ভিতর রাখল কৃষ্ণ-হরিৎ দলের নেতা ।

আস্তু করে শ্বাস ফেলল নিশাত । ‘এখানে হচ্ছে কী, তিশা?’

‘জানি না, আপা,’ বলল তিশা । ‘জানার সময়ও নেই, বেরিয়ে
যেতে হবে এখান থেকে ।’

পিছনে পায়ের ধূপ-ধাপ আওয়াজ পেয়ে ঘুরে চাইল ওরা ।

ওদের দিকেই আসছে একদল আফ্রিকান টেরোরিস্ট, লক্ষ্য
কনভেয়ার বেল্ট । বিকট শব্দে চিৎকার জুড়েছে, মাথার উপর তুলে
রেখেছে গুলিশূন্য একে-৪৭ ।

পিছন থেকে তেড়ে আসছে একদল কৃষ্ণ-হরিৎ কমাণ্ডো ।

তিশার গুলিতে ছিটকে পড়ল চার টেরোরিস্ট ।

একই কাজ করল নিশাত, গুলি করে ফেলে দিল তিন
আফ্রিকান সৈনিককে ।

দুই মহিলা অফিসারের দুই সৈনিক কোনও সুযোগ পেল না,
তার আগেই ধাক্কা খেয়ে পদ দলিত হলো । ওদের গায়ের উপর
দিয়ে ছুটে গেল লোকগুলো । শেষ ক’জন রাইফেলের কুঁদো
ব্যবহার করেছে তিশাদের সৈনিকদের মাথার উপর । চাপা পড়েছে
বেচারাদের মরণ আর্তনাদ ।

‘এরা অনেক!’ তিশা বলল নিশাতকে । বামদিকে ডাইভ দিল

নিজে, সরে গেল বাবাম্মার সৈনিকদের সামনে থেকে।

ওদিকে বাক্সগুলোর উপর উঠছে নিশাত, তারই ফাঁকে গুলি ছুঁড়ল শত্রু লক্ষ্য করে। অবশ্য তা ক'সেকেণ্ডের জন্য মাত্র, তারপর টেরোরিস্টদের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল চলন্ত কনভেয়ার বেল্টের উপর।

টেরোরিস্টদেরকে কনভেয়ার বেল্টে চেপে পালাতে দেখে অবাক হয়েছে কৃষ্ণ-হরিৎ দলের কমাণ্ডেরা।

তাদের একজন চলে গেল বেল্টের কন্ট্রোল কন্সলের সামনে, টিপে দিল বড়সড় হলদে বাটন।

গুহার ভিতর আরও বাড়ল যান্ত্রিক গর্জন।

ধুলোময় মেঝে থেকে ঘুরে চাইল তিশা।

মিত্রবাহিনীর ব্যারিকেডের ওদিকে কনভেয়ার বেল্টের শেষে চালু হয়ে গেছে পাথর-ভাঙা প্রকাণ্ড এক মেশিন।

জিনিসটা মস্ত দুটো রোলার, মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় ভেঙে পড়বে কনভেয়ার বেল্টে রাখা পাথর।

রোলারদুটোর গায়ে হাজার হাজার দাঁত।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল তিশা।

প্রাণ বাঁচাতে কনভেয়ার বেল্টে উঠেছে টেরোরিস্টরা, এবং এদের মাঝে আটকা পড়েছে নিশাত আপা।

এখন আর নামতে পারবে না।

সাঁই-সাঁই করে ছুটে চলেছে রক ক্রাশারের দিকে।

ঘুরন্ত পাথর-ভাঙা মেশিন ষাট গজ দূরে।

ওদিকে গুলি শুরু করল নিশাত।

কিন্তু তিশা দেখল, খপ করে নিশাতের দুই হাত ধরে ফেলেছে দুই টেরোরিস্ট। তিনজনই হুড়মুড় করে পড়ল বেল্টের উপর।

কনভেয়ার বেল্ট থেকে লাফিয়ে নামছে বাবাম্মার লোক। কিন্তু নিশাতকে আটকে রাখা দু'জন পুরো নেশাগ্রস্ত। জাপ্টে ধরেছে

ক্যাপ্টেনকে ।

দ্রুত চলছে কনভেয়ার বেল্ট, রক ক্রাশারের সামনে পৌঁছে আবারও ফিরছে তলা দিয়ে । বেল্টের গতি ঘণ্টায় কমপক্ষে তিরিশ কিলোমিটার— প্রতি সেকেন্ডে আশি মিটার ।

হাতাহাতি করতে গিয়ে অস্ত্র হারিয়ে বসেছে নিশাত, লড়বার ফাঁকে পরিষ্কার বাংলায় চিৎকার করল, ‘শুয়োরের বাচ্চারা!’ ছয় ফুটি শরীরে ষাঁড়ের শক্তি ওর, ঠেকিয়ে রেখেছে দুই শত্রুকে— কিন্তু বাগে আনতে পারছে না ।

‘তোরা ভেবেছিস মেরে ফেলবি, না?’ ডানদিকের লোকটার মুখে থুতু ফেলল নিশাত । ‘জীবনেও পারবি না!’

উঠে দাঁড়িয়েই বামপাশের জনের অণুকোষে কষে লাথি দিল ও । আত্ননাদ করে উঠল টেরোরিস্ট । খপ্প করে তার হাত ধরল নিশাত, টান দিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে ছিটকে ফেলল রক ক্রাশারের দিকে । পাথর-ভাঙা মেশিন মাত্র বিশ গজ দূরে ।

আড়াই সেকেন্ডে রক ক্রাশারে পৌঁছবে টেরোরিস্ট ।

অন্তর থেকে বুঝল নিশাত, এবার নেমে পড়তে হবে ।

কিন্তু দু’হাতে ওকে জাপ্টে ধরল দ্বিতীয় লোকটা, ফেলে দিল বেল্টের উপর ।

রক ক্রাশারের দিকে পিছন ফিরেছে টেরোরিস্ট ।

দ্রুত সামনে বাড়ছে বেল্ট ।

পেটে ভর করে শুয়ে আছে নিশাত । যদি ঢোকে রক ক্রাশারে, আগে ঢুকবে ওর মাথা ।

আবারও ওকে জড়িয়ে ধরল লোকটা, যেন ধর্ষণ করবে ।

‘ছাড়, শুয়োরের বাচ্চা!’ চেষ্টা করে উঠল নিশাত ।

কিলাই বাবাম্মার সৈনিক ঢুকছে রক ক্রাশারের ভিতর ।

মারা যাওয়ার সময় কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলল ইঁদুরের মত ।

চোখের সামনে রক্তের বিস্ফোরণ দেখল নিশাত । ভিজে গেল

গোটা মুখ । তখনই হঠাৎ বুঝল সব ।

ফুরিয়ে গেছে সময় ।

অনেক দেরি করে ফেলেছে ।

এবার মরবে ও !

ধীর হয়ে গেল সময় ।

এখনও নিশাতের হাত আঁকড়ে ধরে আছে টেরোরিস্ট, রক ক্রাশারের ভিতর ঢুকে গেছে দু'পা । তারপর কোমর এবং...

খুব কাছ থেকে দেখল নিশাত, খপাৎ করে লোকটাকে গিলে ফেলল মেশিন । এক সেকেণ্ডে উধাও হলো সাড়ে ছয় ফুটি দেহ ।
প্লাৎ শব্দে নানাদিকে ছিটকে গেল আঠালো রক্ত ।

দ্বিতীয়বার ভিজে গেল নিশাতের মুখ ।

কয়েক ইঞ্চি দূরে রোলারদুটো, দেখল নিশাত ।

চোখে পড়ল রক্তে ভেজা প্রতিটি এবড়োখেবড়ো দাঁত ।

নিশাতের হাতদুটো ঢুকছে মেশিনের ভিতর ।

আর তখনই কে যেন হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল ওকে শূন্যে ।

নীচে বনবন করে ঘুরছে রক ক্রাশার ।

কনভেয়ার বেল্টের মাত্র দু' ইঞ্চি উপরে টেনে তুলেছে
নিশাতকে, ফলে এখন আর সামনে বাড়ছে না ও ।

ভুরু কুঁচকে ফেলল নিশাত ।

ভঙ্গিটা এমন: জরুরি কাজে বাগড়া দেয়া কেন!

একহাতে উপরের স্টিল ওভারহেড বিম ধরে ঝুলছে কে যেন,
অন্য হাতে ধরেছে নিশাতের কলারের বডি আর্মার ।

‘আপা, একবার আমাকে বলেছিলেন: আমাদের ফেলে
কোথায় চলেছ,’ বলল মাসুদ রানা । ‘ওই কথা তো এখন আমিও
জানতে চাইতে পারি ।’

পাঁচ সেকেণ্ড পর শক্ত জমিতে নামল নিশাত । ঝুপ করে ওর
পাশে নামল রানা । ওদের কাভার দিল খবির, আফজাল ও কৃষ্ণ

গোপাল। একটু দূরে মিত্রবাহিনীর ব্যারিকেডের কাছে ওদের লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল।

‘তিশা কোথায়?’ হৈ-চৈয়ের ভিতর জানতে চাইল রানা।

‘ওদিকের ব্যারিকেডের কাছে,’ জানাল নিশাত।

ওদিকে চাইল রানা।

‘স্যর, কী হচ্ছে এখানে?’ জানতে চাইল নিশাত, ‘এরা কারা?’

‘এখনও জানি না এরা কারা, এবং কী হচ্ছে,’ বলল রানা।

‘শুধু জানি এরা বাউন্টি হান্টার। তাদের একদল খুঁজছে তিশাকে।’

খপ্প করে রানার কনুই ধরল নিশাত। ‘স্যর, খারাপ খবর! বোমারু বিমানের জন্যে টার্গেটিং লেসার বসিয়ে দিয়েছি আমরা! আমাদের হাতে...’ চট করে হাতঘড়ি দেখল ক্যাপ্টেন। ‘আর মাত্র আট মিনিট! এর পর উড়ে যাবে খনি একুশ হাজার পাউণ্ডের বোমার আঘাতে!’

‘তার আগেই তিশাকে খুঁজে বের করতে হবে,’ বলল রানা।

কিলাই বাবাম্বার লোকদের স্ট্যাম্পিড থামার পর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তিশা— আর তখনই দেখল কয়েকটা সবুজ লেসার বিম পড়ল ওর বুকের আর্মারের উপর।

মুখ তুলে চাইল তিশা।

ঘিরে ফেলা হয়েছে ওকে।

এরাও কালো-সবুজ ফোর্স।

দলে ছয়জন, তাক করেছে মেটালস্টর্ম রাইফেল।

এদের একজন এগিয়ে এল সামনে। হেলমেট খুলতেই দেখা গেল তার মুখ।

ওই মুখ জীবনে ভুলবে না তিশা।

কখনও না!

এ লোক যেন উঠে এসেছে হরর সিনেমা থেকে।

অতীতে ভয়ঙ্করভাবে পুড়ে গিয়েছিল মাথা। বিকটভাবে কুঁচকে গেছে কেরোটির চামড়া, সেখানে ফোষ্কার মত সব ফুসকুড়ি, একটা চুলও নেই। গলে চোয়ালে মিশে গেছে কানের লতির নীচের অংশ।

কিন্তু এখন খুশিতে চকচক করছে লোকটার চোখ।

‘তুমি লেফটেন্যান্ট তিশা করিম, তাই না?’ ভদ্র সুরে বলল।
তিশার হাত থেকে সরিয়ে নিল এমপি-৭।

‘জু-জী,’ বলল বিস্মিত তিশা।

প্রথম কৃষ্ণ-হরিৎ দলের নেতার মতই এ লোকের উচ্চারণ ব্রিটিশ। বয়স হবে চল্লিশ। অভিজ্ঞ। চতুর।

তিশার পিঠের খাপ থেকে ম্যাগন্থক সরিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

‘ওটা রাখতে দিতে পারি না, কী বলো, ডার্লিং, পারি?
...তিশা করিম, তোমার বয়স চব্বিশ। চতুর হরিণী বলা হয় তোমাকে। আর্মি ট্রেইনিং ক্লাসে প্রথম হয়েছিলে। বাংলাদেশ আর্মির সঙ্গে আছ। সাহায্য করেছে আমেরিকান মেরিন অভিযানে। তার চেয়েও বড় কথা: তোমাকে খুবই পছন্দ করে বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা।

‘আপাতত তুমি কাজ করছ কর্নেল ক্লিণ্ট ওয়াই. উডের সঙ্গে।
...আর এবার বলছি আমার নাম: আমি ডেভিড এন. হেব্রিক। কলসাইন: দ্য ডেভিল। এরা আমার লোক, আমরা কাজ করছি কন্টিনেন্টাল সোলজার নামের বাউন্টি হান্টারদের সংগঠনে। আমাদের ইউনিট নম্বর ৬৬। আশা করি তুমি রাগ করবে না, আপাতত কিছু দিনের জন্যে তোমাকে সরিয়ে নেব আমরা।’

ডেভিলের কথা শেষ হতেই পিছন থেকে একহাতে তিশাকে জড়িয়ে ধরল এক বাউন্টি হান্টার, অন্যহাতে ভেজা রুমাল। নাক-মুখে চেপে ধরল ট্রাইক্লোরোমিথেন (ক্লোরোফর্ম)। চোখের সামনে

লাল-নীল-সাদা নক্ষত্র দেখল তিশা, ঝটকা-ঝটকি করল পাঁচ সেকেণ্ড, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল।

ডেভিলের পাশে এসে থামল সুদর্শন সেই লোক। এ-ই কেটে নিয়েছে আলাল হোসেনের মাথা। এখন লোকটার হাতে তিনটে মাথা রাখা যাবে এমন এক মেডিকেল ট্রান্সপোর্ট কন্টেইনার।

‘স্যর,’ ডেভিলকে বলল, ‘এখন আমাদের হাতে আলাল, কোসলোস্কি আর ক্যাপলানের মাথা থাকার কথা। কিন্তু ক্যাপলানের মাথা আগেই উধাও। আমার ধারণা, তাকে শিকার করেছে কোবরা ইউনিটের লোক।’

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলল হেণ্ড্রিক। ‘হুম্, মেজর পেরোনভ আর ওর স্পেশন্যাস কোবরা ইউনিট। ...ডার্কহ্যাম, ভাল দেখিয়েছ তুমি। এই অভিযানে যথেষ্ট মাথা পেয়েছি আমরা।’ তিশার অচেতন দেহের দিকে চাইল। ‘আর এ মেয়ের কারণে হয়তো পাব আরেকটা পুরস্কার। সবাইকে জানিয়ে দাও, পিছন-দরজা দিয়ে বেরোব। দেরি না করে উঠতে হবে বিমানে। একটু পর বোমা পড়বে খনির ওপর। রওনা হয়েছে আমেরিকান বমার।’

বাঁক নিল রানার লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল, কড়া ব্রেক কষে থামল কিলাই বাবাম্বার ব্যারিকেডের কাছে। চারপাশে ছড়িয়ে গেল ধূসর ধুলো।

লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল রানা, নিশাত, খবির, আফজাল এবং কৃষ্ণ। অস্ত্র হাতে খুঁজতে শুরু করেছে তিশাকে।

‘আপা, বোমা পড়তে কতক্ষণ বাকি?’ জানতে চাইল রানা।

‘ছয় মিনিট, স্যর!’

আশপাশে কোথাও দেখা গেল না তিশাকে।

কালো-সবুজ দল অদৃশ্য হয়েছে।

কেউ নেই কিলাই বাবাম্বার ব্যারিকেডের ওদিকে ।

লড়াই শেষ ।

পড়ে আছে অসংখ্য লাশ ।

কনভেয়ার বেল্টের কাছেই ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিশাত । আস্তে করে মাথা দোলাল । ‘তিশাকে শেষবার এখানে দেখেছি । তখন এক টেরোরিস্টের মাথা কেটে নিল সুন্দর দেখতে এক লোক । তাদের দলের সবার পরনে ছিল কালো ইউনিফর্ম । সবুজ লেসার ফেলছিল । তখনই ওদিক থেকে পালাতে লাগল কিলাই বাবাম্বার সৈনিকরা ।’

মস্ত গুহার উত্তর-পূর্ব কোনা দেখাল নিশাত ।

ওদিকে রয়েছে এয়ার ভেন্ট ।

ওপাশে গ্যারাজের দরজার মত এক টানেল ।

ওখানে আরও কিছু দেখেছে রানা, মেঝের উপর একটা ম্যাগলুক ।

দ্রুত পায়ে গিয়ে ম্যাগলুক তুলে নিল রানা, অস্ত্রের উপর সাদা মার্কার কলম দিয়ে লেখা: তিশা করিম ।

এটা তিশার ম্যাগলুক । অর্থাৎ, ওকে ধরে নিয়ে গেছে বাউন্টি হান্টারের একটা দল, পরে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে ওর সঙ্গে ।

অস্ত্রটা বেল্টে আটকে নিল রানা । ফিরে চলল সবার উদ্দেশে । নিশাতের ভাঙা কথা শুনতে পেল: ‘...হ্যাঁ, এদিকে চতুর্থ দল এসেছে ।’

‘চতুর্থ দল, আপা?’ জানতে চাইল রানা । ‘তারা কারা?’

‘খনির ভেতর আমরা চারটা দল ছিলাম,’ বলল নিশাত । ‘ইউএন-এর ফোর্স, কিলাই বাবাম্বার সৈনিক, কালো পোশাক পরা সবুজ লেসারওয়ালা ওরা, আর চতুর্থ আরেক দল । ওই দল মিত্রবাহিনীর ব্যারিকেডের কাছে ব্রিটেনের এসএএস বাহিনীর ক্যাপ্টেন স্কট এম. ক্যাপলানকে পায় ।’

‘মেরে ফেলেছে তাকে?’ জানতে চাইল রানা।

‘মাথা কেটে নিয়েছে।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল রানা, তারপর বলল, ‘তা হলে ওরা বাউন্টি হান্টার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: চতুর্থ দল কোথায়?’

‘স্যর... মনে হয় ওরা এখানেই...’ শুরু করেও থেমে গেল খবির।

কিলাই বাবাম্বার ব্যারিকেডের চারপাশে ভূতের মত উদয় হয়েছে একদল লোক। সংখ্যায় কমপক্ষে বিশজন। পরনে কাদাটে রঙের ফ্যাটিং। মুখে স্কি-মাস্ক। পায়ে হলদে রাশান কমব্যাট বুট। আফ্রিকান ওয়ারলর্ডের সৈনিকদের ব্যারিকেডের সামান্য দূরে তাদের ড্রিফটরানার ভেহিকেল।

বেশিরভাগ কমাণ্ডার হাতে ভয়ঙ্করদর্শন খাটো ব্যারেলের ভিয়েড-৬১ স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল।

রাশান স্পেৎন্যাযের স্পেশাল ফোর্স ব্যবহার করে ওই অস্ত্র।

রানার দলকে বাগে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল তারা।

ঘিরে ফেলা দলটি থেকে সরে এল এক লোক। কাঁধের বার-এর কারণে বোঝা গেল, সে মেজর। কঠোর সুরে বলল, ‘হাত থেকে ফেলো অস্ত্র।’

এক পলক দ্বিধা করল রানা, তারপর হাতছাড়া করল অস্ত্র। ওর দেখাদেখি অন্যরাও। এবার রানার দিকে এল দুই স্পেৎন্যায সোলজার। দু’পাশ থেকে রানার দুই হাত ধরল তারা, মুচড়ে ঠেলে দিল পিঠের উপর।

‘মেজর রানা, তোমাকে দেখে খুশি হলাম,’ বলল স্পেৎন্যায মেজর। ‘আমাদের ইন্টেলিজেন্স বলেনি তুমি এই সাইটে থাকবে। মন্দ লাগছে না বাড়তি বোনাস পেয়ে। তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার খারাপ কী? তা ছাড়া, ভাল লাগছে সম্মানের কথা ভেবে। আমার হাতে বিদায় নেবে দুনিয়া-সেরা গুণ্ডচর।’

রানার দিকে চেয়ে আছে রাশান মেজর। ‘তবে সবাই বোধহয় বাড়তি প্রশংসা করত। ...ঠিক আছে, এবার বসে পড়ো হাঁটু গেড়ে, হাতদুটো মাটিতে।’

না বসে দাঁড়িয়েই রইল রানা। মাথা কাত করে দেখাল তিশার বসানো লেসার ডাইয়োড। ‘ওদিকে ওই ডিভাইসটা দেখেছ? ওটার কারণে হাজির হবে লেসার গাইডেড একুশ হাজার পাউণ্ডের একটা বোমা। আর বড়জোর পাঁচ মিনিট, তারপর...’

‘বলছি, হাঁটু গেড়ে বসো!’ চিৎকার করে বলল রাশান মেজর।

ক্যাথেড্রালের মত জায়গায় ভেটের ঠিক নীচে ও। ধূসর আলো আসছে উপর থেকে।

রানার ডান হাঁটুর পিছনে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আঘাত করল এক বাউন্টি হান্টার। ধপ করে বসতে হলো ওকে।

পিঠের খাপ থেকে সড়াং আওয়াজে খাটো কসাক ফাইটিং তলোয়ার নিল রাশান মেজর। আবছা আলোয় চকচক করছে তীক্ষ্ণধার ইস্পাতের ফলা।

‘সত্যি বলতে কি, হতাশই হয়েছি,’ রানার দিকে এগুতে শুরু করেছে মেজর, ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে চলেছে তলোয়ার। ‘ভেবেছিলাম অনেক কষ্টে বাগে পাব তোমাকে। এখন দেখছি, তুমি শালা একেবারেই কিছুই নও।’

দু’হাতে হাতল ধরে মাথার উপর তলোয়ার তুলল সে। মাথাটা সামান্য একটু বাঁকাল রানা নিশাতের উদ্দেশে। ঝপ করে বসে পড়ল নিশাত, হাতে তুলে নিয়েছে ফেলে দেয়া অস্ত্র। সাঁই করে নামছে ক্ষুরধার তলোয়ারের ফলা। ঠিক তখনই চরকির মত ঘুরে মেজরকে ল্যাং মারল রানা। লোকটা ধূপ করে পড়তেই থাবা মেরে কেড়ে নিল কসাক তলোয়ার, একইসময়ে তার কোমরের হোলস্টার থেকে তুলে নিয়েছে পিস্তল। গুলি শুরু করবে, এমন সময়...

বাউন্টি হাণ্ডারদের ওপর স্থির হলো নীল লেসারের ফোঁটা।
পরক্ষণে উড়ে গেল দুই গার্ড। ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে গুলির আঘাতে।

ঝট করে ঘুরে চাইল রানা, উঠে দাঁড়িয়েছে। তলোয়ার ফেলে
একহাতে ঘাড় ধরে টেনে তুলল রাশান মেজরকে। অন্য হাতে
পিস্তল, মাযল ঠেকিয়ে দিয়েছে শত্রুর কপালে।

প্রত্যেকের চোখ স্থির হয়েছে বিশেষ এক লোকের উপর।

খোলা জায়গায় এয়ার ভেন্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে সে, যেন
মস্ত কোনও বাদুড়। দুই হাতে দুটো রূপালি রেমিংটন শটগান।
এমনভাবে ধরেছে, যেন ভারী বন্দুক নয়, ছোট দুটো পিস্তল।
শটগানের ইস্পাতের ব্যারেলে হাইটেক নীল লেসার সাইটিং
ডিভাইস।

দু'পাশে ট্রাইপডে তৈরি রিমোট অপারেটেড এফএন-এমএজি
মেশিনগান। নাকের উপর নীল লেসার সাইট। একটা লেসার
পড়েছে স্পেৎন্যায মেজরের বুকে। অন্যান্য লেসার ঘুরছে রাশান
ট্রুপের উপর।

নতুন এই আগন্তুককে চিনে ফেলেছে রানা।

কুয়াশা!

চোখে অ্যান্টি-ফ্ল্যাশ গগলস।

রানা খেয়াল করল, এয়ার ভেন্টে নেমেছে পুরু দড়ি। চোখের
সামনে সড়াৎ করে উপরে রওনা হয়ে গেল ওটা, যেন ভুতুড়ে
কোনও ভয়ঙ্কর সাপ।

‘মিখাইল পেরোনভ,’ গমগম করে উঠল কুয়াশার গম্ভীর
কণ্ঠ, ‘আবারও দেখা হলো।’

মনে হলো না কুয়াশাকে দেখে খুশি হয়েছে রাশান মেজর।
লক্ষ্য করেছে, তার নিজের বুকে নীল লেসারের বিন্দুটা সম্পূর্ণ
স্থির। চুপ করে রইল সে।

নীল লেসারের আওতা থেকে দূরে সরে দাঁড়াল রানা।

সামনে বাড়ল কুয়াশা। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত স্পেৎন্যায় ইউনিটের মাঝ দিয়ে এগুতে শুরু করেছে, পাত্তাই দিচ্ছে না কাউকে।

রানা দেখল, কুয়াশার আলখেল্লার বুকে-পেটে কমপক্ষে বিশটা পকেট। ফুলে আছে দু'পাশের পকেটগুলোও। বেরিয়ে আছে দু'একটা মিলিটারি ডিভাইসের ডগা। তার ভিতর রয়েছে হ্যাণ্ডকাফ, মাউন্টেন ক্লাইমিং পিটন, হাতে ধরা যায় এমন ছোট একটা স্কুবা ট্যাঙ্ক বা পনি বটল। এমন কী বাদ পড়েনি খুদে ওয়েল্ডিং টর্চও।

‘কখন কী লাগে বলা যায় না,’ রানার উদ্দেশে পরিষ্কার বাংলায় বলল কুয়াশা।

রাশান এক ট্রুপারকে পাশ কাটাতে শুরু করেছে বাঙালি বৈজ্ঞানিক, তখনই হঠাৎ অস্ত্র তুলল লোকটা।

কড়াং আওয়াজে গর্জে উঠল অস্ত্র। বলসে উঠল আগুন।

অন্তত বিশটা গুলি বুকে নিয়ে ছিটকে পড়ল রাশান ট্রুপার।

ঘুরন্ত রোবোট মেশিনগান ঝিরঝির আওয়াজ তুলল, তার আগেই আবারও নল তাক করেছে আরেক দিকে।

মনে হলো না কুয়াশা চিন্তিত, সোজা এসে দাঁড়াল রানা এবং রাশান মেজরের সামনে। মৃদু হাসল রানার দিকে চেয়ে। ‘দেখছি কোবরা ইউনিটের দেখা পেয়ে গেছ। মেজর পেরোনভের আচরণে কষ্ট পেয়ো না। দু’দিন ধরে মানুষের মাথা কাটার কাজ নিয়েছে। ...আর আমি এসেছি আকাশে তিশাদের লেসার দেখে। ...এবার কাজের কথায় আসা যাক: বোমা পড়বে কখন?’

রানা মুখ খুলবার আগেই বলল নিশাত, ‘সাড়ে চার মিনিট পর।’ আরেকবার হাতঘড়ি দেখে নিল ও।

‘মিস্টার ফগ, আপনি যদি মাসুদ রানার মাথা নেন, আমরা আপনাকে দুনিয়ার শেষমাথা পর্যন্ত ধাওয়া করব,’ হুমকির সুরে

বলল মেজর পেরোনভ । ‘নিজ হাতে আপনাকে খুন করব ।’

‘মিখাইল,’ আরও গম্ভীর হয়ে গেল কুয়াশার কণ্ঠ: ‘জেনে রাখো, তুমি সারাজীবন চেষ্টা করলেও আমার একটা চুল স্পর্শ করতে পারবে না ।’

‘জানেন, এখনই আপনাকে শেষ করে দিতে পারে আমার লোক?’

‘তার আগেই তোমাকে মরতে হবে, মিখাইল,’ বলল কুয়াশা । দরাজ গলায় হেসে উঠল । ‘দেখলে না, সে চেষ্টা করতে গিয়ে তোমার লোকটার কী দশা হলো? উপায় নেই, মেজর । ভাল যোদ্ধা, কিন্তু বাস্তবে তুমি একটা সাইকোটিক পেশেন্ট । মানুষ মারতে পছন্দ করো, কিন্তু মরতে খুব আপত্তি আছে তোমার । মরণকে ভীষণ ভয় তোমার । কিন্তু আমার কথা আলাদা, মরতে আমার দ্বিধা নেই ।’

কথাগুলো হজম করতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল মেজর পেরোনভের মুখ, সবই শুনেছে তার লোক ।

রানা টের পেল, রাশান মেজরকে হালকাভাবে উড়িয়ে দিয়েছে প্রতিভাবান বাঙালি বৈজ্ঞানিক ।

‘এসো, রানা,’ মেঝে থেকে এমপি-৭ তুলে রানার হাতে ধরিয়ে দিল কুয়াশা । ‘তোমার দলের সবাইকে বলো, আমার সঙ্গে যেতে হবে ।’

দ্বিতীয় দফা গুলিবর্ষণ হলো না, স্পেৎন্যায ইউনিটকে এড়িয়ে কুয়াশার পিছনে রওনা হয়ে গেল রানার দল ।

‘ইনি কে, স্যার?’ রানার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল নিশাত ।

পেরোনভের পিস্তলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল রানা, নিচু স্বরে বলল, ‘এমন এক বাঙালি বৈজ্ঞানিক, যাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে বাংলাদেশ— কিন্তু অতীতে কিছু কারণে ঐকে খুঁজছিল পুলিশ ।’

‘পরে রানার কাছ থেকে ওসব জেনে নিয়ো, মেয়ে,’ বলল

কুয়াশা । ‘শুধু জেনে রাখো, আমি তোমাদের ক্ষতি চাই না ।’

ওরা পৌঁছে গেছে পুবে কিলাই বাবাম্বার ব্যারিকেডের কাছে ।
ওখান থেকে সামান্য দূরে শুরু হয়েছে একটা টানেল ।

ব্যারিকেডের শেষে একটা ড্রিফটরানার ট্রাক । ওটার দরজা
হ্যাঁচকা টানে খুলল কুয়াশা । ‘এসো, ওঠো ।’

রানা ক্যাবে উঠতেই পিছু নিল ওর দলের অন্যরা ।

থমথমে রাগ নিয়ে দেখছে কোবরা ইউনিটের স্পেৎন্যায
সৈনিকরা ।

ড্রিফটরানারের ড্রাইভিং সিটে বসল কুয়াশা, মুচড়ে দিল
ইগনিশন চাবির কান । রানার দিকে চাইল । ‘তৈরি থাকো । রিমোট
মেশিনগানের কাভার হারিয়ে গেলেই ওরা ধাওয়া করবে ।’

‘আমি তৈরি,’ বলল রানা ।

‘গুড ।’

মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরল কুয়াশা, ঝটকা দিয়ে
সামনে বাড়ল ড্রিফটরানার, দেখতে না দেখতে ঢুকে পড়ল আঁধার
টানেলে ।

কুয়াশা ও রানারা উধাও হতেই নড়ে উঠল স্পেৎন্যায
সৈনিকরা, লাফিয়ে গিয়ে উঠল তাদের ড্রিফটরানারগুলোয় ।

লোক বেশি বলে রানার লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেলের চাপল
তিনজন ।

গর্জে উঠল ইঞ্জিনগুলো । শুরু হলো পলাতকদের অনুসরণ ।

এগারো

নিকষ অন্ধকারে চোখ মেলেছে উজ্জ্বল হেডলাইট। ধুলোভরা গুহায় যুদ্ধে ব্যস্ত তলোয়ারের মত নাচছে বাতিগুলো।

তুমুল গতিতে সরু টানেলে সগর্জনে চলেছে কুয়াশার ড্রিফটরানার। আকারে হামভি ট্রাকের মতই, বড় একটা পিকআপ বললেও দোষ হবে না। পিছনে দীর্ঘ ট্রে। প্রায় ঘিরে রাখা হয়েছে ড্রাইভারের কম্পার্টমেন্ট। অবশ্য, ট্রে-র দিক থেকে দেয়াল বা জানালা দিয়ে আলাদা করা হয়নি ড্রাইভিং সেকশনকে। কেউ চাইলে ট্রে পেরিয়ে দু'সারি সিট টপকে আসতে পারবে সামনে।

কালো টানেল চৌকো, নিরেট গ্র্যানিটের। পুরু কাঠের কলাম ও বিম ওজন নিয়েছে পাথুরে ছাতের। নিষ্কিণ্ত তীরের মত গেছে সরল পথ। ড্রিফটরানারের দু'পাশে বড়জোর এক ফুট জায়গা, তারপর প্রস্তর প্রাচীর। প্রচণ্ড গতি ট্রাকের। ছাতের চারফুট উপরে সিলিং। পিছনে চলে এসেছে কোবরা ইউনিট।

কুয়াশার ড্রিফটরানারের পিছনে রানার এলএসভি, ওতে করে আসছে তিন রাশান কমাণ্ডো। তাদের যান অনেক দ্রুতগামী, সরে যেতে পারে ঝট করে। উন্মাদের মত আসছে ড্রাইভার, ড্রিফটরানারের উপর ভিয়েড-৬১ মেশিন পিস্তল থেকে গুলি শুরু করছে তার দুই সঙ্গী।

এলএসভির ছুটন্ত হেডলাইটের রশ্মি ভাসিয়ে দিয়েছে নিশাত, আফজাল ও কৃষ্ণকে। পাল্টা গুলি শুরু করল ওরা।

এলএসভির পিছনে আরও তিন ড্রিফটরানার, আসছে স্পেৎন্যায ইউনিটের মেজর মিখাইল পেরোনভ সহ সতেরোজন কমাণ্ডো।

ছোট কাফেলা, পাথুরে টানেলে ভয়ঙ্কর গতি তুলেছে।

‘আপা!’ ড্রাইভিং কম্পার্টমেন্ট থেকে চৈতাল রানা। ‘সময়?’

‘তিন মিনিট!’

‘এই সুড়ঙ্গ কতদূর গেছে?’ কুয়াশার কাছে জানতে চাইল রানা।

‘মোটামুটি চার মাইল।’

‘ঠিক সময়ে বেরুতে না পারলে...’ চুপ হয়ে গেল খবির।

নিশাত, খবির, আফজাল ও কৃষ্ণের অস্ত্রের মাযল থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে লালচে আগুন। পালাক্রমে গুলি করছে দ্রুতগামী এলএসভির উপর। দু’জন গুলি করলে অন্য দু’জন অস্ত্র রিলোড করছে।

এ নিয়ম মেনে ঝট করে বসে পড়ল নিশাত ও খবির, ব্যস্ত হয়ে উঠল অস্ত্রে গুলি ভরতে। ওদের জায়গা নিল আফজাল ও কৃষ্ণ। তখনই তুমুল বৃষ্টির মত এল কয়েক পশলা বুলেট। মুহূর্তে উধাও হলো কৃষ্ণের মুখ, ওখানে রইল শুধু থকথকে রক্ত ও চেরা মাংস। কণ্ঠে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল আফজাল। গাড়ি থেকে ওর পতন ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকাল খবির। ধরে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু মস্ত সুযোগ পেয়ে গেল কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডোরা।

গুলি ভরবার ফাঁকে পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছে নিশাত, ঘুরেই দেখল কী ঘটছে। এলএসভির প্যাসেঞ্জার সিট থেকে সামনে বেড়েছে দুই যাত্রী, উঠেছে গাড়ির বনেটে, লাফ দিয়ে নামল ড্রিফটরানারের পিছনের ট্রে-তে।

আফজালকে দু’হাতে ধরে আছে খবির।

এবার আর রক্ষা নেই ওর।

খবিরের মাথা লক্ষ্য করে অস্ত্র তুলল কোবরা ইউনিটের দুই সদস্য।

তারই ফাঁকে খবির দেখল, আস্তে করে কাত হয়ে গেল আফজালের মাথা। মারা গেছে ছেলেটা।

গুলিভরা অস্ত্র নেই নিশাতের হাতে, ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই রাশান সৈনিকের উপর।

পর মুহূর্তে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ট্রে-র মেঝেতে পড়ল ওরা তিনজন। দু'পাশে সাঁই-সাঁই পিছিয়ে চলেছে টানেলের পাথুরে, ধূসর দেয়াল।

কুয়াশা ও রানা সবই দেখতে পেয়েছে।

সিট থেকে উঠেই ঘুরে দাঁড়াল রানা।

‘এটা নাও!’ গুড়গুড় করে উঠল কুয়াশার কণ্ঠ। বাড়িয়ে দিয়েছে রূপালি রেমিংটন। ‘ওদেরকে সাহায্য করার পর পিছনের গাড়ি ঠেকাতে চেষ্টা কোরো!’

ড্রিফটরানারের ট্রে-তে ডাইভ দিয়ে নামল রানা। দেখল, মেঝেতে দুই কমাণ্ডোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে নিশাত। মৃত আফজালকে দু'হাতে ট্রে-তে তুলে নিল খবির। নাকের কাছে হাজির হয়েছে এলএসভি। বন্ধ টানেলে দিনের আলো দিচ্ছে উজ্জ্বল হেডলাইট। একজনকে লাথি মেরে ফেলে দিল রানা ট্রে থেকে, অপরজনকে মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে দিল নিশাত পিছনের গাড়ির দিকে। পিষে গেল সে এলএসভির চাকার নীচে।

দু'হাতে রূপালি রেমিংটন তুলল রানা, গুলি করল এলএসভি লক্ষ্য করে।

জোর লাথি দেয়ার মত ঝাঁকি মারল বন্দুক।

তার চেয়ে ঢের অবাক করা একটা কাজ করল।

বিশেষ কোনও গুলি ব্যবহার করে কুয়াশা।

ওই অদ্ভুত গুলির কারণে নানাদিকে ছিটকে গেল এলএসভির

বডি, লাফিয়ে উঠেছে চেসিস থেকে। মুহূর্তের জন্য আকাশে ভাসল এলএসভি, তারপর কাত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাশের দেয়ালে। তীব্র গতিতে উল্টে গেল লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল, ডিগবাজি দিতে শুরু করে পিছু নিল সামনের ড্রিফটরানারের। কয়েক মুহূর্ত পর ধূপ করে পড়ল মুচড়ে যাওয়া ছাতে ভর করে।

আশ্চর্যজনক, গাড়ির ড্রাইভার এখনও সুস্থ!

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়।

পরের সেকেণ্ডে পিছন থেকে ছিন্নভিন্ন হলো এলএসভি। লক্ষ টুকরো হলো পিছনের ড্রিফটরানারের আঘাতে। বিস্ফোরিত এলএসভি মাড়িয়ে বেরিয়ে গেল পর পর তিনটে ড্রিফটরানার।

কয়েক মুহূর্ত পর আবারও কুয়াশার ড্রিফটরানারের পিছনে হাজির হলো রাশান কমাণ্ডেরা।

ধূসর ধুলো উড়িয়ে ছুটছে কুয়াশার যান।

রাশানদের সামনের ট্রাকের গতি প্রচণ্ড, গুঁতো দিল রানাদের গাড়ির পিছনে।

বেদম ঝাঁকি খেল দুই জিপ।

তখনই কয়েক লাথিতে ভেঙে পড়ল রাশানদের সামনের গাড়ির উইণ্ডশিল্ড। বনেটে উঠে এল কয়েকজন। কিছু করবার সময় বা সুযোগই পেল না রানা। আবছা আলোর সুড়ঙ্গে ওদের ড্রিফটরানারের ট্রে-তে লাফিয়ে নেমে এল তিন কমাণ্ডে। খবির বা নিশাতকে পাত্তাই দিল না, সামনে বাড়ল রানার মুখোমুখি হতে। হাতে উদ্যত মেশিন পিস্তল।

রিয়ার ভিউ মিররে এদের দেখেছে কুয়াশা। দেরি না করে দাঁড়িয়ে গেল ব্রেক প্যাডেলের উপর।

মস্ত হোঁচট দুলিয়ে দিল ওদের ড্রিফটরানারকে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। ছেঁচড়ে সামনে এগোলো নিশাত, খবির ও মৃত আফজাল। পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিল রানা।

পিছনের তিন জিপ যেন পলকা ডোমিনো, হামলে পড়ল
পরস্পরের উপর। কর্কশ আওয়াজ উঠল লোহা ভাঙার।

রানাদের ড্রিফটরানারে তিন কোবরা কমাণ্ডো ছিটকে পড়ল
সামনে। অস্ত্র হাত ছাড়া করল তাদের একজন, কিছু ধরতে চাইল
দু'হাতে। ডানদিকের লোকটা মেঝেতে পড়েছে রানার পাশেই,
এবং তৃতীয় লোকটা উড়ে গিয়ে পড়ল ড্রাইভারের কম্পার্টমেন্টের
ভিতর। নাক-মুখ ছেঁচে গেল ড্যাশবোর্ডে লেগে। কয়েক মুহূর্ত পর
মুখ তুলে দেখল, চোখের দিকে চেয়ে আছে রূপালি বন্দুক।
ব্যারеле জ্বলছে নীল বিন্দু, আলোকিত করে তুলেছে তার
নাকটাকে।

এক সেকেণ্ড পর গর্জে উঠল কুয়াশার বন্দুক।

টাশ্শ!

তরমুজের মত বিস্ফোরিত হলো ট্রুপারের মাথা। টমেটোর
সুপের মত নানাদিকে ছিটকে গেল রক্ত।

আবারও মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল কুয়াশা অ্যাক্সেলারেটর,
ঝটকা দিয়ে সামনে বাড়ল গাড়ি।

তাল সামলে নিয়েছে অন্য দুই স্পেৎন্যায কমাণ্ডো। তাদের
লক্ষ্য মাসুদ রানা।

অস্ত্রহীন ওরা সবাই।

খাপ থেকে সড়াৎ করে ওয়ারলক হাণ্ডিং নাইফ বের করল দুই
রাশানের একজন, অন্যজন চট করে মেঝে থেকে তুলে নিল
ভিয়েড-৬১ মেশিন পিস্তল। ঘুরেই গুলি করতে চাইল।

কিন্তু তখনই ঝট করে ঘুরে চাইল কুয়াশা, বুঝতে দেরি হয়নি
বিপদে পড়েছে রানা।

বিদ্যুৎবেগে নড়ে উঠেছে বাঙালি গুপ্তচর।

কারাতের চপে মেশিন পিস্তল সরিয়ে দিল ও, অন্যহাতে খপ্প
করে ধরতে চাইল অস্ত্রের নল।

তখনই গর্জে উঠল শত্রুর মেশিন পিস্তল ।

পাশ কাটিয়ে গেল গুলি, কিন্তু বুঝতে দেরি হলো না রানার,
একা দু'জনকে ঠেকাতে পারবে না ও ।

ছোরা হাতে লাফিয়ে সামনে বাড়ল কোবরা ইউনিটের দ্বিতীয়
কমাণ্ডো, একপাশ থেকে চালাল ওয়ারলক হান্টিং নাইফ ।

এবার কচ্ করে কাটা পড়বে রানার গলা ।

কিন্তু তার আগেই ঝটকা দিয়ে সিট ছেড়েছে কুয়াশা,
অবিশ্বাস্য গতিতে উপস্থিত হলো ট্রে-র মুখে । দু'কাঁধে বাইসনের
শক্তি, অনায়াসেই ঠেলে ফেলল দু'রাশান কমাণ্ডোকে । ভিষেড-৬১
হাতে লোকটাকে রানার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে বৈজ্ঞানিক,
এক টানে ভরে দিল ড্রাইভিং কম্পার্টমেন্টের ভিতর ।

তখনই পিছন থেকে গুঁতো দিল রাশান ড্রিফটরানার ।

জোরালো হোঁচট খেল কুয়াশা ও দুই স্পেৎন্যায কমাণ্ডো ।
উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে গিয়ে ড্রিফটরানারের বনেটে পড়ল ওরা ।

ভাঙেনি উইণ্ডশিল্ড, ওই কাঁচ শাটারপ্রুফ, মাকড়সার জালের
মত ফাটল ধরেছে ওখানে । ধুপ্ আওয়াজ তুলে ছিটকে গেছে
ফ্রেম থেকে, বনেটে নেমেই স্থির হয়েছে । চৌকো কাঁচের তৈরি
চিড় ধরা ম্যাট্রেস যেন ।

সবু টানেলে তুমুল গতি তুলছে চার ড্রিফটরানার ।

প্রথমবারের মত রানা দেখল, গ্যাস প্যাডেলে সিলের একটা
দণ্ড ঠেস দিয়ে রেখে ড্রাইভিং সিট ছেড়েছে কুয়াশা । সরলরেখার
মত সোজা টানেলে ছুটছে জিপ । দু'পাশের পাথুরে দেয়ালে
এদিক-ওদিক লাগছে গাড়ির বডি ।

বনেটের উপর দু' কমাণ্ডোর সঙ্গে হাতাহাতি লড়ছে কুয়াশা ।

রানাকে শেষ করতে আবারও ফিরতে চায় ছোরাওয়ালা ।
এদিকে নিজেকে বনেটে স্থির করতে গিয়ে হারিয়ে বসেছে তার
সঙ্গী ভিষেড-৬১ ।

উইগুশিল্ড নিয়ে পড়বার সময় সবচে বিপদে পড়েছে কুয়াশা। পা-দুটো ঝুলছে দ্রুতগামী ড্রিফটরানারের নাকের কাছে। একহাতে ধরেছে ঝুল-বার। তারই ফাঁকে দেখল, আবারও হাঁচড়ে-পাঁচড়ে রানার দিকে ফিরতে চাইছে ছোরাওয়ালা। ডানহাতে তার বুট আঁকড়ে ধরল কুয়াশা, হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল নিজের পাশে। পরের টানে সে গিয়ে পড়ল ড্রিফটরানারের সামনে।

ড্রিফটরানারের নীচে যাওয়ার সময় বিকট আত্ননাদ ছাড়ল কমাণ্ডো, পরক্ষণে চাপা পড়ল চাকার নীচে। লাফিয়ে উঠল গোটা গাড়ি, পেরুল লোকটাকে। কয়েক সেকেন্ডে তাকে চেপ্টে দিল পুরো কাফেলা। চতুর্থ ট্রাক যাওয়ার পর দেখা যাবে, পড়ে আছে হাড় চূর চূর হওয়া এক রক্তাক্ত লাশ।

কোবরা ইউনিটের দ্বিতীয় লোকটা সবই দেখেছে। লাথি দিতে শুরু করেছে কুয়াশার হাতে। কিন্তু লাফিয়ে উঠে খপ্প করে তার বেল্ট ধরল বৈজ্ঞানিক, নিজের দিকে টানতে লাগল।

‘না!’ ভয় পেয়ে চেষ্টা করে উঠল লোকটা, ‘না!’

‘ভয় কীসের?’ কঠিন সুরে বলল কুয়াশা। বনেটের শেষ প্রান্তে টেনে আনল কমাণ্ডোকে। পাশাপাশি হলো দু’জন। রাশান লোকটা নিজেও প্রকাণ্ডেহী, থরথর করে কাঁপছে রাগে-ভয়ে। দু’হাতে খপ্প করে ধরল কুয়াশার গলা।

‘আমি যদি পড়ি, তোকেও মরতে হবে!’ গর্জে উঠল।

‘বেশ,’ শান্ত স্বরে বলল কুয়াশা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই পা সরিয়ে নিল ড্রিফটরানারের বাম্পারের উপর থেকে। সঙ্গে নিয়েছে রাশান কমাণ্ডোকে। ট্রাকের সামনে ধুলোময় পথে পড়ল দু’জন।

মেঝেতে পড়েই গড়ান দিল স্পেৎন্যায ট্রুপার, তখনই মড়াং আওয়াজ তুলে চেপ্টে গেল ড্রিফটরানারের সামনের চাকার নীচে। কুয়াশার মত করে খপ্প করে ধরতে পারেনি উইগুশিল্ডের ম্যাট্রেস।

পড়বার সময় ফাটল ধরা কাঁচের মাদুর সঙ্গে নিয়েছে কুয়াশা।

নীচে রেখেছে ওটাকে, নেমে এসেছে বুনো বিড়ালের মত। কয়েক মুহূর্ত সামনে বেড়েছে কাঁচের মাদুর, তখনই ওটার উপর দিয়ে সগর্জনে পেরুল প্রথম ড্রিফটরানার।

দেখতে না দেখতে হুস্-হুস্ করে কুয়াশাকে পেরিয়ে গেল চার ড্রিফটরানার।

মাদুরে নিশ্চিন্তে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কুয়াশা। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। চতুর্থ গাড়ি পেরুতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল বিজ্ঞানী। আলখেল্লা থেকে নিয়েছে দ্বিতীয় শটগান। শক্ত করে ব্যারেল ধরে ব্যবহার করেছে পিস্তল-গ্রিপ, বাধিয়ে নিয়েছে চতুর্থ গাড়ির রিয়ার বাম্পারের নীচে।

সাঁৎ করে পিঠের তলা থেকে সরে গেছে কাঁচের মাদুর। আঁধার টানেলে কুয়াশাকে নিয়ে ছুটে চলেছে কাফেলার পিছনের গাড়ি। পাথুরে মেঝেতে বেকায়দাভাবে ঠোকর লাগছে কুয়াশার পা।

ব্যারেল বেয়ে সামনে বাড়ল বিজ্ঞানী, কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছল পিছনের ড্রিফটরানারের ট্রের কাছে। এবার উঠে পড়বে গাড়িতে। নতুন করে লড়বে শত্রুদের বিরুদ্ধে।

দেরি না করে ড্রিফটরানারের ড্রাইভিং সিটে বসে পড়েছে মাসুদ রানা। উইণ্ডশিল্ড নিয়ে বনেটে কুয়াশা পড়বার পর, লাথি দিয়ে অ্যাক্সেলারেটর আটকে রাখা ইম্পাতের দণ্ড সরিয়ে দিয়েছে ও, ড্রাইভ করছে ঝড়ের গতিতে।

রিয়ার ভিউ মিররে দেখল, দুই স্পেৎন্যায কমাণ্ডার সঙ্গে আনআর্মড কমব্যাটে ব্যস্ত নিশাত-খবির।

কিন্তু দ্বিতীয় ড্রিফটরানার থেকে ওদের যানের ট্রেতে নামল আরও দুই ট্রুপার। তেড়ে এল ড্রাইভিং কম্পার্টমেন্ট লক্ষ্য করে।

ওরা সংখ্যায় অনেক, ড্রাইভিঙের ফাঁকে ভাবল রানা।

কোবরা ইউনিটের নতুন দুই সৈনিকের হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র। যখন তখন খতম হবে রানা। খনির ভেহিকেল বিষয়ে একটা কথা চট করে মনে পড়ল ওর। দেরি না করে হাত বাড়িয়ে দিল সিটবেল্টের দিকে।

‘আপা! খবির! শক্ত করে কিছু ধরুন!’

ড্রাইভিং সিট থেকে আরেকদিকে হাত বাড়াল রানা, জোর ধাক্কা দিয়ে খুলে দিল প্যাসেঞ্জার দরজা।

ফলাফল বিস্ময়কর।

আচমকা কাজ করল ড্রিফটরানারের হ্যাণ্ডব্রেক। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। যেন কোনও মাইনার আহত না হয়, সেজন্য খনির সব ভেহিকেলে থাকে ওই সেফটি ফিচার। দরজা খুললেই নিউট্রাল হয় গিয়ার, সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে হ্যাণ্ডব্রেক।

প্রস্তুত ছিল না, ফলে দ্বিতীয় ড্রিফটরানার বেদম গুঁতো দিল রানাদের গাড়ির পিছনে। পরের দুই গাড়ি যেন বুজে আসা বাদ্যযন্ত্র অ্যাকর্ডিয়ন।

পিছন থেকে গুঁতো আসতেই বেকায়দাভাবে হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল রানার পিকআপ ট্রাক।

শত্রুদেরকে শেষ করতে এসে মস্ত বিপদে পড়েছে দুই কোবরা কমাণ্ডো, একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। প্রথমজন রানাকে পাশ কাটিয়ে উইণ্ডশিল্ডের ফাঁকা জায়গা দিয়ে উড়ে গেল। নামল কমপক্ষে পনেরো ফুট দূরে। ড্রাইভিং কেবিনের ছাতে বেধে গেল দ্বিতীয়জনের থুতনি, ছিটকে বেরিয়ে গেল দুই পা, কিন্তু আটকা পড়ল তার মাথা— কড়াৎ আওয়াজে ভাঙল ঘাড়।

এদিকে রানার কথায় হাতাহাতি বাদ দিয়ে খপ করে ট্রের একপাশ ধরেছে নিশাত ও খবির। ড্রিফটরানার থামতেই ছিটকে সামনে বাড়ল দুই স্পেৎন্যায কমাণ্ডো। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ড্রাইভিং ও প্যাসেঞ্জার সিটের পিছনে।

মাথায় বাড়ি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল তাদের একজন ।
অন্যজন সামান্য আহত, উঠে দাঁড়াল ।
কিন্তু তার, মাথার উপর নামল নিশাতের এমপি-৭-এর বাঁট ।
জ্ঞান হারিয়ে ধূপ করে পড়ল লোকটা ।
দুই অচেতন কমাণ্ডোকে গাড়ি থেকে ফেলে দিল খবির ও
নিশাত ।

কাজ শেষ, হাত বাড়িয়ে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা বন্ধ করল
রানা, মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর ।

নতুন উদ্যমে সামনে বাড়ল গাড়ি ।

খুব ক্ষতি হয়নি পিছনের ড্রিফটরানারগুলোর যাত্রীদের ।

পিছু নিল তারা সামনের পিকআপের ।

সংখ্যায় ট্রুপাররা এখনও কমপক্ষে দশজন ।

কিন্তু তখনই নিজের কাজ শুরু করল কুয়াশা । পিছনের গাড়ি
গুঁতো খেয়ে থামতেই ট্রে বেয়ে উঠছিল, ফলে আহত হয়নি । নতুন
করে চার ড্রিফটরানার রওনা হতেই উঠে এল পিছনের গাড়িতে ।
কোনও সুযোগই পেল না কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডোরা ।

বাধা দিতে চাইল, অস্ত্র তুলল শত্রুকে শেষ করতে ।

কিন্তু কুয়াশা যেন নিজেই একটা মেশিন গান ।

পিছনের ট্রেতে বন্দুকের গুলি খেয়ে উড়ে গেল দুই কোবরা
কমাণ্ডো । প্রথমজন মরল মাথায় বুলেট নিয়ে । একহাতে
দ্বিতীয়জনের গলা চেপে ধরল কুয়াশা, মাথাটা ঠেলল ড্রাইভিং
কম্পার্টমেন্টের ছাতের চেয়ে উপরে । দ্রুতগতিতে পিছিয়ে যাওয়া
এক ওভারহেড বিমে লাগল সৈনিকের মাথা, ধড় থেকে গোটা মুণ্ডু
খটাং করে ছিটকে গেল আরেকদিকে ।

পরক্ষণে ড্রাইভারের কম্পার্টমেন্টে হাজির হলো কুয়াশা, টাশ্শ
আওয়াজ তুলল খাটো নলের রেমিংটন, উগরে দিল লালচে
আগুন । ছিন্নভিন্ন হলো যাত্রী ।

হতবাক হয়ে ঘুরে চাইল ড্রাইভার ।

কিন্তু তাকে পাত্তাই দিল না কুয়াশা, এক গুলিতে উড়িয়ে দিল
উইণ্ডশিল্ড, পর মুহূর্তে ওই ফাঁকা জায়গা দিয়ে লাফিয়ে উঠে এল
তৃতীয় ট্রাকের ট্রের উপর ।

এ ট্রাকে রয়েছে মেজর পেরোনভ ।

কুয়াশাকে দেখতে পেয়েই আড়াল খুঁজতে চাইল সে ।

ড্রিফটরানারের মাঝ ধরে এগোচ্ছে বৈজ্ঞানিক । উড়ে গেল
দু'পাশের কমাগোরা । পাল্টা গুলি করতে চাইল দু'একজন, কিন্তু
তাদের চেয়ে অনেক দ্রুত কুয়াশা । কী করে যেন আগেই বুঝছে
এরপর কী করবে সৈনিকরা ।

ড্রাইভিং কম্পার্টমেন্টের দিকে কুয়াশা যেতেই ড্যাশবোর্ডের
নীচে লুকিয়ে পড়তে চাইল পেরোনভ ।

মাত্র এক সেকেণ্ড তাকে দেখল কুয়াশা, স্থির করল এখানে
সময় নষ্ট করবে না । রওনা হলো রানার ড্রিফটরানার লক্ষ্য করে ।

রাশান মেজরকে শেষ না করেই লাফিয়ে দ্বিতীয় ট্রাকে নামল
কুয়াশা ।

এদিকে তুমুল গতি তুলেছে রানা । গাড়িতে শত্রু নেই । বহু দূরে
ছোট্ট চারকোনা সাদা আলো । ওদিক দিয়ে বেরুতে পারবে সুড়ঙ্গ
থেকে ।

ওর পাশে প্যাসেঞ্জার সিটে এসে বসল নিশাত । 'স্যর, এরা
কারা? আর কালো আলখেল্লা পরা ওই বৈজ্ঞানিক?'

'পরে কথা হবে, আপা,' বলল রানা । খেয়াল করল, পিছনের
ড্রিফটরানারের বনেটে' উঠেছে কুয়াশা । 'শুধু জেনে রাখুন,
আশপাশে যত লোক, তাদের ভিতর ওই কুয়াশা একমাত্র মানুষ,
যে আমাদেরকে খুন করতে চাইছে না ।'

'পরে হয়তো চাইবে,' পিছনের ট্রে থেকে বলল খবির, 'একে

এড়িয়ে যাওয়াই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ ।’

‘আমারও তাই মনে...’ চুপ হয়ে গেল নিশাত ।

সুড়ঙ্গের শেষভাগে পৌঁছে গেছে ওরা ।

উজ্জ্বল সাদা চৌকো আলো আসছে দূর থেকে ।

ওখানে পৌঁছুতে আর বড়জোর দুই শ’ গজ পেরুতে হবে ।

অন্য কারণে কথা থামিয়ে দিয়েছে নিশাত ।

সুড়ঙ্গের শেষে খোলা আকাশে ভাসছে পৈশাচিক এক দানবীয়
জিনিস, যেন প্রাগৈহাসিক কোনও টেরোডাকটিল ।

ওটা জেট ফাইটার বিমান । কালো রঙের ।

সুখোই এস-৩৭, ভাসছে সুড়ঙ্গের মুখে ।

খাড়া নাক তাক করেছে ড্রিফটরানার লক্ষ্য করে । ঝুলে আসা
ডানায় ভরা আছে মিসাইল । অশুভ এক বাজপাখি যেন । মুখোমুখি
হওয়ার জন্য চেয়ে আছে ভয়ঙ্কর চেহারা করে ।

ধূপ্ আওয়াজ পেল রানা । ড্রিফটরানারের ট্রেতে নেমেছে
কুয়াশা, সিটের কাছে পৌঁছে বলল, ‘ভয় নেই ।’ ফাইটার বিমানের
দিকে ইশারা করল । ‘ওটা আমাদেরকে সরিয়ে নেবে ।’ রিস্ট
গার্ড-এ বাটন টিপল, চালু হয়ে গেল রেডিয়ো । ‘রঘুপতি, আসছি!
পিছনে শত্রুদের ড্রিফটরানার । ব্যবহার করবে সাইডওয়াইণ্ডার ।
আবারও বলছি, ডানদিকের ডানা থেকে মিসাইল । নিচু করে তাক
করবে । দুই শ’ মিটারের জন্য আর্ম করো । গতবছর যেমন
হয়েছিল আর্জেন্টিনায় ।’

‘ইয়েস, বস!’ গম্ভীর কণ্ঠ শুনল ওরা ।

রানাকে বলল কুয়াশা, ‘আপত্তি না থাকলে ড্রাইভ আমি করি ।’

সিট থেকে সরে গেল রানা, সেখানে বসল কুয়াশা । এক
সেকেণ্ড পর মাপা হাতে মোচড় দিল স্টিয়ারিং হুইলে ।

দেয়াল ঘেষে ছুটছে পিকআপ, আরেকবার হুইলে মোচড় দিল
কুয়াশা, তখনই ধূপ্ আওয়াজ তুলে বামদিকের চাকাগুলো উঠে

গেল দেয়ালে। গতি কমল না, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে
ছুটছে গাড়ি।

‘ঠিক আছে, রঘুপতি, এবার!’ রিস্ট মাইকে বলল কুয়াশা।

দিগন্তে ভাসছে কালো ফাইটার, ডানদিকের ডানা থেকে
ছিটকে বেরোল ধোঁয়ার রেখা। ফাঁপা আওয়াজ তুলে সুড়ঙ্গের
ভিতর রওনা হয়ে গেছে সাইডওয়াইণ্ডার।

মিসাইল আসছে মাটি ঘেঁষে, গতি প্রচণ্ড।

রানা দেখল, মিসাইল আসছে বাঁ দেয়াল ছুঁয়ে। দেখতে না
দেখতে পৌঁছে গেল নাকের কাছে। তারপর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত
হওয়া ড্রিফটরানারের তলা দিয়ে হুস্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে
গেল। বিঁধল গিয়ে পিছনের ট্রাকের নাকে।

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হলো।

ভেঙে পড়ল সুড়ঙ্গের চারপাশ।

লক্ষ টুকরো হলো প্রথম স্পেৎন্যায ড্রিফটরানার।

ওটার নিতম্বে নাক গুঁজল পরের ড্রিফটরানার।

শেষেরটা হুমড়ি খেল সামনের গাড়ির উপর।

মুহূর্তে থামল তিন গাড়ির গতি।

আর একইসময়ে সুড়ঙ্গের মুখ থেকে ছিটকে উজ্জ্বল আলোয়
বেরিয়ে গেল রানাদের ড্রিফটরানার।

পাহাড়ের খাড়া উপত্যকা এদিকটা।

পথ গেছে ঐকেবেঁকে নীচে।

সামান্য দূরে একহাজার ফুট নেমেছে খাদ। পাশেই ভাসছে
সুখোই ফাইটার।

নিশাতের দিকে চাইল কুয়াশা। ‘বোমা পড়তে কতক্ষণ
বাকি?’

হাতঘড়ি দেখল ক্যাপ্টেন। ‘তিরিশ সেকেন্ড।’

‘খুশি হবে না মেজর পেররোনভ।’ রিস্ট মাইকে বলল

কুয়াশা, 'রঘুপতি, পরের বাঁকে দেখা করো।' রানার দিকে চাইল।
'আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি আছে?'

'না।'

পঁচিশ সেকেন্ড পর পাহাড়ের সমতল এক প্ল্যাটফর্মের মত
জায়গায় নামল চকচকে সুখোই। তখনই পৌঁছে গেল রানাদের
ড্রিফটরানার।

কালো বিমানের পাশে গাড়ি রাখল কুয়াশা।

তখনই ওরা দেখল, হাজির হয়েছে সি-১৩০ হারকিউলিস
বিমান। তিশার রেখে যাওয়া লেসার ডাইয়োডের কারণে সহজেই
খুঁজে নিয়েছে খনির শাফট। পেট থেকে ছেড়ে দিল একুশ হাজার
পাউণ্ডের এমওএবি বোমা।

নিখুঁতভাবে কাজ করেছে গাইডেন্স সিস্টেম।

সাঁই-সাঁই করে নামছে বোমা।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছে গেল টার্মিনাল ভেলোসিটিতে।

মুহূর্তে মস্ত বোমা মিলিয়ে গেল খনির চিমনির ভিতর।

সময় গনতে শুরু করেছে রানা।

ওয়ান থাউয়েণ্ড ওয়ান...

ওয়ান থাউয়েণ্ড টু...

ওয়ান থাউয়েণ্ড থ্রি...

এবার বিস্ফোরিত হওয়ার কথা ওই বোমা।

তখনই থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা পাহাড়।

আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত কান ফাটানো বিকট বুম-বুম!
আওয়াজ শুরু হয়েছে।

যেন মাথার উপর নামছে ভয়ঙ্কর বজ্র।

সুখোই বিমানের ককপিটে দু'জন বসতে পারে, তরতর করে
মই বেয়ে উঠছে খবির ও নিশাত।

কুয়াশাকে ইশারা করল রানা, যেন আগে ওঠে বিমানে।

মাথা নাড়ল বিজ্ঞানী। ‘তুমি আগে।’
বাধ্য হয়ে মই বাইতে শুরু করল রানা, কিন্তু টলে উঠতে
হলো ওকে জোরালো ভূমিকম্পের কারণে।
চোখ গেল আকাশছোঁয়া চূড়ার দিকে।
ওখানে লাফিয়ে উঠেছে বিপুল মাটি-পাথর-ধুলোবালি।
বুঝতে দেরি হলো না, কী ঘটছে। চাপা স্বরে বলল রানা,
‘জলদি! অ্যাভালাঞ্চ শুরু হয়েছে!’

বারো

বিমানের মই বেয়ে উঠবার ফাঁকে খনি-সুড়ঙ্গের দিকে চাইল
রানা। এইমাত্র টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছে দুই লোক। দুই
সেকেণ্ড পর রকেট গতিতে টানেল থেকে বেরোল তপ্ত তীব্র
হাওয়া, সঙ্গে ছিটকে এল কোবরা ইউনিটের ব্যবহৃত অবশিষ্ট তিন
ড্রিফটারানার।

মাটিতে পড়ে যাওয়া ওই দু’জনকে পাশ কাটিয়ে ডিগবাজি
দিতে দিতে পাহাড়ি খাদের পারে পৌঁছে গেল তিন ড্রিফটারানার,
দিগন্তের দিকে রওনা হলো আকাশ পথে— কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডে
পর খসে পড়ল কার্টনের দৃশ্যের গাড়িগুলোর মত। এক হাজার
ফুট নামল কয়েক সেকেণ্ডে, বিস্ফোরিত হলো সব র‍্যাভিনে পড়ে।

তখনই পাহাড়ের উপর থেকে এল ভয়ঙ্কর গুড়গুড় আওয়াজ।

সুখোই বিমান যেখানে সমতলে নেমেছে, তার চেয়ে কমপক্ষে
একহাজার ফুট উপরে শুরু হয়েছে ভূমিধস। নড়ে উঠল পাহাড়ের

গোটা চূড়া, বিপুল পাথর-মাটি নিয়ে হুড়মুড় করে নামতে লাগল ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মত আওয়াজ তুলে।

‘আপা-খবির! জলদি!’ মই বেয়ে উঠতে শুরু করে দ্বিতীয়বার তাড়া দিল রানা।

গতি বাড়ছে পাথর-মাটির ধসের। নানাদিকে ছিটকাচ্ছে বিপুল ধুলো।

ভয় লাগিয়ে দেয়া গুড়গুড় আওয়াজের উপর দিয়ে গম্ভীর সুরে বলল কুয়াশা, ‘ওঠো বম বে-তে।’

হাচড়েপাছড়ে খুদে ককপিট পেরিয়ে পিছনের বম বে-তে পৌঁছে গেল নিশাত ও খবির।

বম বে জায়গাটা বদলে নিয়েছিল পোলাণ্ডের বাউন্টি হাণ্টার পোলিশ, ব্যবহার করত কারাগারের মত করে।

কয়েক সেকেন্ড পর ককপিট পেরোল রানা, বসে পড়ল রিয়ার গানারের সিটে। পাঁচ সেকেন্ড পর ওকে পাশ কাটিয়ে বম বে-তে ঢুকল কুয়াশা।

চোখের সামনে নেমে আসছে পাহাড়ি ভূমিধস। যে-কোনও সময়ে চাপা পড়বে ওরা।

গম্ভীর কণ্ঠে বলল কুয়াশা, ‘রঘুপতি!’

‘ব্যস্ত, বস!’

সামনের সিটে থ্রটল নিয়ে কী যেন করছে লোকটা।

এক সেকেন্ড পর ভাসতে শুরু করল সুখোই ফাইটার।

রানা দেখল, টগবগে পানির মত বলকে উঠছে উপরের অ্যাভালাঞ্চ। ঝড়ের গতিতে নামছে প্লাবনের মত। বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ছে মস্ত সব পাথর। কানে তালা লেগে গেল ভয়ঙ্কর আওয়াজে।

মৌমাছির মত ভেসে উঠছে সুখোই, পাশেই পাহাড়ের ক্লিফের চূড়া। তখনই হাজির হলো মাটি-বালি ও পাথরের ভয়ঙ্কর স্রোত।

ছোট-বড় পাথর লাফিয়ে ধরতে চাইল কালো বিমানকে। চারপাশে বিকট আওয়াজ। খট-খটাং আওয়াজে বিমানের পেটে লাগছে ছোট পাথরগুলো। পরক্ষণে চূড়া পেরোল সুখোই। কয়েক ফুট নীচ দিয়ে গেল ভূমিধস, চলেছে অনেক নীচে।

‘আপনাদের মৃত্যু ছিল খুব কাছে,’ মন্তব্য করল রঘুপতি।

তিন মিনিট পর ইউএন-এর শিবিরে রানার ইয়াক-১৪১ ফাইটার বিমান থেকে এক মাইল দূরে মাউন্ট স্ট্যানলির আরেকটি ঢালে সমতল জায়গা দেখে নেমে এল সুখোই এস-৩৭ ফাইটার বিমান।

ককপিটের মই বেয়ে মাটিতে নামল রানা, কুয়াশা, নিশাত ও খবির। বিমানে রয়ে গেছে থামের মতই দীর্ঘদেহী রঘুপতি, অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পর নেমে এল ইঞ্জিন বন্ধ করে।

‘ওর নাম রঘুপতি, বিশ্বস্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট,’ সবার সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিল কুয়াশা।

জবাবে একটা কথাও বলল না লম্বু।

অন্যদের চেয়ে একটু সরে দাঁড়াল রানা, ডুবে গেছে চিন্তার গভীরে। গতকাল থেকে যা ঘটেছে, সেসব নিয়ে ভাবছে। তখনই খড়মড় করে উঠল ওর ইয়ারপিস।

‘মেজর রানা, আমি কেভিন কনলন, আপনি কোথায়?’

‘কঙ্গো,’ জবাবে বলল রানা।

‘শুনুন, যে লিস্ট দিয়েছিলেন, সে তালিকায় একজনের নাম নেই। কুয়াশার কথা বলেছিলেন, তার নাম আছে এফবিআই ও আইএসএস-র ওয়ান্টেড লিস্ট।’

‘বলতে থাকো,’ বলল রানা। এ তথ্য ওর জানা আছে।

‘ওই লোক ভয়ঙ্কর...’ পেণ্টাগনের আগরথাউণ্ড অফিসে জ্বলজ্বলে কমপিউটারের সামনে বসে আছে কনলন। অফিস পুরো ফাঁকা। মনিটরে কুয়াশার ছবি, দূরপাল্লার ক্যামেরায় তোলা

হয়েছে। ছুটছে বৈজ্ঞানিক, দু'হাতে রেমিংটন শটগান।

লেখাগুলো পড়তে লাগল কনলন, 'এ লোকের আসল নাম মনসুর আলী। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ মত। দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। কিছুদিন হলো চোখের সমস্যার কারণে ব্যবহার করছে সানগ্লাস। ধারণা করা হচ্ছে, আণবিক রিয়াকশনে রেটিনাল ক্ষতি হয়েছে। সহ্য করতে পারে না সাধারণ আলো।'

কুয়াশার দিকে চোখ চলে গেল রানার। পরনে কালো আলখেল্লা। কোমরের দু'পাশে দুই খাপে নল কাটা দুই বন্দুক। সুখোই বিমানের পাশে দাঁড়িয়ে খবিরের কথা শুনছে।

'সে ইউনাইটেড স্টেটসের চরম শত্রু। সুদানে শেষ করার চেষ্টা করে আমেরিকান আর্মি। আইএসএস-এর ধারণা: তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল স্থানীয় আলকায়েদার। বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয় তার গবেষণাগার। ধরা পড়ে, কিন্তু বেরিয়ে যায় তেরোজন ডেল্টা ডিটাচমেন্টের সৈনিককে খুন করে।'

'পাঁচ মাস পর দেখা দেয় আর্জেন্টিনায়। আমেরিকান সামরিক বাহিনী পাঠায় নেভির ছয় সিল কমাণ্ডোকে। একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি।

'এরপর উধাও হয় মনসুর আলী। সেই সময়ে রাশান ডেপুটি প্রেসিডেন্টের মেয়েকে অপহরণ করে একদল কিডন্যাপার। তখন হঠাৎ করেই উদয় হয় কুয়াশা, নয়জনকে মেরে কেড়ে নেয় ওই মেয়েকে, পৌঁছে দেয় বাবার হাতে। আইএসএস-র ধারণা: চাইলে পৃথিবীর দ্বিতীয় সেরা বাউন্টি হান্টার হতে পারত সে।'

কালো বিমানের দিকে চাইল রানা।

ডানার দিকে রওনা হয়েছে রঘুপতি।

'চাইলে দ্বিতীয় সেরা বাউন্টি হান্টার হতে পারত? এখন সেরা কে?' জানতে চাইল রানা।

'আগেও বলেছি তার কথা। নামটা: ডেভিড এন. হেব্রিক।

এক সেকেণ্ড, মনসুর আলীর কথা শেষ করতে পারিনি। প্রিয় মেয়েকে পাওয়ার পর তাকে সরকারের তরফ থেকে একটা ইয়াক-১৪১ যুদ্ধবিমান দেন ডেপুটি প্রেসিডেন্ট। দুনিয়ার যে-কোনও রাশান বেস থেকে হাই-অকটেন রিফিউয়েল করতে দেয়া হয়। লোকে ওই বিমানের নাম দিয়েছে “কালো দাঁড়কাক”।’

‘আচ্ছা,’ বলল রানা। ‘এখন দেখছি সুখোই এস-৩৭ ফাইটার প্লেন।’ ওর দিকে পা বাড়িয়েছে কুয়াশা।

‘ভয়ঙ্কর লোক ওই মনসুর আলী,’ আবারও বলল কনলন, ‘আপনার বোধহয় খুব সতর্ক হওয়া উচিত।’

‘এখন আর সে উপায় নেই,’ বলল রানা। ‘আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরে কথা হবে।’

খুট আওয়াজ তুলে কেটে গেল যোগাযোগ।

‘দাঁড়কাক তোমাকে দিয়েছি, নিজে জুটিয়ে নিয়েছি কালো শকুন,’ গম্ভীর মুখে বলল কুয়াশা, নিজের তৈরি অত্যাধুনিক ইয়ারপিসে সবই শুনেছে। ‘এখন থেকে ওই সুখোই ব্যবহার করব।’ হাতের ইশারা করল। ‘এসো, আলাপ সেরে নেয়া যাক।’

বৈজ্ঞানিকের পাশে বিমানের দিকে পা বাড়িয়ে বিস্মিত হলো রানা।

সুখোই ফাইটারের ফিউয়েল ট্যাঙ্কের ক্যাপ খুলেছে রঘুপতি। বুকপকেট থেকে বের করেছে ইম্পাতের নল, ওটা ভরে দিল ট্যাঙ্কে, অন্যপ্রান্ত মুখে পুরে চোঁ-চোঁ করে গিলতে লাগল হাই-অকটেন!

চট করে বাঙালি বৈজ্ঞানিকের দিকে চাইল রানা।

হতবাক হয়ে লম্বুর কীর্তি দেখছে নিশাত ও খবির।

‘ও রোবট,’ স্বাভাবিক সুরে বলল কুয়াশা, ‘আমার তৈরি।’ সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাল্টে ফেলল প্রসঙ্গ, ‘খবিরের কাছে গুনলাম সাইবেরিয়ায় পৌছবার পর কী ঘটেছে।’

‘তখন থেকেই এই লড়াই শুরু,’ মন্তব্য করল নিশাত ।
‘দু’দিনের লড়াইয়ে ওদের এক শ’জন শেষ,’ জানাল খবির ।
‘আপা, আপনি কি আঁচ করতে পারেন তিশা কোথায়?’
নিশাতের কাছে জানতে চাইল রানা ।

‘শেষবার দেখেছি সবুজ লেসার সাইট পরা একদল লোককে ।
তখন ছিটকে পড়লাম কনভেয়ার বেঁটে, তারপর...’

‘তখন ওই মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে,’ জানাল কুয়াশা ।
‘কাজটা ডেভিড এন. হেঞ্জিক ও তার লোকজনের ।’

‘আপনি জানলেন কী করে?’ জিজ্ঞেস করল খবির ।

রঘুপতির দিকে ইশারা করল বৈজ্ঞানিক । ‘খুলে বলো ।’

মুখ থেকে পাইপ সরাল লম্বু, ফিউয়েল ট্যাঙ্কের ক্যাপ আটকে
দিয়ে পকেটে রেখে দিল নল, খুব নরম সুরে বলল: ‘বসকে ভেঙে
নামিয়ে দেয়ার পর চলে এলাম পিছনের ওই সুড়ঙ্গ-মুখে । বসের
নির্দেশে ছড়িয়ে দিলাম মাইক্রোডট অ্যারোসল । কাজ শেষে
গেলাম একমাইল দূরে, যেমন বলেছেন বস ।

‘পাঁচ মিনিট পর এলেন আপনারা, কিন্তু এর একমিনিট আগে
ওই সুড়ঙ্গের সামনে নামল প্রকাণ্ড এক চিনুক কপ্টার— দু’পাশে
দুই লিংক্স অ্যাটাক চপার । তখনই এল দুটো এলএসভি এবং
একটা ড্রিফটরানার । সোজা উঠে গেল চিনুকের ভিতর । তারপর
ভেসে উঠল হেলিকপ্টার, পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে গেল পুরে ।’

‘কীভাবে জানলে ওদের সঙ্গে তিশা আছে?’ জানতে চাইল
রানা ।

বুকের উপর হাত রাখল রঘুপতি । ‘আমার কাছে ছবি আছে ।
বস বলেছিলেন, তিনি খনিতে থাকতে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে
যেন ছবি তুলে রাখি ।’

লম্বুকে নতুন চোখে দেখছে রানা ।

এই ধেড়ে মাল-অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চালাতে পারে হোভার-

কেপেবল রাশান ফাইটারে— অর্থাৎ এর আছে ফিযিক্স ও অ্যারোডাইন্যামিক্সের উপর গভীর জ্ঞান। কথা বলে ভৃত্যের মত নরম সুরে। দক্ষ সৈনিকের মত নির্দেশ মেনে নেয়ার জন্য জন্ম। আরও কী গুণ একে দিয়েছে কুয়াশা, কে জানে!

‘ছবি দেখাও ওকে,’ বলল কুয়াশা।

বোতাম সরিয়ে শার্টের নীচে কী যেন টিপল রঘুপতি।

এক সেকেণ্ড পর বেরোল ডিজিটাল স্ক্রিন।

ওটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

স্ক্রিনে খনির ওদিকের সুড়ঙ্গের বাইরের দৃশ্য।

র‍্যাম্প পেতে বসে আছে চিনুক হেলিকপ্টার।

স্ক্রিন সেকেণ্ড পর পাল্টে গেল দৃশ্য।

দেখা গেল খনির পিছনের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েছে দ্রুতগামী কয়েকটা গাড়ি। সামনে চলেছে এক লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল।

রানার পাশ থেকে বলল কুয়াশা, ‘প্যাসেঞ্জার সিটে তিনটে সাদা বাক্স দেখছ? মেডিকেল ড্র‍্যাগপোর্ট কেস। ওখানে রয়েছে তিনটে কাটা মাথা।’

স্ক্রিনে এবার দেখা দিল ঝাপসা ছবি।

দুই এলএসভির পিছনে ছুটছে এক ড্রিফটরানার।

‘পিছনের ট্রে খেয়াল করুন,’ বলল রঘুপতি। ‘প্রায় প্রত্যেকের পরনে কালো পোশাক। কিন্তু একজন... তার মাথায় হেলমেট নেই। পরনে ইউএনএর ইউনিফর্ম।’

তিশাকে দেখতে পেল রানা।

খুবই ঘোলাটে ছবি, কিন্তু চেনা যায় পরিষ্কার।

ড্রিফটরানারের রিয়ার ট্রের উপর পড়ে আছে, অচেতন।

ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল রানার।

দুনিয়ার সেরা বাউন্টি হান্টারের হাতে আটকা পড়েছে তিশা।

যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে ওকে।

‘না, রানা, যা ভাবছ, তা ভুল চিন্তা,’ বলল কয়াশা, যেন মন পড়ছে। ‘হেণ্ড্রিক চায় তুমি ওর হাতের মুঠোয় চলে যাও। কোনও তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না। আমি জানি কোথায় থাকবে তিশা। ভুলেও ওকে খুন করবে না হেণ্ড্রিক। ওই মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওর, নইলে তোমাকে হাতের মুঠোয় পাবে না।’

‘আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কী ভাবে?’ জানতে চাইল রানা।

‘কারণ, আমি নিজে হলেও ওই একই কাজ করতাম,’ বলল কয়াশা।

পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে দু’জন। কয়েক মুহূর্ত পর রানা বলল, ‘আপনি এই বাউন্টি হান্ট সম্পর্কে কতটা জানেন?’

কাঁধ ঝাঁকাল বৈজ্ঞানিক। ‘তুমি নিশ্চয়ই জানো বহু ক্লারনে বাউন্টি হান্ট করা হয়, রানা? অন্য দেশের কাছে গুপ্ত তথ্য বিক্রি করতে চাইছে, এমন বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরকে শেষ করতে এমন করা হয়। কোনও কিডন্যাপারকে ধরে আনবার জন্যেও দেয়া হয় টাকা। কিন্তু এসব কারণে তোমাকে খুন করতে চাইছে না এরা। ...এখনও জানি না কারা টাকা দিচ্ছে। কিন্তু এটা জানি, টাকা দেয়া হবে এক সুইস ব্যাঙ্কারের হাত দিয়ে। তার নাম পি. এস. ড্যাবলার। এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা আছে তার। আর টাকা যখন দেবেই, কার কাছ থেকে টাকা আসছে তা নিয়ে ভাবতে যায় না বাউন্টি হান্টাররা। গত দু-এক দিন থেকে শুরু হয়েছে মাথা কেটে নেয়ার প্রতিযোগিতা। প্রতিজনের জন্যে তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার। মোটমাট পনেরোটা মাথা। সবমিলে চার শ’ পঁচানব্বুই মিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর যে-কোনও বড় আর্থিক পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি দেয়া হচ্ছে।’

‘মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার,’ খুশি-খুশি সুরে বলল রঘুপতি।

সন্দেহ নিয়ে তাকে দেখল নিশাত ও খবির।

‘আপনাদের ভয় নেই, ভয় সব মেজর রানার,’ হাসির সুরে

বলল রঘুপতি ।

‘রোবটের কৌতুক ভাল লাগছে না,’ খেঁকিয়ে উঠল নিশাত ।

‘আমারও ভাল লাগে, তা নয়,’ বলল কুয়াশা । ‘কিন্তু মানবিক গুণ দিতে গিয়ে এমন হয়েছে ।’ রানার দিকে চাইল । ‘আগামীকাল নিউ ইয়র্ক সময় দুপুর বারোটোর আগেই শেষ হবে শিকার পর্ব ।’

একবার হাতঘড়ি দেখল রানা ।

কঙ্গোর সময় অনুযায়ী বাজে প্রায় সকাল আটটা ।

চিন্তা থেকে জেগে উঠল রানা, কুয়াশাকে বলল, ‘এবার কী করতে চান?’

‘আপাতত তোমার পাশে থাকব, মানুষ-শিকারের সময়টা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত,’ বলল বৈজ্ঞানিক । ‘আমি তোমাকে বন্দি করিনি, তুমি মুক্ত থাকবে, যেখানে খুশি যেতে পারো । পাশে পাবে আমাকে ।’

‘কেন আমার জন্যে এতকিছু করছেন?’ সরাসরি জানতে চাইল রানা ।

মৃদু হাসল বাঙালি বৈজ্ঞানিক । ‘বলতে পারো নিজ অন্তরের তাগিদে । গতবার যখন আমাদের দেখা হলো, তারও আগে অনেক কিছুই জেনেছি তোমার বিষয়ে । বুঝতে সময় লাগেনি, আমাদের ওই ছোট্ট, সুন্দর, সবুজ, মায়াময় দেশটাকে সত্যিই প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসো তুমি । আর এটা জানা আমার জন্যে যথেষ্ট । রাশার এক সরকারী গবেষণাগারে কাজ করছিলাম গুপ্ত পরিচয়ে, তখনই জানলাম মেরে ফেলা হবে তোমাকে । এর পর দেরি করিনি ।’

চুপ করে থাকল রানা ।

হৃদয়ের গভীরে অনুভব করল, এই ভিন দেশেও মস্ত এক উপকারী সত্যিই ওকে সাহায্য করবে ।

‘তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে,’ বলল কুয়াশা । ‘সেটা

খুব সম্ভব তুমি জান। তোমারই কারণে আমার বিরুদ্ধে অতীতের সব অভিযোগ তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। তোমার বস্ সে-
দিকটা ম্যানেজ করেছেন। তিনি আমারও শ্রদ্ধেয় একজন নিষ্কলঙ্ক
মানুষ। এখন আমি বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক, যখন খুশি নিজের
দেশে ফিরতে পারি।’

‘আপনি জানলেন কী করে তিশাকে কোথায় নেবে?’ জানতে
চাইল ও।

‘মাইক্রোডট অ্যারোসলের কারণে,’ বলল কুয়াশা। ‘হেণ্ডিকের
লোক আসার আগেই ওই জিনিস ছড়িয়ে দিয়েছে রঘুপতি।’

আস্তু করে মাথা দোলাল রানা।

শুনেছে মাইক্রোডট টেকনোলজির কথা।

ওটা হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের সেরা ন্যানোটেকনোলজি।
মাইক্রোডট আসলে মাইক্রোস্কোপিক সিলিকন চিপস, একেকটা
বড়জোর পিনের ডগার সমান বা তার চেয়েও ছোট। কিন্তু
প্রতিটির রয়েছে অকল্পনীয় কমপিউটিং ক্ষমতা। অনেকে ধারণা
করছে, ভবিষ্যতে মাইক্রোডট ব্যবহার করে তৈরি করা হবে
লিকুইড বেযড সুপারকমপিউটার— সে তরলের কণাগুলোর
থাকবে বিপুল চিন্তাশক্তি।

আপাতত মাইক্রোডট ব্যবহার হচ্ছে দামি সব গাড়ি খুঁজে
বের করবার জন্য।

ধরে নেয়া যাক, কোনও ফেরারি গাড়িতে স্প্র করা হলো
মাইক্রোডট পেইন্ট, তারপর ওই গাড়ি যেখানেই থাকুক না কেন,
দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায়, তা খুঁজে নিতে লাগবে বড়জোর
কয়েক সেকেন্ড। বারোটা বাজবে গাড়িচোরের।

রঘুপতি সুড়ঙ্গের মুখে মাইক্রোডটের মেঘ ছড়িয়ে দেয়ায়, ওই
এলাকায় ছিল কয়েক বিলিয়ন খুদে কমপিউটার।

‘হেণ্ডিক, তার লোক, ভেহিকেল বা তিশার দেহে আটকে

গেছে আমার তৈরি মাইক্রোডট,' বলল কুয়াশা। বেল্ট থেকে নিল ছোট্ট পাম কমপিউটার। ওটা বড়জোর পিডিএ-র সমান। মনে হলো ওয়াটারপ্রুফ।

স্ক্রিনে দুনিয়ার মানচিত্র।

সুদানের দিকে রওনা হয়েছে ঝিলমিলে অসংখ্য কণা।

ডেভিড এন. হেপ্তিক ও তার দল।

'ওই মাইক্রোডট দুনিয়ার যে-কোনও জায়গা থেকে এই স্ক্রিনে দেখতে পাবে,' বলল কুয়াশা।

এখন ওর পরিকল্পনা স্থির করতে হবে, কীভাবে কী করবে ভাবতে শুরু করেছে রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমাদের প্রথমে জানতে হবে কেন এসব ঘটছে।'

শতবারের মত বুক পকেট থেকে বাউন্টি লিস্ট বের করল ও। ওর কাঁধের পিছন থেকে লিস্ট পড়ল নিশাত ও খবির।

'কার্জটা বোধহয় মোসাদের,' নিচু স্বরে মন্তব্য করল নিশাত। এইমাত্র একটা এন্ট্রির উপর চোখ পড়েছে।

ওখানে লেখা: ম্যাকিন, ডেনিস ই.। ইজরায়েল, মোসাদ।

'কী কারণে এমন ভাবছেন, আপা?' জানতে চাইল রানা।

'খনির ভেতর ইজরায়েলের মোসাদ সম্পর্কে কী যেন বলছিল টেরোরিস্ট আলাল হোসেন। তারপর এক লোক ঘ্যাঁচ করে কেটে নিল ওর মাথা। বন্ধ উন্মাদ ছিল লোকটা, বলছিল: সোভিয়েত গবেষণাগারে তার কিছুই হয়নি, ইউএস ক্রুজ মিসাইল পড়লেও সে পাত্তা দেয়নি, মোসাদও তাকে কখনও ছুঁতে পারবে না। আগেও চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে তারা।'

'মোসাদ...' বিড়বিড় করল রানা। স্যাটালাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে চাইল কেভিন কনলনের সঙ্গে। 'কেভিন, তুমি এখনও লাইনে আছ?'

জবাব এল, 'যতক্ষণ কফি আছে, আমিও অফিসে আছি।'

‘কেভিন, আলাল হোসেন আর ডেনিস ই. ম্যাকিনের মধ্যে ক্রস-ম্যাচ করতে পারবে?’

‘এক সেকেন্ড,’ বলল প্রতিভাবান কোড উইয়ার্ড। ‘হ্যাঁ, তথ্য আসতে শুরু করেছে। ইউএস-ইজায়েলি ইন্টেলিজেন্স একই সঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছিল। মেজর ডেনিস ই. ম্যাকিন ছিল আলাল হোসেনের কাটসা, বা কেস অফিসার। কাজ ছিল ওই টেরোরিস্টের ওপর চোখ রাখা। হাইফাতে পোস্টিং হয়। কিন্তু গতকাল তাকে পাঠানো হয়েছে লগুনে মোসাদ হেডকোয়ার্টারে।’

‘লগুন?’ বিড়বিড় করল রানা। মনের ভিতর তৈরি হচ্ছে নাতিদীর্ঘ পরিকল্পনা।

গতকাল লড়াইয়ের শুরু থেকেই এক পা এক পা করে পিছাতে হচ্ছে ওকে। এবার সামনে বাড়তে চাইছে ও।

‘আপা, লগুনে মেজর ম্যাকিনের সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি আছে আপনার? সে হয়তো এই পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করতে পারবে।’

‘আপনার জন্যে খুশি মনে যাব,’ বলল নিশাত।

‘আমিও তা হলে আপনার সঙ্গেই যাই,’ বলল খবির।

‘ভাল হয়,’ বলল রানা।

মন দিয়ে ওদের কথা শুনল কুয়াশা, কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না।

‘আরেকটা কথা, মেজর রানা,’ ভেসে এল কনলনের কণ্ঠ। ‘আগে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যস্ততার কারণে বলা হয়নি। কথাগুলো ইউএস আর্মি মেডিকেল রিসার্চ অ্যাণ্ড মেটারিয়াল কমান্ডের তথ্য। ওই ন্যাটো এমএনআরআর স্টাডি? ওসব তথ্য রয়ে গেছে আমার নাগালের বাইরে। দু’মাস আগে জরুরি হয়ে ওঠে ওসব। এবং ওই সময়ের পর ইউএসএএমআরএমসি কমপিউটার থেকে সব মুছে ফেলা হয় বা ধ্বংস করা হয় সমস্ত

কাগজ। শুধু জেনেছি, অ্যারিয়োনার এক ওয়্যারহাউসে রয়ে গেছে একটামাত্র কপি।

‘কিন্তু যাঁরা মেডিকেল রিসার্চ কমাণ্ডের তথ্য জড় করেছিলেন, তাঁদের দু’জনের ঠিকানা জোগাড় করেছি। এঁদের নাম বেইন্স ও ওয়াকার। একবছর আগে অবসর নিয়েছেন বেইন্স। এখন থাকেন ফ্লোরিডার এক রিটায়ারমেন্ট ভিলেজে। কিন্তু মাত্র দু’মাস আগে ইউএসএএমআরএমসি থেকে অবসর নিয়েছেন ওয়াকার। এখন ভার্জিনিয়ার জঙ্গ হসপিটালের ইআর বিভাগের চিফ ফিজিশিয়ান। জায়গাটা পেটাগন থেকে বেশি দূরে নয়।’

‘তাই?’ বলল রানা, ‘কেভিন, একদিনের জন্যে ফিল্ড অফিসার হবে?’

‘আমার আপত্তি নেই, অফিস থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। আমার বর্তমান বস্ দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য গাধার পোঁদ!’

‘তা হলে সুযোগ বের করে বেরিয়ে পড়ো, যাও সেন্ট জঙ্গ হসপিটালে। আলাপ করে দেখো মিস্টার ওয়াকারের সঙ্গে।’

‘প্রথম সুযোগে তা-ই করব আমি, রাখলাম,’ লাইন কেটে গেল।

‘আর আপনি কী করবেন, স্যর?’ রানার কাছে জানতে চাইল নিশাত। ‘মিস্টার কুয়াশার সঙ্গে...’ চট করে রহস্যময় বৈজ্ঞানিককে দেখে নিল ও। বিশ্বাস করছে না এক ফোঁটাও।

মৃদু কুঁচকে গেল কুয়াশার ভুরু। কোনও মন্তব্য করল না।

‘স্যর, আমাদের সঙ্গেই চলুন,’ বলল খবির।

‘এই বাউন্টি হাণ্টের গোড়ার কাছে পৌঁছুতে চাই,’ বলল রানা। ‘প্রথমে যাব ফ্রান্সের ওই দুর্গে।’

‘স্যর, আপনি নিশ্চয়ই সদর-দরজায় গিয়ে টোকা দেবেন না?’ জানতে চাইল নিশাত।

‘না, তা করব না,’ বলল রানা। ‘আগে জোগাড় করব কাটা

মুণ্ড। তারপর ওটা নিয়ে যাব পুরস্কার আদায় করতে।’

‘তার মানে, স্যর...’ বিস্ফারিত হলো নিশাতের চোখ। ‘কারও ধড় থেকে কেটে নেবেন মাথা?’

‘না, অন্য কাজ করব,’ অন্যমনস্ক হয়ে কুয়াশার পাম কমপিউটারের দিকে চাইল রানা। স্ক্রিনে দেখল, কোথায় চলেছে দুনিয়াসেরা বাউন্টি হান্টার ডেভিড এন. হেঞ্জিক ওরফে ডেভিল। ‘এখন জানি কোথায় পাব তাজা মাথা। সেসব জোগাড় করব, তারপর ফিরিয়ে আনব তিশাকে।’

তেরো

পাইন রিটার্নারমেন্ট ভিলেজ।

মায়ামি, ফ্লোরিডা।

অক্টোবর ১৩।

সন্ধ্যা মাত্র সাতটা।

সামনের ডেস্কের নার্সের বুঝবার উপায় ছিল না ওই লোক ভয়ঙ্কর খুনি।

নরম সুরে জানতে চাইল নার্স, ‘কোনও সাহায্যে আসতে পারি?’

জবাবে লোকটা মাথা নেড়ে বলল, সে এসেছে পাইন রিটার্নারমেন্ট ভিলেজের অসুস্থ এক রোগীর ব্যক্তিগত জিনিসগুলো হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার জন্য।

খুনি লম্বা ও চিকন, গায়ের রং কুচকুচে কালো, ফুলে ওঠা

কপাল । সবমিলে মনে হয়, আফ্রিকান লোক । সাক্ষীরা জানবে না, কিন্তু দুনিয়া জুড়ে বাউন্টি হাণ্টিং সমাজে তার নাম: দি আফ্রিকান ।

ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আততায়ী সে ।

পরনে সাদা ল্যাবকোট । দালানে ঢুকে খুব শান্ত পায়ে হাঁটছে । পাশ কাটিয়ে গেল নার্সকে, হাতে অর্গান-ডেলিভারি সাদা বক্স ।

কয়েক সেকেন্ডে খুঁজে নিল নির্দিষ্ট ঘর, ভিতরে ঢুকে দেখল এক বয়স্ক লোক ঘুমিয়ে আছে বিছানায় । নাম তার ফ্রেড বেইন্স ।

পাইন রিটায়ারমেন্ট ভিলেজের কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে প্রত্যেকে পছন্দ করে তাকে, খুব হাসিখুশি মানুষ । সবাই জানে, পেশায় বেইন্স ডাক্তার ছিল, একবার গলফ কোর্সে বয়স্ক এক রেসিডেন্টের হার্ট অ্যাটাক হলে তার প্রাণও বাঁচিয়েছিল ।

কিন্তু অবাক ব্যাপার, আর সবার মত কখনও নিজের জীবনের সাফল্যের কথা বলে না সে ।

জিঙ্কস করলে বড়জোর জানায়, ফোর্ট ডেট্রিকের ইউএস আর্মি মেডিকেল রিসার্চ অ্যাণ্ড মেটেরিয়াল কমান্ডের সায়েন্টিস্ট ছিল । আর্মড ফোর্সের জন্য সামান্য কিছু মেডিকেল টেস্ট করত । তারপর তো অবসরই পেল ।

ঘুমন্ত বেইন্সের পাশে থামল দি আফ্রিকান, কোটের তলা থেকে বের করল ধারালো ম্যাচোটি...

দু'ঘণ্টা পর এয়ারপোর্টের লং-টার্ম কারপার্ক তর পরিত্যক্ত গাড়ি পেল পুলিশ ।

ততক্ষণে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের যিরো সিক্স-থ্রি ফ্লাইটে প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে কুচকুচে কালো খুনি । পাশের সিটে সাদা অর্গান-ডেলিভারি বক্স ।

জার্মানি । বার্লিন ।

অক্টোবর, ১৩ ।

ইউনাইটেড স্টেটস্ অভ আমেরিকার নাগরিক হ্যারিস এক্স. টেরেন্স। তারচেয়েও বড় কথা, সে চাকরি করে আইএসএস-এ। একসময়ে ছিল খুবই দক্ষ এজেন্ট। আজকাল অফিস ছুটির পর হয়ে ওঠে সান্ধ্য বুড়ো ইবলিশ।

কচি মেয়ের শরীর চাই প্রতিদিন। গণ্ডারের মত পিছন থেকে ভোগ করবে। ফুর্তি চরমে উঠলে বিকট হাঁক ছাড়বে উন্মত্ত কাউবয়ের মত, খামচে ধরবে নধর নিতম্ব।

বার্লিনের রেড লাইট ডিস্ট্রিক্টের এক পতিতার কাছ থেকে এ তথ্য পেয়েছে আজকের মেয়েটি।

আগের সেই দিন আর নেই হ্যারিস এক্স. টেরেন্সের। কোল্ড ওয়ারের সময়ে সে ছিল ইস্টার্ন ব্লকের বিষয়ে এক নম্বর এক্সপার্ট, সবাই গুরুত্ব দিত তার প্রতিটি কথায়। এখন বার্লিনের আইএসএস অফিসে ডেস্ক জবে বসিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। হ্যারিসের বয়সও হয়েছে, ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে মগজের ধার। আশির দশকের শেষভাগে যে দুর্দান্ত সব কাজ করেছে, আজকাল সেইসব স্মৃতির জাবর কাটে।

কেন, সোভিয়েত রাশা থেকে কিয়েভ ফাইল নিয়ে নরমানোভ পালিয়ে আসতে চাওয়ায় তাকে পশ্চিম ব্লকে সরিয়ে আনেনি সে?

এসব ভুলে যায় নতুন সব এজেন্ট।

আসলে মেনে নিয়েছে হ্যারিস, নতুন অচেনা এই বিশ্বে পুরনো, বুড়ো এক ঘেয়ো কুকুর হয়ে উঠেছে সে।

আজ রাতে সহজেই এই মেয়েটির উপর চোখ পড়েছিল।

অবাক হওয়ার কিছুই নেই। দেখবার মতই দীর্ঘ, পেলব, সুডৌল উরু। দামি যে-কোনও মডেলের মত সুঠাম দু'কাঁধ। আর ওই পূর্ণ আপেলের মত ধবল দুই স্তন যেন এসেছে খোদ স্বর্গ থেকেই। ইউরোশিয়ান দুই চোখে নরম চাহনি।

হ্যারিস শুনেছে কেউ কেউ ওই মেয়েকে ডাকে: বরফ-শুভ্র

রানি।

হ্যারিসের বিছানার উল্টোদিকে বারকাউন্টারে পার্স রেখে
শাওয়ার নিতে গিয়েছিল মেয়েটি, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে
জন্মদিনের আদিম পোশাকে। দু'হাত রেখেছে পিছনে, ফলে
আরও উদ্যত হয়ে উঠেছে ধবধবে স্তন।

খুশিতে সাত পাটি দাঁত বেরোলো হ্যারিসের, ঝাঁপিয়ে পড়ল
বিছানায়, ঝটকা দিয়ে চিত হলো— কিন্তু তখনই দেখল মেয়েটার
হাতে খাটো একটা সামুরাই তলোয়ার।

সাঁই করে ওটা নেমে এল হ্যারিসের গলার উপর!

বেইরুত, লেবানন।

অক্টোবর ১৩।

রাত নয়টা।

পরে সাক্ষীরা বলবে, খুনটা করেছে খুবই পেশাদার একদল
আততায়ী। তাদের নিজেদের কারও কিছুই করবার ছিল না।

ধারণা করা হয়, সিনিয়র হামাস কমান্ডার আজিজ আমিনকে
ট্রেনিং দিয়েছিল সোভিয়েত সেনাবাহিনী।

খুবই সতর্ক লোক, চারপাশ ভালভাবে দেখে অ্যাপার্টমেন্ট
বিল্ডিংয়ে ঢুকেছে।

আর তখনই ক্রিচ-ক্রিচ আওয়াজ তুলে লবির বাইরে থামল
দুটো সেডান, নেমে এল আটজন কমান্ডো, ছিটকে ঢুকল বাড়ির
ভিতর। তাদের একজনের হাতে সাদা একটা বাক্স। একপাশে
লাল রেড ক্রস চিহ্ন আঁকা।

সাক্ষীরা অবশ্যই বলবে: আততায়ীদের প্রত্যেকের হাতে ছিল
ভিয়েড-৬১ স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল।

মাত্র দু'মিনিট ব্যয় করেছে লোকগুলো। তারপর আবারও
চাকার কর্কশ আওয়াজ তুলে বিদায় হয়েছে।

পাঁচ মিনিট পর নির্জন লবির একপাশে পাওয়া গেছে আজিজ আমিনকে । কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মাথাটা ।

চোদ্দ

ব্রিটানি, রিপাবলিক অভ ফ্রান্স ।

অক্টোবর ১৪, স্থানীয় সময় এগারোটা পঞ্চাশ মিনিট ।

ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়ন ।

নির্দিষ্ট মানুষটি সেই ছোটবেলা থেকেই সবসময় বিশৃঙ্খলা পছন্দ করত ।

ভাবতেই তার ভাল লাগত উদ্দাম-উচ্ছল জীবন ।

বৈধ-অবৈধ সরকার, ন্যায্য আইন বা সমাজ?

উহঁ!

মানব-সমাজে ন্যায়-নীতি-আইন-শৃঙ্খলা এসব থাকবে কেন!

ভাল লাগে তার নতুন করে বুঝতে, কীভাবে সুযোগ পেলেই ভয়ঙ্কর স্বার্থপর হয়ে ওঠে মানুষ!

হয়তো ধসে পড়ল গোটা ফুটবল স্টেডিয়াম, আর একে অপরকে মাড়িয়ে খুন করছে!

বা ঘটে গেল ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প । এটাই স্বাভাবিক যে সাধারণ মানুষ লুট করবে অন্যের সর্বস্ব ।

আর যুদ্ধ বাধলে?

নানজিৎ, মাই লাই, স্ট্যালিনগ্রাদ... সবাই মিলে কী করে?

একে অপরের মা-বোনকে ধর্ষণ করে, খতম করে জানের

শত্রুকে ।

এমনই তো হবে মানুষ!

জীবন তো এমনই!

আহ, ভাবতেই ভাল লাগে!

কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে টেলিকনফারেন্স শুরু হতে আরও দশ মিনিট ।

তার মানেই বারো নম্বর সদস্যের হাতে সামান্য সময় আছে ।

সময়টা নষ্ট করা ঠিক নয়, ভাবছে সে ।

বারো নম্বর সদস্যের নাম ডেমিয়েন ডগলাস ।

বয়স মাত্র সাতাশ । কাউন্সিলের কনিষ্ঠ সদস্য ।

জন্ম নিয়েছিল বিপুল ধনদৌলতের মাঝে ।

বাবা আমেরিকান, মস্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ।

মা ফ্রেঞ্চ নামকরা জমিদার পরিবারের মেয়ে ।

ছোটবেলা থেকে যা চেয়েছে, সবই জুগিয়ে দেয়া হয়েছে ডেমিয়েনকে । কোনও চাহিদা পূরণ হয়নি, এমন হওয়ারও উপায় ছিল না । বাবা-মার একমাত্র সন্তান সে, চোখের মণি ।

তার চাহনি সাপের মত শীতল, দ্বিতীয়বার চিন্তা করে কথা বলে সবাই । শাপে বর হয়েছে ওই সর্পদৃষ্টি । মস্ত সাহসীর বুক কাঁপিয়ে দিতে পারে মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে ।

আরেকটা বড় অস্বাভাবিকতা: ডেমিয়েন ডগলাসের এক চোখের মণি গাঢ় নীল, অন্যটা পচা ডিমের কুসুমের মত হলদেটে ।

অসংখ্য মস্ত সব কোম্পানির বিপুল মুনাফার কারণে তার বর্তমান সম্পদ এখন ঊনষাট বিলিয়ন ডলার ।

তার মা'র দিক থেকে পাওয়া সম্পত্তি ফো'ট্রেস দো শ্যাটিয়ন ।

কাউন্সিলের নয় নম্বর সদস্যকে মোটেও পছন্দ করে না

ডেমিয়েন ।

সে-লোকের অন্যান্য সম্পদ তো আছেই, এ ছাড়া পেয়েছে
জন্মসূত্রে টেক্সাসের বেশ কয়েকটি তেলখনি ।

নয় নম্বর সদস্যের বুদ্ধি স্বল্প বলে ধারণা করে ডেমিয়েন ।

আটান্ন বছর চলছে লোকটার, কিন্তু আজও যে-কোনও কিছু
নিয়ে এঁড়ে তর্ক করে ।

এ কারণে তাকে গণ্ডারও বলা যেতে পারে ।

যখন থেকে কাউসিলের মিটিঙে বসছে ডেমিয়েন, তখন
থেকেই তার প্রতিটা কথায় আপত্তি তুলছে এই লোক ।

আর এখন, এ মুহূর্তে নয় নম্বর দাঁড়িয়ে আছে ফো'ট্রেস দো
শ্যাটিয়নের চওড়া ডানজনের নীচতলায় । সঙ্গে দুই এইড ও দুই
বডিগার্ড । চারপাশে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে পুরু পাথরের বৃত্তাকার
দেয়াল । ভয়ে সাদা হয়ে গেছে দুই এইডের চেহারা । তাদের
একজন মহিলা । দুই ব্যক্তিগত বডিগার্ডের দিকে চাইছে না নয়
নম্বর । অস্বস্তি বোধ করছে । চোখ ডানজনের নির্দিষ্ট জায়গায় ।

ওই অংশকে বলা হয় শার্ক পিট ।

মস্ত কুয়া পাথুরে দেয়ালে ঘেরা । ষোলো ফুট গভীর ।
বৃত্তাকৃতি । বৃত্তের ব্যাস দেড় শ' ফুটের কম নয় ।

কুয়ার মেঝেতে রয়েছে পাথরের ছোট-বড় মঞ্চ ।

একটা বিষয় একেবারে পরিষ্কার: কাউকে এ পিটে নামিয়ে
দিলে কারও সাহায্য ছাড়া নিজ চেষ্টায় উঠে আসতে পারবে না ।

কুয়ার ঠিক মাঝখানে খাড়া নেমে গেছে দশফুট চওড়া একটা
গর্ত, সেটা সাগরে গিয়ে মিশেছে ।

কিছুক্ষণ হলো সাগরে আসতে শুরু করেছে জোয়ার ।

শার্ক পিট বেয়ে কুলকুল আওয়াজে দ্রুত উঠছে পানি, বিশাল
গর্তে ধীরে ধীরে বাড়ছে লোনা জল ।

মেঝের পাথুরে মঞ্চগুলো হয়ে উঠছে যেন ছোট ছোট দ্বীপ ।

একটু পর তলিয়ে যাবে সব।

নয় নম্বর সদস্য এবং বডিগার্ডদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ
দেখছে ডেমিয়েন ডগলাস, হাসছে মনে মনে।

এইমাত্র শার্ক পিটে হাজির হয়েছে কালোদুটো ছায়া।

অলস ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে দ্বীপগুলোর মাঝ দিয়ে।

পানি-সমতলে ভেসে ওঠেনি, কিন্তু পরিষ্কার দেখা গেল ডর্সাল
ফিন ও বুলেটাকৃতি মাথা।

মস্ত দুই টাইগার শার্ক ওগুলো। জোয়ার এলেই খাবারের
খোঁজে আসে।

কয়েক সেকেন্ড পর পানির নীচে দেখা দিল আরও দুই ছায়া।

দুর্গের ডানজনের দক্ষিণ দিকে ব্যালকনি।

ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে ডানজনে গ্যাডিয়েটারদের
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করত ফ্রেঞ্চ অভিজাত কর্তারা। সাধারণ
মানুষের বিরুদ্ধে লড়ত সাধারণ মানুষ। অবশ্য, ফোর্ট্রেস দো
শ্যাটিয়নে সবসময়ই সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া
হয়েছে ক্ষুধার্ত সিংহ, বাঘ বা নেকড়েকে।

এই ডানজনের উঁচু ব্যালকনি থেকে পরিষ্কার দেখা যায় শার্ক
পিট।

ব্যালকনির নীচে সবচেয়ে বড় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে
ভয়ঙ্কর এক ডিভাইস: বারো ফুট উঁচু গিলোটিন।

মজা পাওয়ার জন্য ওটা ডানজনে যোগ করেছে ডেমিয়েন
ডগলাস।

গিলোটিনের পায়ে কাছে কাঠের তাকিয়া। মাঝে মাঝে
রাখবার জন্য খোঁড়লের মত জায়গা। দু'পাশের কাঠের স্লটে
আটকে দেয়া হবে বন্দির দুই হাত। গিলোটিনের পাশে ক্র্যাঙ্ক
হ্যাণ্ডেলের মাধ্যমে উপরে তুলতে হবে ক্ষুরধার ফলা। তারপর বড়
একটু লিভার সরিয়ে নিলেই...

উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালে চায়নিজ শহর ন্যানজিঙে জাপানি সৈনিকরা যা করেছিল, সেটা পড়েই উৎসাহিত হয়েছে ডেমিয়েন।

ওই ভয়ঙ্কর তিন সপ্তাহে জাপানিরা বীভৎস অত্যাচার করেছিল চিনাদের উপর। খুন করেছিল তিন লাখ ষাট হাজার মানুষকে। পরে জানা গেল, জাপানি সৈনিকরা নিজেদের ভিতর চৈনিকদের মাথা কাটবার প্রতিযোগিতা করছিল। আরও খারাপ কিছু করত। যেমন, কারও বাবাকে বলা হতো: তোমার মেয়েকে ধর্ষণ করতে হবে তোমার, নইলে... বা ছেলেকে বলা হতো: মা-র সঙ্গে যৌন মিলন করতে হবে তোমার, নইলে মরতে হবে তোমাকে।

এসব জেনে খুব আমোদ পেয়েছে ডেমিয়েন।

সাধারণ চিনা পুরুষরা অকল্পনীয়, নারকীয় এসব প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে সম্মানের মৃত্যু বরণ করত।

কিন্তু কেউ কেউ তা করেনি।

আর তাতেই দারুণ বিমোহিত হয়েছে ডেমিয়েন।

আশ্চর্য, নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে কতবড় পশু হতে পারে মানুষ?

চমৎকার ব্যাপার না?

এসব নিয়ে ভাবতে গিয়েই শার্ক পিটের ডানজনে গিলোটিন বসিয়েছে ডেমিয়েন।

মানুষকে দু'ধরনের মৃত্যুর ভিতর যে-কোনোটা বেছে নেয়ার সুযোগ করে দেয় সে।

মরতে পারো টাইগার শার্কের ভয়ঙ্কর হামলায়, অথবা চট করে মরতে পারো প্রায়-ব্যথাহীন গিলোটিনে— যেটা খুশি!

ওর প্রচণ্ড আনন্দ হয় যখন ক'জনকে নামিয়ে দিতে পারে শার্ক পিটে, বলতে পারে: 'গিলোটিনে চড়িয়ে শেষ করে দাও তোমাদের বসকে, তাহলেই আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।' অথবা বলতে পারে: 'খুন করো ওই মহিলাকে, বন্ধ করো ওর

চিৎকার, তোমাদের ছেড়ে দেব।’

অবশ্য, শেষ পর্যন্ত কাউকেই ছাড়ে না সে।

অসহায় বন্দি মানুষগুলো প্রথমে বোঝে না, তাদেরকে নিয়ে কী নিষ্ঠুর খেলা খেলছে ডেমিয়েন।

কখনও কখনও দেখা যায়, তারা বাঁচবার জন্য নিজ হাতে খুন করছে প্রিয় কাউকে।

এতে গলা ফাটিয়ে হাসে ডেমিয়েন, তারপর খুনিকে খতম করার সময়ও একই রকম আনন্দে হেসে কুটিপাটি হয়।

নিজেকে তার সবসময় মনে হয় সত্যিকারের ঈশ্বর।

চাইলে যখন-তখন কেড়ে নিতে পারে যে-কারও জীবন।

আবার ফিরিয়েও দিতে পারে।

জীবিত বা মৃত লোকের জিন ব্যবহার করে ঠিক তারই মত অন্য কাউকে সৃষ্টি করতে পারে।

টাকা তার জন্য কোনও সমস্যা নয়।

এ-মুহূর্তে কুয়ার পাথুরে দেয়াল বেয়ে উঠে আসতে চেষ্টা করছে পাঁচজন অসহায় মানুষ, যার যার জান বাঁচাতে ব্যাকুল। কী ঘটতে চলেছে টের পেয়ে গেছে পরিষ্কার।

তাদেরকে ঘিরছে সাগরের জল, উঠছে প্রতি সেকেণ্ডে।

দেয়াল বেয়ে খামচে দু’ফুট উঠল নয় নম্বরের মহিলা এইড, ধরতে পেরেছে ছোট কিছু পাথর— কিন্তু তা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। প্রকাণ্ডদেহী এক গার্ডও পাথরগুলো দেখেছে, মহিলাকে টেনে নামিয়ে দিয়ে নিজে উঠতে লাগল।

দক্ষিণ ব্যালকনি থেকে দেখছে ডেমিয়েন। ভাবছে: এদের একজনের দাম ছত্রিশ বিলিয়ন ডলার। অন্যদের বেতন বছরে কমপক্ষে এক লাখ বিশ হাজার ডলার।

কিন্তু বাস্তবে কারও মূল্য কম বা বেশি নয় এ মুহূর্তে।

একেই বলে বিশৃঙ্খলা, ভাবল ডেমিয়েন। ওটা এমনই

জিনিস, সমান করে দেয় সবাইকে ।

দেখতে না দেখতে পিটের মেঝেতে জমল পাঁচ ফুট উঁচু পানি । উঠে এল সবার গলা লক্ষ করে । আগের চেয়ে সহজে গহ্বরের ভিতর ঘুরছে টাইগার শার্কগুলো । মানুষগুলো প্রথমে যে মঞ্চে ছিল, সেটা তলিয়ে গেছে ।

পাঁচ মানব সন্তান । চারটে হাঙর ।

দৃশ্যটা আন্দদায়ক নয় তো কী !

অসহায় মানুষগুলোকে লক্ষ্য করে ছুটে গেল একটা টাইগার শার্ক, গুঁতো দিল একজনের বুক-পেটে । পরক্ষণে উপড়ে নিল লালচে চাকা-চাকা মাংস । দোদুল্যমান পানির ভিতর ছড়িয়ে পড়ল তাজা রক্ত । লালচে ফেনা ছুটে গেল নানাদিকে ।

রক্তাক্ত বডিগার্ড তলিয়ে যেতেই হাউমাউ করে উঠল সবাই ।

জীবন ভিক্ষা চাইল নয় নম্বর সদস্যের মহিলা এইড । ডেমিয়েনকে মাথা নাড়তে দেখে প্রাণ দিতে চাইল গিলোটিনের নীচে । ব্যবস্থা করে দিল ডেমিয়েনের লোক নিরাপদ দূরত্ব থেকে ।

পরের পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধারালো ফলা বিচ্ছিন্ন করল মহিলার মাথা । বাকি দু'জনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে তিন হাঙর ।

নিজেও গিলোটিন বেছে নিল নয় নম্বর সদস্য ।

হাঙরের মুখে পড়বার চেয়ে গিলোটিন ঢের ভাল ।

লিভারটা তাকেই টানতে হলো ।

কিছুক্ষণ পর গিলোটিনের মঞ্চে নাচতে লাগল উদ্যত, খ্যাপা সাগর, নীরবে মুছে দিল সমস্ত প্রমাণ ।

হাঙরগুলো তৃপ্তি নিয়ে চিবাচ্ছে লাশগুলো ।

আর কিছু দেখবার নেই, একবার আশ্তে করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজ অফিস লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল ডেমিয়েন ডগলাস ।

জরুরি টেলিকনফারেন্স শুরু হবে একটু পর ।

পাথুরে দেয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড সব টেলিভিশন পর্দা, সেখানে দেখা দিয়েছে পরিচিত ক'জনের মুখ।

এঁরা কাউন্সিলের সদস্য, মিটিঙের জন্য সময় দিচ্ছেন দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে।

নিজের সিটে বসে পড়ল ডেমিয়েন ডগলাস।

পাঁচ বছর আগে বাবা মারা যাওয়ায় তাঁর মস্ত শিপিং এবং ডিফেন্স কন্ট্র্যাক্টিং সাম্রাজ্য পেয়েছে সে। এই অসংখ্য কোম্পানির গোলকধাঁধার নাম ড্রাগন কর্পোরেশন। বহু কিছুর ভিতর ডেস্ট্রয়ার ও লং-রেঞ্জ মিসাইল তৈরি করে ড্রাগন কর্পোরেশন। সরবরাহ করা হয় ইউএস সরকারকে। বাবা মারা যাওয়ার পর পাঁচ বছরে ড্রাগন কর্পোরেশনের মুনাফা পাঁচগুণ বাড়িয়ে ফেলেছে ডেমিয়েন।

এর কিছুদিনের ভিতর ওকে কাউন্সিলে যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন বর্তমান চেয়ারম্যান। আপত্তি করেনি ডেমিয়েন।

‘নয় কোথায়, বারো? তার না তোমার সঙ্গে থাকার কথা?’ টেলিভিশনের পর্দায় নড়ে বসল চেয়ারম্যান।

মৃদু হাসল ডেমিয়েন। ‘সুইমিংপুলে সাঁতরাতে গিয়ে পায়ের পেশিতে খিঁচ ধরেছে। আমার ব্যক্তিগত ডাক্তার তাঁকে দেখছে।’

‘সব ঠিক আছে তো?’

‘হ্যাঁ, চিন্তা করবেন না,’ দ্বিধা না করে বলল ডেমিয়েন। ‘নোয়ার জাহাজগুলো পৃথিবীর নির্দিষ্ট প্রতিটি জায়গায় পজিশন নিয়েছে। গতসপ্তাহে ডিজিএসই-র লোক শেষ করে দিয়েছে আমেরিকান সৈনিকদের। আমার নরফোকের ফ্যাসিলিটি রক্তে ভাসছে। আমরা ইউএস ইন্সপেক্টরদের জন্যে তৈরি। কাজ করছে সমস্ত সিস্টেম। সিগনাল দিলেই শুরু হবে সব।’ মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল ডেমিয়েন, গ্লাস তুলে এক ঢোক পানি গিলে নিয়ে বলল, ‘অবশ্য, মিস্টার চেয়ারম্যান, আগেও বলেছি, এখনও দেরি

হয়ে যায়নি, আমরা বাড়তি কাজটাও সেরে নিতে পারি।’

‘বারো!’ কড়া সুরে বললেন চেয়ারম্যান। ‘আগেই স্থির হয়েছে সব, এবং এখন কাজ থেকে পিছিয়ে যাব না। আমি দুঃখিত, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, যদি আবারও ওই বাড়তি কাজের কথা তোলেন, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা হবে।’

আস্তু করে মাথা দোলাল ডেমিয়েন। ‘আপনার যা ইচ্ছে, মিস্টার চেয়ারম্যান।’

কাউন্সিলের শাস্তি যে করে হোক এড়াতে হবে।

পঞ্চাশের দশকে কাউন্সিলের আইন ভেঙে জাপানের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করায় চরম শাস্তি দেয়া হয় জোসেফ কেনেডিকে, তাঁর হারাতে হয় বিখ্যাত দুই সন্তানকে। আর চার্লস লিওবার্গের শিশু সন্তানকে কিডন্যাপ করে খুন করা হয়। ভদ্রলোককে ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হয়: আমি আসলে অ্যাডলফ হিটলারকে খুবই পছন্দ করি। উনিশ শ’ ত্রিশের দিকে কাউন্সিলের অমতে নাযিদের সঙ্গে ব্যবসা করবার কারণে চরম শাস্তি পেতে হয় তাঁকে।

এরপর গত কয়েক বছর আগে কী হলো?

কাউন্সিলের সদস্য ছিল না এনরন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, একেবারে শেষ করে দেয়া হলো অতবড় কর্পোরেশন এবং তার ডিরেক্টরদেরকে।

টেলিকনফারেন্স চলতে থাকল।

দ্বিতীয়বার টু শব্দ করল না ডেমিয়েন ডগলাস।

বর্তমান ইস্যুর বিষয়ে তার ধারণা: কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যের চেয়ে অনেক বেশি জানে সে।

যিম্বাবুইয়ের এক্সপেরিমেন্ট তার নিজ আইডিয়া। আর ওটার কারণেই জানা গেছে, এর পর কী ঘটতে চলেছে বিশ্বে। দশকের পর দশক ইউরোপিয়ানদের হাতে অর্থনৈতিক অত্যাচার সইবার পর দারিদ্র্য-পীড়িত আফ্রিকার জনগণ বা সরকারগুলো এখন

মানতে রাজি নয়, শ্বেতাঙ্গদের ব্যক্তিগত কোনও সম্পত্তি থাকতে পারে।

তা ছাড়া, গ্লোবাল পপুলেশন গ্রোথের উপর থ্রবফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর সব হিসাব বদলে যেতে শুরু করেছে।

পশ্চিমাদের জনসংখ্যা কমছে আশঙ্কাজনক হারে।

এবং এর ফলে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠছে দরিদ্ররা।

কিন্তু এ মুহূর্তে কাউন্সিলে এসব উপাত্ত তুলে তর্ক জুড়লে মস্ত বিপদে পড়বে ডেমিয়েন।

আরও কিছুক্ষণ পর শেষ হলো কাউন্সিলের টেলিকনফারেন্স, অবশ্য অনলাইনে রয়ে গেল ক'জন কাউন্সিল সদস্য— নিজেদের ভিতর গল্পগুজব করছে।

চুপচাপ তাদেরকে দেখছে ডেমিয়েন ডগলাস।

কথার ছলে এক সদস্য জানাল, ‘...গতকাল ওই ড্রিলিং স্বত্ব কিনেছি এক বিলিয়ন ডলারে। বললাম, হয় এক বিলিয়ন, নইলে বাদ থাক তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা। উপায় আছে নির্বোধ-গাধা ওই আফ্রিকান সরকারগুলোর সর্বোচ্চ নেতাদের?’

হাসছে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। ‘আর গতকাল ক্লাবে লিলি মাখসাখের সঙ্গে দেখা। খুব আগ্রহী মনে হলো ওকে। আবারও জানতে চাইল, কাউন্সিলে পদ দেয়া হবে কি না। আমি বললাম, “কত বিলিয়ন ডলার তোমার, লিলি?” বলল, “তিরিশ বিলিয়ন।” জিজ্ঞেস করলাম, “আর তোমার কোম্পানির?” গর্ব করে বলল, “এক শ’ সত্তর বিলিয়ন।” এবার বললাম, “বাহ, যথেষ্ট আছে তো তোমার, তো চলে এসো মেন্স রুমে, আমাকে এক শট দারুণ খেলা দিলেই সিট পাইয়ে দেব।” এরপর আর থাকল না মেয়ে, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ক্লাব ছেড়ে!’

শালা আস্ত ডাইনোসর, ভাবল ডেমিয়েন। পুরনো সব ধারণা নিয়ে পার করে দিল জীবনটা!

মস্ত ব্যবসায়ীর মুখে এসব মানায় না!
বাটন টিপে দিল ডেমিয়েন, অফ করে দিল সিগনাল। মুহূর্তে
কালো হয়ে গেল চারপাশের টেলিভিশনের পর্দা।

পনেরো

সাইপ্রাস দ্বীপের পশ্চিমাকাশ চিরে চলেছে কালো সুখোই ফাইটার
বিমান।

মাথার উপর নীলাকাশ, নীচেও একই রং— গাঢ় নীল
ভূমধ্যসাগর।

অক্টোবর ১৩। স্থানীয় সময় দুপুর বারোটা।

কুয়াশার তৈরি মাইক্রোডট জানাচ্ছে কোথায় চলেছে বাউন্টি
হান্টার ডেভিড এন. হেঞ্জিকের বিমান।

কঙ্গোর স্ট্যানলি পর্বতমালার কয়লা খনি ত্যাগ করবার পর
মাত্র একবার অবতরণ করেছে হেঞ্জিকের বিমান। তাদের জন্য
স্থির করা মিশরীয় এয়ারফিল্ডে নামতেই দু'ভাগে ভাগ হয়েছে
কন্টিনেন্টাল সোলজারদের ইউনিট ৬৬।

একটি বিমানে উঠেছে এক দল, তাদের গন্তব্য লণ্ডন।

অন্য দলটি রয়ে গেছে আগের সেই বিমানেই। ওই কার্গো
বিমানের কমপিউটার ডেটা অনুযায়ী ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম উপকূল
লক্ষ্য করে রওনা হবে তারা।

লণ্ডনের দিকে অগ্রসরমাণ বিমানটি চকচকে গালফস্ট্রিম ১৪
এগযেকিউটিভ জেট, ঝোড়ো গতি তুলছে।

পনেরো মিনিট পর ফ্রান্স লক্ষ্য করে রওনা হয়েছে রয়াল
এয়ার ফোর্সের সি-১৩০জে হারকিউলিস বিমান। রিফিউলিং এবং
চেকআপের সময়ও দেয়া হয়নি।

তখনই ঘণ্টি বেজেছে রানার মগজে। বুঝে গেছে, হেড্রিককে
পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে ব্রিটিশ সরকার। চারপাশে যা ঘটছে, তার সবই
জানে তারা। তাদেরই অনুরোধে ওই বিমান নামতে দিয়েছিল
মিশরীয় কর্তৃপক্ষ।

লক্ষণটা ভাল নয়।

আকাশ চিরে ছুটছে কুয়াশার কালো সুখোই বিমান।

এ মুহূর্তে বম বে-তে বসে আছে রানা।

দুশ্চিন্তার কারণে কপাল কুঁচকে আছে।

হেড্রিকের বিমানের বহু দূরে দিগন্তের ওপাশে উড়ছে কুয়াশার
সুখোই, ব্যবহার করছে স্টেলথ ফিচার।

‘আমার জানা তথ্য অনুযায়ী, ওটা হেড্রিকের কমন ট্যাকটিক,’
জানাল কুয়াশা। ‘দুই ভাগে ভাগ করেছে দলকে। প্রথমটা
ডেলিভেরি টিম, অন্যটা স্ট্রাইক টিম। শেষেরটার কাজ পরবর্তী
টার্গেটকে খতম করা। এবং একই সময়ে ডেলিভারি টিম গন্তব্যে
পৌঁছে দেবে বিচ্ছিন্ন মাথা।’

‘স্ট্রাইক টিম যাচ্ছে লওনে,’ মন্তব্যের সুরে বলল রানা।
‘এবারের কাজ বোধহয় ডেনিস ই. ম্যাকিনকে শেষ করা।’

‘আমারও তা-ই ধারণা,’ সায় দিল কুয়াশা।

‘এবার? কী করবেন, স্যর?’ রানার দিকে চেয়ে জানতে চাইল
নিশাত।

চট করে একবার কুয়াশাকে দেখল রানা। ওর মন চাইছে
এখনই হারকিউলিস বিমানে হামলা করতে।

ওখানে অসহায় অবস্থায় বন্দি তিশা।

‘সম্ভব হলে ফ্রান্সগামী ওই বিমানের পিছু নেব,’ বলল রানা।

আপত্তি এল না কুয়াশার তরফ থেকে, বরং কমপিউটার কন্সোলে দুটো বাটন টিপল। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'ঠিক আছে, ওদের কমপিউটারের ফ্লাইট ডেটা পেলাম। নব্বুই মিনিট পর তুরস্কের পশ্চিমে মিড-এয়ার রিফিউয়েলিং করবে।'

'কোথা থেকে টেকঅফ করবে ট্যাঙ্কার বিমান?' জানতে চাইল রানা।

'সাইপ্রাস দ্বীপের ব্রিটিশদের অ্যাকরোটিরি এয়ারফোর্স বেস থেকে,' বলল কুয়াশা। 'এরিয়াল ট্যাঙ্কারটা ভিসি-১০। আকাশে উঠবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর।'

চট করে নিশাত ও খবিরকে দেখল রানা। পরক্ষণে কুয়াশাকে বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমি চাই আপা আর খবিরকে লগুনে পৌঁছে দিক রঘুপতি। আপনি ওদের নেতৃত্ব দিলে খুশি হব। হেডিকের ওই দল ম্যাকিনকে শেষ করার আগেই পৌঁছতে হবে। সেজন্যে সুখোই ফাইটার লাগবে।'

'লগুনে গিয়ে আমাদের কাজ কী হবে, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'বলছি,' বলল রানা। 'সোজা লগুনে যাবেন। আর আমি নামব সাইপ্রাসে...'

'আমার আপত্তি আছে। আমি তোমার সঙ্গে থাকছি,' বলল বৈজ্ঞানিক, 'অন্তত এই বাউন্টি হাণ্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

আন্তে করে মাথা দোলাল রানা।

নিশাত ও খবিরকে খুলে বলতে লাগল, কী করতে হবে লগুনে পৌঁছবার পর।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর এয়ার-টু-এয়ার রিফিউয়েলিংয়ের জন্য সাইপ্রাস দ্বীপের ব্রিটিশ এয়ার বেস থেকে আকাশে উঠল ভিকার্স ভিসি-১০, পেটমোটা বিমান।

কিন্তু বিমানের চার ত্রু ভুলেও জানল না রিয়ার কার্গো বে-তে উঠেছে অচেনা দুই লোক।

অ্যাকটিভ স্টেলথ পর্দার আড়ালে বিমান থেকে মাসুদ রানা এবং কুয়াশাকে সাইপ্রাসের সাগরতীরে নামিয়ে দিয়েছে রঘুপতি।

এরপর লগুন লক্ষ্য করে রওনা হয়েছে তিনজনের দলটি।

রানা ভেবেছিল বিএসএস-এর চিফ মার্ভিন লংফেলোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তাঁর সাহায্য নিয়ে ওই রিফিউয়েলিং বিমানে উঠবে।

কিন্তু পরে নাকচ করেছে চিন্তাটা।

সাগরতীর থেকে মাত্র দশ মিনিটে পৌঁছে গেছে প্রায় পরিত্যক্ত ব্রিটিশ এয়ার বেসে। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ঝোপঝাড়ের ভিতর। পরবর্তী দশ মিনিট নজর রাখবার পর, উঠে পড়েছে ভিসি-১০এর পেটে।

বিমান আকাশে উঠবার কিছুক্ষণ পর তুরস্কের আকাশসীমা পেরোলো ভিসি-১০। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগেই অনুমতি নিয়েছে, পরবর্তী কয়েক মিনিট পর কঙ্গো থেকে আসা আরএএফ হারকিউলিসের পাশে পৌঁছে গেল ট্যাঙ্কার বিমান।

দুই বিমানের পাইলটের ভিতর নিশ্চয়ই কথা হয়েছে। হারকিউলিস বিমানের সামনে চলে গেল ভিসি-১০। পিছনের বিমান থেকে সামান্য উপরে ভাসছে। রিয়ার হ্যাচ থেকে বাড়িয়ে দেয়া হলো দীর্ঘ ফিউয়েল হোস। সত্তর মিটার দীর্ঘ ওই নলকে অনেকে বলে বুম। শেষমাথায় স্টিলের গোলাকার ড্রোউগ। ওটার অন্য অংশ আটকে দেয়া হবে পিছনের বিমানের ট্যাঙ্কের পাইপে।

ট্যাঙ্কার বিমানের পিছনে অপেক্ষা করছে একাকী অপারেটর। তার কাজ কাঁচে ঢাকা কমপার্টমেন্টে উপুড় হয়ে শুয়ে পিছনের হারকিউলিস বিমানের রিসিভিং প্রোবে বুম আটকে দেয়া।

হারকিউলিসের রিসিভিং প্রোব দিগন্তের দিকে নাক তাক করা

পাইপ। ওটা আছে কার্গো বিমানের ককপিট উইণ্ডোর খানিকটা উপরে।

আকাশে বিপদ না ঘটিয়েই ব্যালে ড্যান্স শেষ করেছে দুই বিমানের পাইলট।

ট্যান্কারের বুম অপারেটর বাড়িয়ে দিয়েছে নল। স্থির রাখছে জিনিসটা। পিছনে সামান্য নীচে আসছে হারকিউলিস।

কারক্লাঞ্চ! আওয়াজ তুলে হারকিউলিসের রিসিভিং প্রোব লক হলো ড্রোউগে। কাজে নামল ভাসমান দুই বিমানের মাঝের নল, হারকিউলিসের পেটে ঢুকতে লাগল হাই-অকটেন।

ওদিকে খেয়ালই নেই কুয়াশার। এইচঅ্যাঙ্কে পিস্তলে ভরছে অদ্ভুত কয়েকটা নাইন এমএম রাউণ্ড। এসব গুলির থুতনির নীচে কমলা রঙের ব্যাণ্ড আঁকা।

‘এ জিনিস ব্যবহার করলে ছুটন্ত ষাঁড়ও হোঁচট খেয়ে পড়ে,’ রানাকে বলল। ‘কখনও কখনও ব্যবহার করি। গ্যাস এক্সপ্যাণ্ডিং নাইন মিলিমিটার রাউণ্ড। হলো পয়েন্ট গুলির চেয়ে ঢের ভাল। টার্গেটের বুক বা পেটে লাগলে স্রেফ বিস্ফোরিত হবে লোকটা।’

‘বিস্ফোরিত হবে?’ ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা।

‘কোমর থেকে দু’টুকরো হয়ে যাবে। কয়েকটা লাগবে?’

‘না, ধন্যবাদ।’

‘তাও রাখো,’ রানার কমব্যাট ওয়েবিঙে কমলা ব্যাণ্ডের কয়েকটা গুলি গুঁজে দিল কুয়াশা। ‘পরে লাগতে পারে।’

বৈজ্ঞানিকের আলখেল্লার অসংখ্য পকেট খেয়াল করছে রানা।

কী নেই ওখানে!

পনি বটল, ছোট রো-টর্চ, মাউন্টেনিয়ারিং পিটন...

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। ছোট একটা পাউচের মত জিনিসটা দেখে চমকে গেছে। ওটা বোধহয় রোল ব্যাগ!

‘ওটা কি বডি ব্যাগ?’ জানতে চাইল রানা।

‘হ্যাঁ, মার্কোভ টাইপ-১১১,’ জানাল কুয়াশা, ‘এ জিনিস তৈরিতে সেরা ছিল সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। অন্যদেশের বিজ্ঞানীরা ওদের ধারেকাছেও যেতে পারেনি।’

আস্তু করে মাথা দোলাল রানা।

মার্কোভ টাইপ-১১১ আসলে কেমিকেল বডি ব্যাগ। সঙ্গে ডাবল-স্ট্রেংথ যিপলক ও পলি-কোটড নাইলন দেয়াল।

নিরাপদে রাখা সম্ভব ভয়ঙ্কর দূষণে মৃত লোকের লাশ। ছড়িয়ে পড়বে না কোনও বিপদ। প্লেগ, কেমিকেল ওয়েপস, এমন কী সুপার হিটেড রেডিয়োঅ্যাকটিভ আবর্জনাও আটকে রাখবে নিজের পেটে। চের্নোবিল দুর্ঘটনার পর এমন অসংখ্য বডি ব্যাগ ব্যবহার করেছিল রাশানরা।

অবশ্য এসব দেখে নয়, রানা হাসল পিটনগুলো দেখে।

মনসুর আলী ওরফে বিজ্ঞানী-বৈমানিক কুয়াশা নানা কাজেই বডি ব্যাগ রাখতে পারে, কিন্তু তাই বলে বিমানে চেপে যাওয়ার সময় পিটন কেন?

বিমান দুর্ঘটনার পর খসে পড়বে আকাশ থেকে, তখন নামবে কোনও পাহাড়ে, তারপর আবারও আকাশ ছোঁয়ার জন্য শুরু করবে ক্লাইমিং?

এসব পিটন ছোট স্প্রিং লোডেড কাঁচির মত জিনিস।

যে-কোনও ছোট ফাটলকে সর্বশক্তিতে খামচে ধরে, পাহাড়ে উঠবার সময় ক্লাইমাররা এই জিনিসের সঙ্গে আটকে নেয় দড়ি। দেয়াল বা ফাটলের উপর এত জোরে কামড় বসায় পিটনের স্প্রিং, যে অনায়াসেই ঝুলতে পারে পর্বতারোহী।

মনে মনে বলল রানা, এ জিনিস দিয়ে করে কী লোকটা?

‘একটা কথা জানতে চাই,’ কৌতূহল মেটাতে প্রশ্ন করল ও, ‘পিটন দিয়ে কী করবেন?’

অলসভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বৈজ্ঞানিক। ‘হয়তো দেয়াল বেয়ে

উঠতে কাজে লাগবে।’

জিঙ্গেস করল রানা, ‘নিশ্চই আরও বহুকিছু আছে আপনার কাছে? যেমন ধরুন অত্যাচার করার মত কিছু?’

রানার চোখে চোখ রাখল কুয়াশা। সামান্য হাসল। ‘একেবারে নেই, তা নয়। তবে নির্যাতন নয়, ওগুলো অন্য কাজে ব্যবহার করি।’

রিফিউয়েলিং প্রায় শেষ, আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল ওরা।

‘তুমি বুমার লোকটার ব্যবস্থা নাও,’ রানাকে বলল বৈজ্ঞানিক। নতুন একটা নাইন এমএম পিস্তল বের করেছে। ‘আমি ককপিটের ক্রুদের ব্যবস্থা করছি।’

‘একটা কথা,’ বলল রানা। ‘একবার হারকিউলিসে উঠলে যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু আমি চাই না এ বিমানের কেউ মারা যাক। সম্ভব হলে বন্দি করবেন পাইলট ও অন্যদেরকে। পরে যেন নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারে ওরা।’

‘তাতে সময় নষ্ট হবে!’ আপত্তির সুরে বলল কুয়াশা।

‘এ বিমানের কেউ সামান্যতম অন্যায় করেনি আমাদের প্রতি,’ যুক্তি দিল রানা।

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল বৈজ্ঞানিক, তারপর বলল, ‘ঠিক আছে, দেখি কী করতে পারি।’

‘ধন্যবাদ, কুয়াশা, এর বেশি কিছু চাইছি না আপনার কাছ থেকে,’ বলল রানা।

অস্ত্র হাতে দু’দিকে রওনা হলো দুই জগতের দুই প্রতিভাবান বাঙালি।

ব্রিটিশ সি-৩০ হারকিউলিস বিমানের ককপিটে পনেরো খণ্ডের জানালা দিয়ে খুব ভালভাবেই দেখা যায় চারপাশ। দুই পাইলট খেয়াল করছে, একটু সামনে ও উপরে বুলছে ভিসি-১০ বিমানের

পাখির নিতম্বের মত অংশ। ওখান থেকে আসছে ফিউয়েল হোস— নানাদিকে সরছে মস্ত অজগরের মত। শেষাংশ এসে লাগবে ককপিটের উপরের রিসিভিং প্রোব-এ।

জীবনে বহুবার মিড-এয়ার রিফিউয়েলিং করেছে দুই পাইলট। একবার দুই বিমানের মিলন হলেই অটো-পাইলট চালু করবে পাইলট। তখন থেকে একমাত্র কাজ হয়ে উঠবে ফিউয়েল পাম্পিং স্ট্যাটাস লক্ষ্য করা। জানালা দিয়ে চারপাশের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার সময় পাবে না তখন।

এবং সে কারণেই ক্রুদের কেউ জানল না, সামনের বিমান থেকে বেরোল যমের মত কালো পোশাক পরা এক লোক। ফিউয়েল হোস বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে এল সে, তোয়াক্কা করছে না বিপদের। দক্ষ স্ট্যান্টম্যানের মত নামছে ককপিট লক্ষ্য করে। পরক্ষণে এক পশলা গুলিতে বিস্ফোরিত হলো জানালার কাঁচ।

দৃশ্যটা সত্যিই অদ্ভুত।

আকাশের বিশ হাজার ফুট উপরে ভাসছে প্রকাণ্ড দুই বিমান। সামনের উডোজাহাজের পিছন থেকে দীর্ঘ ঝুলঝুলে ফিউয়েল হোস গেছে পিছনের আকাশযানের কপালে।

আর দোদুল্যমান হোস বেয়ে নামছে দুই লোক, যেন ছোট্ট দুই পুতুল।

হোস ঘিরে তৈরি করেছে দড়ির লুপ। একহাতে দড়ির দুই প্রান্ত চেপে ধরে নেমে আসছে কুয়াশা ও রানা। অন্যহাতে হেকলার অ্যাণ্ড কচ্ অটোমেটিক পিস্তল।*হারকিউলিস বিমানের ককপিট লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করছে।

অসংখ্য কাঁচের টুকরো চোখে-মুখে বিঁধতেই সিট ছেড়ে লাফিয়ে ককপিটের মেঝেতে উপড় হলো দুই পাইলট।

সামনে থেকে আসছে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া।

অটোমেটিক পাইলটে চলছে বিমান, আগের মতই স্থির।

তীব্র গতিতে ফিউয়েল হোস থেকে বিমানের ককপিটে পৌঁছল
কুয়াশা, লাফিয়ে নামল মেঝেতে। মুখে হাই-অল্টিচ্যুড মুখোশ,
পিঠে আল্ট্রা-কমপ্যাক্ট এমসি-৪/৭ অ্যাটাক প্যারাসুট।

পাশাপাশি শুয়ে থাকা দুই পাইলট চেয়ে রইল, দৃষ্টি
বিস্ফারিত, সম্পূর্ণ হতবাক।

কাছের জনের মাথায় অস্ত্র তাক করেছে কুয়াশা। খতম করতে
পারবে এক গুলিতে দুই পাখি। অন্যহাতে কোমর থেকে নিল
হ্যাণ্ডকাফ, দু'জনের কজিতে আটকে দিল ইম্পাতের দুই কড়া।
পিস্তলের জোরালো দুই টোকা পড়ল তাদের চাঁদির উপর।

সম্ভ্রষ্ট হলো কুয়াশা।

আপাতত কমপক্ষে একঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে এরা।

‘কই, তুমি কোথায়, রানা!’ রেডিয়ো মাইকে বলল কুয়াশা।

‘আপনার পিছনেই!’ জানাল রানা। পরক্ষণে নামল ককপিটের
মেঝেতে। মুখে ব্রেডিং মাস্ক, পিঠে ঝুলছে খুদে ও চ্যাপ্টা অ্যাটাক
প্যারাসুট।

হারকিউলিস বিমানের কার্গো হোল্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো
পোশাক পরা আট কমাণ্ডো, একটু দূরে সুট পরিহিত দু'জন।
এদের সঙ্গে রয়েছে দুই বন্দি।

কন্টিনেন্টাল সোলজার বাউন্টি হান্টিং সংগঠনের ৬৬
ইউনিটের লোক আট কমাণ্ডো। তাদের কাজ পুরস্কার ঘোষণাকারী
ব্যাক্সারের কাছে ছিন্ন মাথা পৌঁছে দেয়া।

সুট পরা যে দু'জন, কেউ জানেন না তাদের সঠিক নাম।
অবশ্য, এদের রয়েছে এমআই-সিক্সের পরিচয়পত্র।

এককথায়, তারা কাজ করে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের হয়ে।

দুই বন্দির একজন বাংলাদেশ আর্মির লেফটেন্যান্ট তিশা
করিম। অন্যজন জেনারেল রেমণ্ড কে. গ্র্যাঞ্জার। তাঁকে কঙ্গোর

ইউএন শিবির থেকে কিডন্যাপ করেছে ডেভিড এন. হেব্রিকের লোক।

এইমাত্র জ্ঞান ফিরেছে তিশার। চারপাশ দেখছে। ও আছে হারকিউলিস বিমানের চওড়া কার্গো হোল্ডে। পিঠের কাছে আটকা পড়েছে ওর দুই কজি ফ্লেক্সকাফে।

ক' ফুট দূরে জেনারেল রেমণ্ড কে. গ্র্যাঞ্জার। এই ভদ্রলোক ইউএস মেরিন কর্পসের অন্যতম সিনিয়র অফিসার। ফেলে রাখা হয়েছে এক হামভি জিপের বনেটের উপর। চার খণ্ড দড়িতে টানটান করে বাঁধা চার হাত-পা, যেন চিত্ত অবস্থায় ত্রুশবিন্দু হয়েছেন। হামভির দুই সাইড মিররের দণ্ডের সঙ্গে আটকে দেয়া হয়েছে হ্যাণ্ডকাফ, অন্য দুই কড়া বন্দি করেছে তাঁর দুই কজি।

ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে জেনারেলের ইউনিফর্মের আস্তিন। বাহুতে শক্ত করে বাঁধা রাবারের টুর্নিকে।

বন্দির দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুই এমআই-সিক্স এজেন্ট।

চেতনা ফিরতেই তিশা দেখেছে, সুটওয়াল দু'জনের ভিতর বেঁটে লোকটা পকেট থেকে বের করেছে হাইপোডারমিক নিডল।

ওটা গেঁথে দিল জেনারেলের বাহুতে।

‘কয়েক মিনিট লাগবে,’ সঙ্গীকে চাপা স্বরে জানাল বাঁটকু।

মাথা তুললেন জেনারেল, জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ।

‘হ্যালো, জেনারেল গ্র্যাঞ্জার,’ মৃদু হাসল লম্বা ইন্টেলিজেন্স অফিসার। ‘আপনার ধমনীতে যে ড্রাগ দেয়া হয়েছে, ওটার নাম ইএ-৬২৭। জানি, যে পদমর্যাদার অফিসার আপনি, এ জিনিসের নাম আগেই শুনেছেন। এটা নিউরাল ডিজাইনাইবিটর— এমন এক ড্রাগ, ঘোলা করে দেবে মস্তিষ্ক। মগজের নিউরোট্রান্সমিটার বা “গ্যাবা”র ক্ষতি করবে। সোজা কথায়, এ ড্রাগ ব্যবহার করলে সব প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করবেন আপনি।’

‘কু...কী?’ অবাক হয়ে বাহুর দিকে চাইলেন গ্র্যাঞ্জার।

‘...৬২৭? ...নাহ্...’

দূর থেকে দেখছে বাউন্টি হাণ্ডিং দলের লোকগুলো। তাদের নেতা অসাধারণ সুপুরুষ এক যোদ্ধা। একে কঙ্গোর কয়লা খনিতে দেখেছে তিশা। কুচ করে কেটে নিয়েছিল আফালনরত আলাল হোসেনের মাথা।

‘ঠিক আছে, এবার আলাপ করা যাক, জেনারেল,’ বলল লম্বা এজেন্ট। ‘দ্য ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড। ...ওটা কী?’

ভুরু কুঁচকে ফেললেন জেনারেল। কী যেন ভাবতে শুরু করেছেন। চিন্তাগুলোকে বাধা দিতে চাইলেন প্রাণপণে। কুঁচকে গেল গাল।

‘আমি... আমি... জানি না... কীসের কোড...’ বেসুরো কণ্ঠে বললেন।

‘জানেন তো অবশ্যই, জেনারেল। মনে করুন ইউনাইটেড স্টেটস্ আর ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোডের কথা। ওই কোড ওভাররিড করে ইউএস আর্মড সার্ভিসের সব সিকিউরিটি সিস্টেমকে। আজ ভোরে আপনি আমেরিকা থেকে কঙ্গোতে পৌঁছানোর আগে এক ইউএস মিলিটারি প্রজেক্টের এন্ট্রি কোড জেনেছেন। ওই প্রজেক্টের নাম নোয়া’য শিপ। আমরা নোয়া’য শিপ সম্বন্ধে সবই জানি, জেনারেল। কিন্তু জানি না ওই কোড। আর ওই কোড আমরা জানতে চাই। ...এবার বলুন, কী ওই কোড?’

অবাক হয়ে শুনছে তিশা।

ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছে। ওটা নাকি এমন এক মিউমেরিকাল কোড, যেটা ওভাররিড করবে ইউএস মিলিটারি সিকিউরিটি সিস্টেমের সব কিছুকে।

পিটপিট করে চাইলেন জেনারেল গ্র্যাঞ্জার। ড্রাগের বিরুদ্ধে লড়ছেন। ‘না... নেই তো... এমন কিছু...’

‘না, জেনারেল,’ জোর দিয়ে বলল লম্বা লোকটা, ‘ওই জিনিস বাস্তবে আছে। আর আপনি ইউএস মিলিটারির সর্বোচ্চ পাঁচজন কর্মকর্তার একজন। আমার বোধহয় ডোজ বাড়তে হবে।’

কোটের পকেট থেকে সিরিঞ্জ বের করল সে, জেনারেলের বাহুতে গেঁথে দিল নিডল।

গুণ্ডিয়ে উঠলেন জেনারেল। ‘...না...’

শিরশির অনুভূতি তৈরি করে শিরার ভিতর দিয়ে চলেছে ইএ-৬২৭।

ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো বিমানের ককপিটের জানালা।

গুলির আওয়াজ শুনেছে সবাই।

শুরু হলো শৌ-শৌ হাওয়ার জোরালো আওয়াজ।

কুয়াশা হারকিউলিস বিমানের ককপিটে পৌঁছে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ড পর ওর পাশে নামল রানা। তার আগেই ঝট করে সামনে বেড়ে দুই পাইলটের কজিতে হ্যাণ্ডকাফ আটকে দিয়েছে কুয়াশা। মাথায় পিস্তলের বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছে তাদেরকে।

‘এবার দুটো গুলি করতে পারি?’ মৃদু হাসল বৈজ্ঞানিক।

‘খুশি মনে!’

‘আসলে পারি না।’ আঙুল তুলে ককপিট ড্যাশবোর্ডের টিভি মনিটর দেখাল কুয়াশা। ওই পর্দা আসলে হারকিউলিস বিমানের রিয়ার হোল্ড দেখাচ্ছে।

রানা লক্ষ করল, ককপিটের দরজার কাছেই কমপক্ষে বারোটা ক্রেট। ওপাশে হামভির বনেটের উপর চিত হয়ে পড়ে আছেন জেনারেল গ্র্যাঞ্জার। একটু দূরে কালো ইউনিফর্ম পরা আট সশস্ত্র লোক। জেনারেলের দু’পাশে সুট পরা দুই লোক। আর কার্গো হোল্ডে হামভির বামে, দেয়ালের বেঞ্চে বসে আছে তিশা। ওর দুই হাত পিঠের পিছনে আটকে রাখা হয়েছে হ্যাণ্ডকাফে।

‘ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি,’ বলল রানা। ‘গোলাগুলি শুরু হলে...’

‘জানি, কাজেই হ্রাস করতে হবে ওদের অস্ত্র।’

আলখেল্লার পকেট থেকে দুটো ছোট জিনিস বের করেছে বৈজ্ঞানিক। হলদেটে। আকার ও আকৃতিতে নারকেলি বটাইয়ের মত।

‘কাজ কী ওগুলোর?’ জানতে চাইল রানা।

‘ব্রিটিশ এসি-২ চার্জের মত।’

‘আপনার তৈরি অ্যাডহেসিভ-চাফ গ্রেনেড?’

আস্তে করে মাথা দোলাল কুয়াশা। ‘অ্যান্টি ফায়ারআর্ম চার্জ।’
‘গুড!’

কাউন্টার টেরোরিস্ট অপারেশনে এ ধরনের গ্রেনেড ব্যবহার করে এসএএস এক্সপার্টরা। সশস্ত্র কিডন্যাপারদের বিরুদ্ধে দারুণ কাজ করে। আসলে সাধারণ ফ্লাশব্যাং গ্রেনেড, কিন্তু আলাদা গুণও আছে।

‘তুমি তৈরি, রানা? মনে রেখো, একটা গুলি হলেই জ্যাম হবে অস্ত্র। ...এবার দেখা যাক আমার বরই কেমন কাজ করে।’

ককপিটের দরজা সামান্য ফাঁক করল কুয়াশা, কার্গো হোল্ডের ভিতর ছুঁড়ে ফেলল দুই গ্রেনেড। পরক্ষণে ধেয়ে গেল ওগুলোর পিছনে।

ককপিটের ওপাশে কাঠের কার্গো ক্রেট ডিঙিয়ে হোল্ডে ঢুকল দুই হলদে নারকেলি বরই, হামভির পাশের মেঝেতে পড়েই বিস্ফোরিত হলো।

প্রথমে দেখা দিল অত্যুজ্জ্বল সাদা আলো, পরক্ষণে ভয়ানক তীক্ষ্ণ শব্দ হলো: ফটাস! ফটাস!

যেন ফাটিয়ে দেবে কানের পর্দা।

চমকে গেছে সবাই, ঢেকে ফেলেছে দুই চোখ।

এবার তৃতীয় কাজ দেখাল কুয়াশার গ্রেনেড ।

বিস্ফোরিত হতেই ওগুলোর পেট থেকে নানাদিকে ছিটকে গেল অতি ক্ষুদ্র হাজারে হাজারে সাদা-ধূসর কণা । ভরে উঠল কার্গো বে । এখন আর ভালভাবে চারপাশ দেখবার উপায় নেই ।

বাতাসে ভাসছে অজস্র সাদা-ধূসর কণা, একটু দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না । যেন চারদিক ঢেকে দেয়া হয়েছে পর্দা দিয়ে । ঘন কুয়াশা পড়লে বা তুমুল তুষারপাতের সময় এমন হয় ।

রানা খেয়াল করল, কুয়াশার গ্রেনেডের অ্যাডহেসিভ জিনিসটা ভয়ঙ্কর আঠালো । যেখানে লাগছে, সেখানেই সেঁটে যাচ্ছে ।

ঝট করে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল কাছের কমাণ্ডো । কিন্তু তার কপালে জুটল খাটো তীর । ওটা এসেছে কুয়াশার বাহুর সঙ্গে লাগানো খুদে ক্রসবো থেকে ।

দ্বিতীয় কমাণ্ডো চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ।

খট আওয়াজ উঠল তার কপালে ।

কুয়াশার বাম বাহুর ক্রসবোর তীর বিঁধেছে লোকটার মগজে ।

অবশ্য তৃতীয় কমাণ্ডো টিপে দিল কোল্ট কমাণ্ডো অ্যাসল্ট রাইফেলের ট্রিগার ।

মাত্র একবার গুলির পর থেমে গেল অস্ত্রটা ।

জ্যাম হয়ে গেছে ।

লোকটার অস্ত্রের ব্যারেলের অভ্যন্তর অংশ আঠালো করে দিয়েছে কুয়াশার আবিষ্কার । বিকল হয়েছে ব্যারেল, রিসিভার এবং প্রতিটি মুভিং পার্ট । ওই রাইফেল আর গুলি করবে না, বড়জোর গদা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

ম্যাগজকের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড এক বাড়ি মেরে লোকটার খুলি দাবিয়ে দিল রানা, থেঁতলে গেছে শত্রুর মগজ ।

পাঁচ সেকেণ্ডও লাগল না তিন লাশ মেরোতে পড়তে ।

কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে বাউন্টি হান্টার কমাণ্ডোরা, পরের

দুই সেকেণ্ডে রানা ও কুয়াশার পাশের কাঠের ক্রেটে খট-খট আওয়াজে বিঁধল দুটো ওয়ারলক হাণ্ডিং নাইফ।

জবাবে আলখেল্লার পকেট থেকে ভয়ঙ্কর কুৎসিত এক অস্ত্র বের করল কুয়াশা। জীবনে কখনও এত অশুভ জিনিস দেখেনি রানা।

না, দেখেছে।

ওটা খুদে চার ফলার নিনজা থ্রোয়িং নক্ষত্র— গুরিকেন।

ওটা রানার পাঞ্জার সমান হবে, চার ফলার ভিতর অংশে গোল ডিস্কে একটা গর্ত।

একহাতে দারুণ দক্ষতায় দেহের একপাশ থেকে নক্ষত্র ছুঁড়ল কুয়াশা। বাতাস চিরে স্‌স্‌স্‌ আওয়াজ তুলে ছিটকে গেল গুরিকেন।

পাশাপাশি দাঁড়ানো ৬৬ ইউনিটের দুই কমান্ডার গলা খচ! খচ! শব্দে কাটা পড়ল।

ধড়াস্ করে মেঝেতে পড়ল দুই লাশ। মেঝের উপর গড়াতে শুরু করেছে তাজা রক্ত। আঁশটে গন্ধে ভরে গেল আশপাশ।

পাঁচটা গেল, ভাবছে রানা।

আরও তিনজন বাকি... এ ছাড়া রয়েছে সুট পরা দুই...

ঠিক তখনই খপ্ করে ওর কজি ধরল কে যেন। হাতে অসম্ভব শক্তি। পরক্ষণে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে আবারও ককপিটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা। তাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ল মেঝেতে। মুখ তুলেই দেখল, ওর দিকে আসছে বিশালাকৃতি এক ট্রুপার। লোকটা মস্ত কোনও কালো গ্রিজলি ভালুক যেন। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে সাত ফুট। দু'হাতে কিলবিলে পেশি। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে চেহারা।

‘তুই এখানে কী চাস?’ ঘোঁৎ করে উঠল কালো পাহাড়।

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই নড়তে শুরু করেছে

রানা— লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ডানহাত ঘুরিয়ে চালাল ম্যাকহুক ।
ওটার বাঁট নামল লোকটার উঁচু চোয়ালের উপর ।

জোরালো খটাস্ আওয়াজ হলো ।

এবার বাপরে, গেছিরে বলে আত্ননাদ ছাড়বে লোকটা, ভাবল
রানা । কিন্তু কালো মানিক সামান্যও নড়ল না ।

‘বাপরে,’ বিড়বিড় করল রানা নিজেই ।

তখনই প্রচণ্ড এক ঘুষি নামল ওর চোয়ালে । ব্যথা ছাড়া আর
কিছুই টের পেল না, উড়তে শুরু করেছে পিছনে । ছিটকে গিয়ে
পড়ল জানালা ভাঙা ককপিটের ভিতর । নিজেকে ছেঁড়া কাপড়ের
নড়বড়ে পুতুল মনে হচ্ছে ওর । ড্যাশবোর্ডে গুঁতো খেয়ে ধুপ্ করে
পড়ল মেঝেতে ।

কষ্ট করে উঠতে হলো না, এক লাফে পৌছে গেল দানব,
একহাতে রানার গলা ধরে টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে নিল ।

‘তুই যেদিক দিয়ে এলি, সেদিক দিয়েই যা— ওই ভাঙা
জানালা দিয়ে ।’

কোনও আপত্তির সুযোগ পেল না রানা, সময় নষ্ট না করেই
ওকে ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলল কালো মানিক ।

খোলা আকাশে সাঁতার কাটছে রানা ।

বহু নীচে ঝিলমিল করছে নীল ভূমধ্যসাগর !

ষোল

ভাসমান অজস্র সাদা-ধূসর কণা ভরা কার্গো হোল্ডে ঝড়ের গতিতে

সামনে বাড়ছে কুয়াশা, শত্রুদের উদ্দেশে ছুঁড়ছে জাপানি নক্ষত্র।
তারই ফাঁকে একবার চট করে পিছনে চাইল। ভাবছে, রানার
কোনও অ্যাক্টিভিটি নেই কেন!

পরক্ষণে চমকে গেল কুয়াশা।

দেখল, ককপিটের ভাঙা জানালা টপকে চড়ুই পাখির মত
উধাও হয়ে গেল রানা!

‘যাহ্!’ বিড়বিড় করল কুয়াশা।

রানার মত ওর নিজের পিঠেও প্যারাসুট। চট করে বুঝে নিল,
আকাশ থেকে পতনের ফলে মরবে না রানা।

তা না হয় হলো, কিন্তু একা এতজনের বিরুদ্ধে লড়াই খুবই
কঠিন, ভাবল কুয়াশা। রেডিয়ো মাইকে বলল, ‘রানা, ঠিক আছ?’

জোরালো হাওয়ার উপর দিয়ে এল জবাব, ‘আছি, আবারও
উঠে আসছি।’

বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় ভাসছে হারকিউলিস বিমান। সামনে
এবং একটু উপরে ভিসি-১০ ট্যাঙ্কার। ওটা থেকে কেউ উঁকি দিলে
দেখবে, পিছনের বিমানের নোজ কেন-এ স্টেটে আছে এক
মহাসাহসী লোক। সে যেন সুপারম্যান, শুধু বুক দিয়ে ঠেকিয়ে
দেবে অত বড় বিমানের অগ্রগতি!

প্রকাণ্ড হারকিউলিস বিমানের নাকে ঝোড়ো হাওয়া পাত্তা না
দিয়ে নীচের দুনিয়া দেখছে রানা। কপাল ভাল, সঙ্গে ছিল
ম্যাগলুক, এবং ওটার ম্যাগনেটিক বাল্ব ওকে আটকে রেখেছে
কার্গো বিমানের নাকে।

ককপিটের দিকে মুখ তুলতেই গলা শুকিয়ে গেল রানার।

ভাঙা জানালায় উঁকি দিয়েছে কালো দানব, কুঁচকে ফেলেছে
ঘন ভুরু।

কয়েক মুহূর্ত পর জানালা থেকে সরল। পেরোল কিছুক্ষণ,

তারপর আবারও ফিরল, এখন হাতে ভয়ঙ্কর চেহারার কোল্ট .৪৫ রিভলভার। বোধহয় ককপিটেই ছিল। চোখে পড়েনি কুয়াশার।

রানার মাথার সামান্য উপর দিয়ে গুলি বেরিয়ে যেতেই ‘ধূর শালা!’ বলে উঠল দানব।

‘মু’ শালা!’ মনে মনে বলল রানা। আশা করেছিল কালো পাহাড় ভাববে শত্রু পড়ে গেছে। রিয়ার হোল্ডে ফিরবে ব্যাটা, আর সে সুযোগে আবারও ককপিটে ফিরবে ও।

কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি।

আর কোনও উপায় না দেখে একমাত্র কাজটাই করল রানা।

বেল্ট থেকে তিশার ম্যাগজক নিয়ে ব্যবহার করল ম্যাগনেটিক বাল্ব। ঠং আওয়াজে ওটা সেন্টে গেল বিমানের নীচের অংশে। এবার দুই ম্যাগজকের সাহায্য নিয়ে রওনা হলো রানা। বিমানের নাক থেকে খসে পড়েছে, হারিয়ে গেল কালো মানিকের লাইন অভ ফায়ার থেকে। কার্গো বিমানের তল্ল পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে, বিশ হাজার ফুট নীচে নীল সাগর এবং দূরে রুম্ব পাথুরে জমিন।

ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড থ্রোট মাইকে বলল রানা, ‘কুয়াশা! চেষ্টা করুন এক্সটার্নাল ডোর খুলে দিতে!’

কার্গো বে-র ভিতর ঝট করে সরে গেছে কুয়াশা। এইমাত্র বুকের পাশ দিয়ে গেল উড়ন্ত ছোরা। ওই একই সময়ে সুট পরা এক লোকের বুকে বিঁধল ওর গুরিকেন।

রানার কথা শুনতে পেয়েছে, চারপাশ দেখে নিল কুয়াশা। লাল বড় কন্ট্রোল বাটনের উপর চোখ পড়ল ওর। ওটাই নিয়ন্ত্রণ করে হারকিউলিস বিমানের কার্গো র‍্যাম্প।

কুয়াশার একটা গুরিকেন গেল লাল বাটন লক্ষ্য করে।

আওয়াজ উঠল: খটাং!

ঠিকভাবেই লেগেছে গুরিকেনের এক বাহু, অন্য এক বাহু

কম্পালের সঙ্গে চেপে ধরেছে বাটনটাকে। সঙ্গে সঙ্গে নিচু হুম্‌হুম্‌ আওয়াজ তুলে খুলতে লাগল হারকিউলিস বিমানের কার্গো র‍্যাম্প।

‘ঠিক আছে, রানা, খুলছে কার্গো র‍্যাম্প!’ জানিয়ে দিল কুয়াশা।

বৈজ্ঞানিকের কথা পরিষ্কার শুনল রানা, দুই হাত সর্বস্ব পিঁপড়ের মত চলেছে হারকিউলিস বিমানের পেট বেয়ে। মাথার উপরে সঁটে আছে দুই ম্যাগনেটিক বাল্ব। ও-দুটোর সাহায্য নিয়ে সামনে বাড়ছে। একটা ম্যাগনেটিক বাল্ব ডিম্যাগনেটাইজ করে আবারও বিমানের অন্য অংশে আটকে নিচ্ছে ম্যাগনেট। ঝুলতে ঝুলতে পেরিয়ে এল প্রায় ষাট ফুট দৈর্ঘ্যের কার্গো হোল্ড। আর সামান্য পথ, তারপর সামনেই পড়বে খোলা রিয়ার র‍্যাম্প।

খোলা রিয়ার লোডিং র‍্যাম্পের কারণে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকছে কার্গো বে-তে। বিমানের পেট থেকে তীরের মত বেরুচ্ছে ভাসমান সাদা-ধূসর কণা, যেন শুরু হয়েছে ইনডোর স্লিয়ার্ড।

কার্গো হোল্ডের ভিতর তিশার কাছে পৌঁছে গেছে কুয়াশা। চট করে বসে পড়ল মেয়েটির পাশে।

‘তোমাকে সরিয়ে নেব,’ নিচু স্বরে বলল। হাতে ছুরি, এবার কাটবে ফ্লেক্স-কাফ, কিন্তু তখনই কালো দুই প্রকাণ্ড হাত জোর টান দিল পিছন থেকে।

হোঁচট খেয়ে হামভির পাশে পড়ল কুয়াশা, ছুটে গেল হাতের ছোঁরা।

নিজের কাভার থেকে বেরিয়ে এসেছে বাউন্টি হান্টিং দলের নেতা। হামভির ডানদিকে লুকিয়ে ছিল।

‘ওর সানগ্লাস কেড়ে নাও!’ নির্দেশ দিল সে।

পরক্ষণে দানবের প্রচণ্ড ঘৃষি নামল কুয়াশার সানগ্লাসে।

মড়াং করে ভাঙল দুই কাঁচের মাঝের ডাঙি ।
 ঝরঝর করে খসে পড়ল ভাঙা দুই কাঁচ ।
 স্বাভাবিক আলো কুয়াশার চোখে পড়তেই ‘ওহ্!’ বলে উঠল ।
 তীব্র ব্যথা পেয়ে বুজে ফেলেছে দুই চোখ ।
 পরক্ষণে বুকে নেমে এল আরেক ভয়ঙ্কর ঘৃষি ।
 ‘ওকে গাড়ির সামনে ধরো,’ বলল দলের নেতা । ঝটপট
 সরিয়ে দিল হামভির চাকার গোঁজগুলো । লাফ দিয়ে উঠল গাড়ির
 স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে । ‘পিষে দেব ওর হাঁটু!’
 নির্দেশ পালন করতে দেরি হয়নি কালো দানবের ।
 দৃষ্টিহীন, অসহায় কুয়াশাকে ধরেছে হামভির চাকার সামনে ।
 নিজে বসেছে পিছিয়ে ।
 গর্জে উঠল ইঞ্জিন, পরক্ষণে হামভির গিয়ার ফেলল সুদর্শন
 নেতা । মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর ।
 ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়ল হামভি ।
 চাকার চাপে গুঁড়ো করে দেবে কুয়াশার দুই হাঁটুর বাটি ।
 এক সেকেণ্ড পর খুশি হয়ে উঠল বাউন্টি হান্টারদের নেতা ।
 সামনের লোকটার দেহের উপর চেপে বসেছে মস্ত জিপ । একটু
 গিয়েই একটা ক্রেটের গায়ে লেগে থামল গাড়ি ।
 ‘ধুশশালা!’ চৈঁচিয়ে উঠল কালো মানিক ।
 ‘কী হলো?’ জানতে চাইল তার নেতা ।
 ‘অন্য বদমাশটা ফিরেছে!’
 কেউ খেয়াল করেনি, আবারও হারকিউলিস বিমানে উদয়
 হয়েছে মাসুদ রানা ।
 বাউন্টি হান্টারদের নেতা এবং কালো মানিক ভেবেছিল
 হোল্ডে শত্রু বলতে ওই কালো আলখেল্লা পরা লোকটাই ।
 এ দিকে হোল্ডে পৌঁছেই রানা দেখেছে, জীবিত শত্রু বলতে
 সুদর্শন লোকটা, কালা পাহাড় এবং সুট পরা এক এজেন্ট ।

কেউ জানে না ম্যাগহুকের সাহায্য নিয়ে ফিরেছে ও, হামভির ডানদিকের সরু গলি ধরে পৌঁছে গেছে সামনে। হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিয়েছে কুয়াশাকে। ওই একই সময়ে গাড়ির নীচে ঠেলে দিয়েছে একটা লাশকে। সেই সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে জোরালো একটা লাথি লাগিয়ে দিল কালো মানিকের নাক-মুখ সই করে।

কুয়াশাকে নিয়ে হোল্ডের বামদিকের দেয়ালে আছড়ে পড়েছে রানা, সামান্য দূরেই তিশা।

একহাতে দুই জখমী চোখ চেপে ধরেছে কুয়াশা, মুখ থেকে বেরোচ্ছে না সামান্যতম কাতর ধ্বনি।

সময় নেই, তিশার পাশে বসে পড়ল রানা, বাড়িয়ে দিল নিজের ছোরা। ‘জলদি, তিশা! চললাম, জেনারেলকে মুক্ত করতে হবে!’

হামভির বনেটে রয়ে গেছেন গ্র্যাঞ্জার।

গাড়ির সাইড মিররের ডাঙার সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে দুই হ্যাণ্ডকাফ।

হাতে ছোরা নিয়েই জানাল তিশা, ‘দাঁড়াও!’ ৬৬ ইউনিটের এক লোকের লাশের কোমর থেকে আগেই সরিয়ে নিয়েছে এক গোছা চাবি। দুটো চাবি বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ‘হ্যাণ্ডকাফ খুলবে এগুলো!’

চাবি হাতে উঠে দাঁড়াল রানা, কিন্তু তখনই ড্রাইভিং ডোর লাথি দিয়ে খুলল বাউন্টি হান্টারদের নেতা। ওই একই সময়ে রানা দেখল, কাঠের এক ক্রেট থেকে টান দিয়ে ছোরা বের করে নিল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের লম্বা লোকটা।

দুই শত্রুর মাঝে আটকা পড়েছি, ভাবল রানা। দেরি না করে দু’দিকে প্রসারিত করল দু’হাতের দুই ম্যাগহুক। আঠালো কণা ভরা বাতাসে মাত্র একবার সুযোগ পাবে ও।

দ্বিতীয়বার ভাবল না রানা।

সুদর্শন লোকটার বুকে বিঁধল না ম্যাগন্থকের বাল্ব। অবশ্য, খটাং করে লাগল দরজার উপর। এইমাত্র নামতে শুরু করেছিল লোকটা, খুব কাছ থেকে ম্যাগনেটিক বাল্ব ব্যবহার হতেই বজ্রের মত আওয়াজ তুলে বন্ধ হলো আর্মাড দরজা। এতই জোরে যে, ছিটকে গিয়ে গাড়ির ভিতর পড়ল লোকটা।

দ্বিতীয় ম্যাগন্থকের ম্যাগনেটিক বাল্ব লেগেছে সিক্রেট এজেন্টের বুকে। প্রচণ্ড আঘাতে দু'ভাঁজ হয়ে গেল লোকটা, মটমট করে ভাঙল পাঁজরের হাড়। উড়ে গিয়ে পড়ল সে পিছনের ক্রেটগুলোর পাশে।

ততক্ষণে ছোরার পোচে হাতকড়া কেটে ফেলেছে তিশা, চলে এল হামভির সামনে। রানার কাছ থেকে চাবির গোছা নিয়ে খুলতে শুরু করেছে জেনারেলের বাম কজির কড়া।

‘ঠিক আছে,’ বলল তিশা, ‘এবার অন্য কজি...’

কিন্তু এমনি সময়ে তিশার অজান্তে হামভির পাশে উঠে দাঁড়াল কালো দানব, সত্যিকারের পাহাড়ের মতই। নাক-মুখ রক্তাক্ত।

এক লাফে তিশার পাশে পৌঁছে গেল রানা, ‘জেনারেলের উপর চোখ রাখো। আমার সিগনাল পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করবে।’

‘কীসের সিগনাল?’ জানতে চাইল তিশা।

জবাব না দিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল রানা, মেঝেতে পড়ে থাকা একটা লাশের বুক থেকে খুলে নিল কুয়াশার দুই গুরিকেন।

রানার মত করেই কুঁজো হয়েছে দানব, হাসছে রক্তাক্ত হলদে দাঁত বের করে।

দানবের নীরব আহবানে সাড়া দিল রানা।

হামভি থেকে সরে গেল দু'জন, পৌঁছল রিয়ার লোডিং র‍্যাম্প। বিমানের হাঁ করা দরজা দিয়ে দেখা গেল নীল আকাশ ও সাদা মেঘ। হু-হু করে বাতাস আসছে ভিতরে।

বুনো পশ্চিমের পুরনো আমলের দুই গান ফাইটারের মত
মুখোমুখি হলো দু'জন, দূরত্ব মাত্র ছয় ফুট ।

একজন দানবের মত প্রকাণ্ড ।

অন্যজন তার অর্ধেক ।

রানার হাতে চার ফলাওয়ালা গুরিকেন ।

শত্রুর হাতে মস্ত এক ছোরা ।

শুরু হলো রানা ও কালা পাহাড়ের লড়াই ।

ছোরা হাতে ঝট করে সামনে বাড়ল দানব, কিন্তু গুরিকেনের
ফলা দিয়ে ছোরার হামলা ঠেকিয়ে দিল রানা ।

ঠং-ঠং! আওয়াজ উঠল ।

এবার লাফ দিয়ে সামনে বেড়ে একপাশ থেকে ছোরা চালাল
দানব ।

ঠনাৎ আওয়াজ তুলে ছোরার ফলা সরিয়ে দিল রানা ।

কালা পাহাড় এবং ও লড়ছে কার্গো হোল্ডের শেষাংশে ।

এদিকে জেনারেল গ্র্যাঞ্জারের ডান হাতও খুলে দিয়েছে তিশা ।
মুক্ত হয়েছেন ভদ্রলোক । হ্যাণ্ডকাফের অপর অংশ এখনও সাইড
মিররের ডাঙার সঙ্গে লাগানো । হামভি থেকে বিবশ জেনারেলকে
নামতে সাহায্য করল তিশা, শুইয়ে দিল মেঝেতে ।

বিড়বিড় করছেন গ্র্যাঞ্জার: 'হায় ঈশ্বর... ওই কোড...
ইউনিভার্সাল কোড... হ্যাঁ, ঠিক, ওটা আছে... আছে... কিন্তু জানে
মাত্র কয়েকজন... হ্যাঁ, আমি নোয়া'য শিপগুলোর একটার
কমপিউটারে... কিন্তু এ ছাড়াও... অন্য আরও একটা প্রজেক্ট...
লিয়ার্ড...'

কার্গো হোল্ডের পিছনে লড়ছে রানা ও কালো দানব । ছোরা ও
গুরিকেনের টক্কর লাগছে ঠং-ঠনাৎ আওয়াজে । হামভির ডানদিকে
সরে এল দু'জন । সামান্য দূরে তিশা ও গ্র্যাঞ্জার । পিছাতে শুরু
করেছে রানা, মনে হলো যুদ্ধে হারবে করুণভাবে ।

‘তিশা!’ গলা চড়ল রানার, ‘তুমি সিগনালের জন্য তৈরি?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু সিগনালটা কী?’

‘এটাই সিগনাল!’

পরমুহূর্তে কালা পাহাড় ছোরার স্ল্যাশ করতেই বিদ্যুৎবেগে নড়ে উঠল রানা, দুই হাতে খপ্প করে ধরে ফেলল তার ডান বাহু। শত্রুর হাতটা টেনে বসিয়ে দিল হামভির বনেটের উপর। পাশেই সাইড মিররের ডাঙা থেকে ঝুলছে হ্যাণ্ডকাফ। একটু আগে ওটাতে বন্দি ছিলেন জেনারেল গ্র্যাঞ্জার।

‘এবার, তিশা!’

ঝট করে প্রতিক্রিয়া দেখাল তিশা, ঝাঁপিয়ে চলে এল বনেটের উপর, পরক্ষণে দানবের ছোরা ধরা কজি বন্দি হলো হ্যাণ্ডকাফের ভিতর। ধাতব ক্লিক আওয়াজ শুনে বিস্ফারিত হলো লোকটার দুই চোখ।

হামভির সাইড মিররের ডাঙির সঙ্গে আটকা পড়েছে সে!

দেরি না করে জেনারেলের পাশে চলে গেল রানা।

‘আপনি সুস্থ, জেনারেল?’ জানতে চাইল।

ভড়ভড় করে বলে চলেছেন গ্র্যাঞ্জার: ‘ওহ, ঈশ্বর! শুধু নোয়া’য শিপগুলো না... লিয়ার্ড প্রজেক্টও... হায় যিশু... ওই দুই প্রজেক্টই... নোয়া’য শিপ আর মিসাইল। গোপন করার জন্যে... প্রতি সপ্তাহে একবার করে বদলে... দেয়া হয় ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড। আর এখন... সেভেস্থ... সেভেস্থ ম্... ম... মার্সেন... মার্সেন...’

কানের কাছেই হুউশ্ আওয়াজ পেল রানা। ঝলসে উঠেছে চকচকে ইস্পাত। ঝটকা খেল জেনারেলের মাথা। গলা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোল রক্ত।

এক সেকেণ্ড পর কাঁধ থেকে খসে পড়ল ভদ্রলোকের মাথা! ফুটবলের মত মেঝের উপর দুই গড়ান দিয়ে থামল রানার পায়ের

সামনে। ধড় থেকে কারও মাথা কেটে নিলেও কখনও কখনও তিরিশ সেকেণ্ড চেতনা থাকে। জেনারেল গ্র্যাঞ্জারের দুই চোখ পিট পিট করে দেখছে রানাকে। গলার কাটা জায়গা থেকে গলগল করে পড়ছে রক্ত। বীভৎস দৃশ্য। আরও তিন সেকেণ্ড বিড়বিড় করে কী যেন বলল বেচারী, তারপর আঁস্টে করে শিথিল হলো গালের পেশি।

ঝট করে মুখ তুলে চাইল রানা।

ডেভিড এন. হেব্রিকের সুদর্শন ডেপুটি দাঁড়িয়ে আছে হামভির পাশে। হাতে দীর্ঘ ম্যাচেটি, ওটা থেকে টপটপ করে পড়ছে রক্ত।

রক্তিম দুই চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে লোকটার, যেন বদ্ধ উন্মাদ। ম্যাচেটি হাতে ঝড়ের বেগে সামনে বাড়ল।

কোপ ঠিকভাবেই নামত রানার ঘাড়ের, কিন্তু পিছন থেকে কে যেন থপ করে ধরল লোকটার কজি, আছড়ে ফেলা হলো হামভির বনেটের উপর। স্প্রিংয়ের মত লাফ দিল ম্যাচেটি, পাঞ্জা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ওই একই সময়ে ক্লিক আওয়াজে সুদর্শন লোকটার কজি আটকে গেল হামভির অন্য হ্যাণ্ডকাফে।

ঝটকা দিয়ে ঘুরে চাইল বাউন্টি হান্টারদের নেতা।

পাশে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা, চোখে নতুন সানগ্লাস।

‘আগেও তোমার ঢের কীর্তির কথা শুনেছি,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল বৈজ্ঞানিক। ‘বিপদে পড়লে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাও। কিন্তু এবার জানতে চাই, তুমি পাখির মত উড়তে পারো কি না!’

হামভির ড্রাইভিং দরজার পাশে চলে গেল কুয়াশা, ভিতরে হাত ভরে রিভার্স গিয়ার ফেলল। ইশারা করল রানা ও তিশার দিকে। ‘একটু সরে যাও তোমরা।’

ভয়ঙ্কর আতঙ্ক নিয়ে কুয়াশার দিকে চেয়ে রইল কালা পাহাড় ও তার বস।

‘তোমাদের সঙ্গে নরকে দেখা হবে না, কারণ আমি ওখানে যাব না,’ চাপা স্বরে বলল কুয়াশা, পরক্ষণে অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেলে চেপে আটকে দিল ম্যাচেটি।

পিছাতে লাগল হামভি, মাত্র কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছে গেল খোলা রিয়ার কার্গো র‍্যাম্প। গতি তুলেছে বিশ কিলোমিটার। মুহূর্তে বিমান থেকে বেরিয়ে গেল হামভির পিছন দিক, পরের সেকেন্ডে কালা পাহাড় এবং তার বস্ হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। সোজা চলেছে বিশ হাজার ফুট নীচে।

হামভি উধাও হতেই রানার বুকে মুখ গুঁজেছে তিশা, নীরবে কাঁদছে। বিড়বিড় করে বলল, ‘আমি না তোমার কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছি, আমি কেন কাঁদব?’

‘সবাই কাঁদে, কখনও কখনও,’ মৃদু স্বরে বলল রানা। আলতো হাতে তিশার কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিল।

কয়েক সেকেন্ড পর কুয়াশার উপস্থিতি খেয়াল হতেই রানার কাছ থেকে সরে গেল তিশা। জিজ্ঞেস করল, ‘আসলে কী ঘটছে, স্যর?’

‘এরা বাউন্টি হান্টার,’ বলল রানা। ‘পনেরোজনের একটা তালিকা পেয়েছে, তার ভেতর আমার নামও আছে। তোমাকে আটকেছিল আমাকে হাতে পাওয়ার জন্যে।’

সাইবেরিয়া, বাউন্টি হান্টার, একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ, পোলিশ বাউন্টি হান্টার, স্পেনন্যায় কোবরা ইউনিট—সংক্ষেপে সবই খুলে বলল রানা। কথা শেষে দেখাল বাউন্টি লিস্টি।

‘আর ওই লোক?’ চাপা স্বরে বলল তিশা। চোখের ইশারায় দেখাল কুয়াশাকে। ‘তার কী ভূমিকা?’

কথাগুলো শুনতে পায়নি কুয়াশা, এইমাত্র ককপিটে গিয়ে ঢুকেছে। ট্যাঙ্কার বিমান থেকে সরিয়ে নেবে কার্গো বিমানকে।

‘ওঁর নাম কুয়াশা, মস্ত বড় এক বাঙালি বিজ্ঞানী,’ বলল রানা।
‘জানি না কেন, আমাকে পছন্দ করেন, তাই ঠিক করেছেন
আপাতত পাশে থেকে সাহায্য করবেন আমার বিপদে।’

‘তোমাকে সাহায্য করবেন?’ অবাক হলো তিশা।

আস্তে করে মাথা দোলল রানা।

‘হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করে জানাতে হবে আমি বেঁচে
আছি,’ ভিন্ন প্রসঙ্গে গেল তিশা।

‘ককপিটে গিয়ে রেডিয়োতে জানিয়ে দিতে পারবে,’ বলল
রানা। ‘বলে দিয়ো তোমার ফিরতে দেরি হবে।’ আরও কী যেন
বলবে, এমন সময় কাঠের ক্রেটগুলোর কাছ থেকে শুনল
গোঙানির আওয়াজ।

ঝট করে ওদিকে ঘুরে গেল রানা ও তিশা।

ক্রেটগুলোর পায়ের কাছে পড়ে আছে সুট পরিহিত ব্রিটিশ
এজেন্ট। দু’হাতে ধরেছে ভাঙা পাঁজরগুলো। এর বুকেই ম্যাগলক
ব্যবহার করেছিল রানা।

ধরাশায়ী লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

জোর করে দম নিতে চেষ্টা করছে লোকটা, মুখের কোণে রক্ত
ও ফেনা।

ঝুঁকে তাকে পরীক্ষা করল রানা। আস্তে করে মাথা নাড়ল।
‘পাঁজরের হাড়গুলো ফুটো করে দিয়েছে ফুসফুস।’ তিশার দিকে
চাইল। ‘একে চেনো?’

‘না চেনার মতই,’ বলল তিশা। ‘জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম এ
লোক আর তার সঙ্গী জেনারেল গ্র্যাঞ্জারকে জিজ্ঞেসাবাদ করছে।
কড়া কোনও ডিসিনিহিবিটিং ড্রাগ দিয়েছিল। জানতে চাইছিল
আমেরিকার ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড। জোর দিয়ে বলছিল
জেনারেল কোড জানেন। নোয়া’য শিপ প্রজেক্ট না কী নিয়ে
যেন...’ কাঁধ ঝাঁকাল তিশা।

‘তাই?’ আস্তে করে বলল রানা। ‘ডিসিনহিবিটিং ড্রাগ?’ ওর চোখ পড়েছে মেঝের একটু দূরে পড়ে থাকা মেডিকেল কিটের উপর। ওখান থেকে খসে পড়েছে কয়েকটা সিরিঞ্জ, নিডল ও সেরামের বোতল। সেরামের একটা বোতল তুলে নিয়ে লেবেলটা পড়ল রানা। মারাত্মক আহত লোকটার দিকে আবারও চাইল। ‘ঠিক আছে, দেখা যাক নিজেদের আনা জিনিস ওর কেমন লাগে।’

ক্রেটের পাশে লোকটাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল রানা।

তখনই ককপিট থেকে ফিরল কুয়াশা।

গুণ্ডিয়ে চলেছে সুট পরা ব্রিটিশ এজেন্ট।

তার আস্তিন গুটিয়ে দিয়ে শিরার ভিতর দুই শ’ মিলিগ্রাম ইএ-৬২৭ ইনজেক্ট করল রানা।

পাশে এসে থামল কুয়াশা। ‘ট্যাঙ্কার থেকে সরে গেছি। আপাতত অটো-পাইলটে চলছে বিমান। আগের কোর্স অনুসরণ করছি। ফ্রান্সের উপকূলে ব্রিটানির প্রাইভেট এক এয়ারফিল্ডে নামব। এইমাত্র যোগাযোগ করেছিল রঘুপতি। লণ্ডনের চল্লিশ মাইল দূরে পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে তোমার দু’জনকে নামিয়ে দেবে ও।’

‘গুড।’ রানা ভাবছে এরপর কী করবে নিশাত ও খবির। ওদেরকে যেতে হবে লণ্ডনে, মোসাদের হেডকোয়ার্টারে।

বন্দি ব্রিটিশ এজেন্টের দিকে মনোযোগ দিল রানা।

বারকয়েক আপত্তি তুলতে চাইল লোকটা, কিন্তু মুখের লাগাম খুলে দিয়েছে ডিসিনহিবিটিং ড্রাগ।

তার নাম জেমস ব্রিক, এমআই-৬-এর সদস্য।

‘এই যে বাউন্টি হান্ট, এটা সম্পর্কে তুমি কী জানো?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘প্রতিটি মাথার জন্য দেবে তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার। সতেরোটা

মাথা। আগামীকাল নিউ ইয়র্ক সময় দুপুর বারোটোর আগে সবাইকে শেষ করতে হবে।’

‘কারা এত টাকা দিচ্ছে?’

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল এজেন্ট। আপত্তি আছে বলতে, কিন্তু ড্রাগের কারণে কয়েক সেকেণ্ড পর বাধ্য হয়ে মুখ খুলল, ‘তাদের অনেক নাম। হাইডেলবার্গ গ্রুপ... নিউ ইয়র্ক গ্রুপ... স্টার কাউন্সিল... ম্যাজেস্টিক-১২... এম-১২... এরা দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এরাই চালায় বিশ্ব। এদের কথায় কান ধরে ওঠবস করে সরকার। দরকার পড়লে যে-কোনও দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভাঙে। যা চায়, তাই করতে পারে এরা। যদি...’

থেমে গেছে লোকটা।

রানা টের পেল, শিরিশ কাগজের মত শুকিয়ে গেছে ওর গলা।

‘খুলে বলো,’ নিচু স্বরে বলল কুয়াশা।

‘তাদের নামগুলো বলো,’ তাড়া দিল রানা।

‘তাদের নাম জানি না,’ বলল ব্রিক। ‘খোঁজ নেয়া আমার কাজ নয়। আমি বিশেষজ্ঞ আমেরিকান মিলিটারি বিষয়ে। শুধু জানি ম্যাজেস্টিক-১২ আছে। তারাই আয়োজন করেছে বাউন্টি হান্ট।’

‘বুঝলাম। এবার বলো এই বাউন্টি হান্ট সফল হলে তাদের কী লাভ।’

‘জানি না,’ মাথা নাড়ল ব্রিক। ‘আমার কাজ ছিল জেনারেল গ্র্যাঞ্জারের মুখ থেকে ইউনিভার্সাল ডিসআর্ম কোড জেনে নেয়া। ওই কোড তুলে দেয়ার কথা ছিল বাউন্টি হান্টার হেডিকের হাতে। ওটা দিয়ে ম্যাজেস্টিক-১২ কী করবে, আমি জানি না।’

‘তার মানে এমআই-৬ সবই জানে?’

‘রিচার্ড কে. ডওসন। তার কাছ থেকে ভিতরের খবর জানতে

পারবেন। ম্যাজেস্টিক-১২ সম্পর্কে বা বাউন্টি হান্ট সম্পর্কে সবই তার জানা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এমআই-৬ জানে না সে এখন কোথায়। দু'দিন আগে হারিয়ে গেছে। নোয়া'য শিপ বা লিয়ার্ড প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাইলে খুঁজে বের করুন তাকে।'

'রিচার্ড কে. ডওসন,' বিড়বিড় করল রানা। নামের লিস্ট বের করে পড়ল: ডসন, রিচার্ড কে. ইউকে, এমআই-৬।

'নিশ্চয়ই নিজের কাভার হারিয়েছে লোকটা,' বলল রানা। 'নইলে তার নাম এই লিস্টে তুলত না ম্যাজেস্টিক-১২।'

নতুন আঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইল রানা। 'নোয়া'য শিপ বা লিয়ার্ড প্রজেক্ট সম্পর্কে জেনারেল গ্র্যাঞ্জারের কাছ থেকে কী জানতে চাইছিলে?'

ভুরু কোঁচকাল ব্রিক। ড্রাগের বিরুদ্ধে লড়ছে। কিন্তু মুখ খুলল: 'নোয়াজ শিপ ইউএস নেভির প্রজেক্ট। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নেভি বেশকিছু রণতরীকে ছদ্মবেশে ভিড়িয়ে দিয়েছিল কমার্শিয়াল ফ্রেইটারগুলোর বহরে। তাদের একটা জাহাজের নাম ছিল নোয়া'য শিপ। এখন ওই একই কাজ করছে ইউএস নেভি। ছদ্মবেশী রণতরী রাখছে দুনিয়ার জরুরি সব জায়গায়। দরকার পড়লে যখন তখন হামলা করবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করে। অথচ, জাহাজ দেখলে যে-কেউ ভাববে, ওগুলো সাধারণ মালবাহী জাহাজ বা সুপারট্যাঙ্কার।'

'সত্যি কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে আমেরিকা?' আনমনে বলল তিশা।

'ঠিক আছে, নোয়া'য শিপ বিষয়ে জানলাম,' বলল রানা। 'এবার বলো লিয়ার্ড প্রজেক্ট কী।'

'জানি না।'

'সত্যি কথা বলো, নইলে ড্রাগের ডোজ বাড়াতে বাধ্য হব।'

গুণ্ডিয়ে উঠল জেমস ব্রিক। ‘শুধু জানি, নোয়া’য শিপ প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত লিয়ার্ড প্রজেক্ট। ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা আছে এসবের পিছনে। জানি না তা কী। ওটার জন্যে হাইয়েস্ট ইউএস সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশন দেয়া হয়েছে।’

ভুরু কুঁচকে উঠেছে রানার, ভাবছে।

জট ছাড়াতে পারছে না কিছুরই। ওর কাছে রয়েছে সামান্য কয়েকটা জিগস’র টুকরো। সবই প্রকাণ্ড কোনও জিগস পায়েলের অংশ। এক এক করে টুকরোগুলো ঠিক জায়গায় বসাতে পারলে ফুটে উঠবে পুরো দৃশ্য। তখন বোঝা যাবে সবই।

‘কে এসব জানে, মিস্টার ব্রিক?’ বলল রানা, ‘কার কাছ থেকে ইউএস মিলিটারির তথ্যগুলো পাচ্ছে এমআই-সিক্স?’

‘মোসাদের কাছ থেকে,’ ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রিক। ‘লগনের ক্যানারি ওয়ার্ফে ফিল্ড অফিস খুলেছে ওরা। গত মাসে কয়েকদিনের জন্যে ওদের অফিসে ছারপোকা রাখতে পেরেছিলাম আমরা। বিশ্বাস করুন, এম-১২, নোয়া’য শিপ, লিয়ার্ড প্রজেক্ট বা আপনার ওই লিস্টের সবই জানে মোসাদ। কেন আপনাদেরকে শেষ করে দেয়া হচ্ছে, তাও জানে। শুধু তাই নয়, আরও একটা বিষয় ওরা জানে।’

‘সেটা কী?’ জানতে চাইল রানা।

‘মোসাদ জানে অক্টোবরের পনেরো তারিখে কী ঘটাবে ম্যাজিস্টিক-১২।’

সতেরো

কুইন্স টাওয়ার ।

ক্যানারি ওয়ার্ফ, লণ্ডন ।

অক্টোবর, ১৪ ।

স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটা ।

চল্লিশতলা কুইন্স টাওয়ারের গা বেয়ে অত্যন্ত দ্রুতগামী একটি কাঁচমোড়া এলিভেটরে চেপে সাঁই-সাঁই করে উঠছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা ও সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির ।

একটু দূরে কাদাটে, মন্তরগতি টেম্‌স্‌, মস্ত কোনও অজগরের মত গা মুচড়ে হারিয়ে গেছে দূরের বঁকে । চার দিগন্তে পুরনো লণ্ডন, অবশ্য এ মুহূর্তে কিছুই দেখা যাচ্ছে না । বামবাম বৃষ্টির ধূসর পর্দা লুকিয়ে রেখেছে সব ।

প্রাচীন শহর লণ্ডনকে কাঁচকলা দেখাতেই যেন জন্ম নিয়েছে ক্যানারি ওয়ার্ফ— পরিষ্কার, বাকমকে স্টিল ও কাঁচের তৈরি মস্ত সব দালান । বিয়নেস ডিসট্রিক্ট । আকাশের বুকে খোঁচা দিচ্ছে অসংখ্য স্কাইস্ক্র্যাপার । মাঝে মাঝে ম্যানিকিউর করা পার্ক । একটু দূরে ব্রিটেনের সবচেয়ে উঁচু দালান: অপূর্ব সুন্দর ক্যানারি ওয়ার্ফ টাওয়ার । লণ্ডনের এদিকটা যেন আগামী কোনও শতকের জন্য প্রস্তুত ।

ধূসর আকাশ পাশ কাটিয়ে উঠছে নিশাত ও খবিরের লিফট । কুইন্স টাওয়ারে যাত্রীদেরকে নিয়ে ওঠা-নামা করছে আরও চারটে

লিফট— একেকটা দ্রুতগামী কাঁচের বাস যেন।

নিশাত-খবিরের পরনে সাধারণ পোশাক: সুয়েড জ্যাকেট, নীল ডেনিম জিন্স, টার্টলনেক জাম্পার। শেষের জিনিসটার কল্যাণে ঢাকা পড়েছে থ্রোট মাইক। পায়ে শক্তপোক্ত বুট। কোমরের পিছনে .৪৫ ক্যালিবারের কোল্ট রিভলভার।

ওদের লিফটে উঠেছে চমৎকার কাটের সুট পরা সুন্দরী এক এগযেকিউটিভ তরুণী। চওড়া কাঁধের দানবীয় নিশাতের পাশে যেন বামন হয়ে গেছে সে।

বড় করে শ্বাস নিল নিশাত, আন্তে টোকা দিল মেয়েটির কাঁধে। ‘তোমার পারফিউম সত্যিই ভাল। জিনিসটার নাম কী?’

‘লেডি’স চয়েস,’ বলল তরুণী।

‘আমিও একটা কিনব,’ আন্তরিক হাসল নিশাত।

আজ রাশান যুদ্ধ-বিমানে অ্যাকটিভ স্টেলথ চালু রেখে ব্রিটিশ এয়ারস্পেসে ঢুকে পড়েছিল রঘুপতি, ওদেরকে নামিয়ে দিয়েছে লগুনের বাইরের এক পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে। ওখানে প্রায় ধসে পড়া এক দালানে উঠেছিল ওরা। দেরি না করে দাঁড় করিয়েছে খসড়া পরিকল্পনা। এরপর যোগাযোগ করেছে রানা এজেন্সির শাখা প্রধান রাজিব আহসানের সঙ্গে। সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে চার্টার হেলিকপ্টারের। আর আজই সোয়া তিনটের সময় বাঙালি পাইলট ওদেরকে নামিয়ে দিয়েছে ক্যানারি ওয়ার্ফের কমার্শিয়াল হেলিপোর্টে।

পিং! আওয়াজ তুলল এলিভেটোরের স্পিকার। আটত্রিশতলার মেঝের সঙ্গে মিশে গেছে ওটার মেঝে। খুলে গেল দরজা।

প্রকাণ্ড রিসেপশন এরিয়ায় বেরিয়ে এল নিশাত ও খবির।

ইলেকট্রনিকাল বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে:

সিলভারম্যান, নিউটন অ্যাণ্ড যেমির— লইয়ার্স ফার্ম।

মস্ত দালানের উপরের তিনতলা জুড়ে প্রতিষ্ঠানটি। আটত্রিশ,

উনচল্লিশ ও চল্লিশ তলা ভাড়া নিয়েছে তারা ।

অন্য সব বড় শহরের নামকরা ল ফার্মের অফিসের রিসেপশন এরিয়ার মতই এ অফিস । অত্যন্ত দামি প্রতিটি আসবাবপত্র । প্রচুর জায়গা ছাড়া হয়েছে মস্ত অফিসে । কাঁচের ওদিকে অনেক নীচে লগুন ।

সাধারণ মানুষ এ অফিসে টুঁ দিলে বুঝবে না সিলভারম্যান, নিউটন অ্যাণ্ড যেমির লইয়ার্স ফার্ম আসলে একেবারেই ভিন্ন কাজে ব্যস্ত ।

তাদের মূল কাজটি আইনী সহায়তা দেয়া নয় ।

এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে অসংখ্য অফিস বা মিটিং রুম, কিন্তু উনচল্লিশ তলার তিনটে অফিসে ভুলেও প্রবেশ করেন না উকিল সায়েবরা ।

ওই তিনটে কামরা ইজরায়েলি সিক্রেট সার্ভিসের ।

আন্তর্জাতিক সিক্রেট সার্ভিসগুলোর এজেন্টদের ভিতর চালু হয়ে গেছে একটা কথা: বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সংগঠন হচ্ছে মোসাদ ।

তারাই নানান হামলা থেকে রক্ষা করছে ইজরায়েল রাষ্ট্রকে ।

সেজন্য প্রতিটি দেশে নিজেদের লোক রেখেছে । সবার আগে তাদের কানে পৌঁছে যায় আন্তর্জাতিক সমস্ত তথ্য ।

একটা চিন্তা থেকেই কাজ করে ওই সংগঠনের সবাই ।

প্রথম কথা: রক্ষা করতে হবে ইজরায়েলী স্বার্থ ।

দ্বিতীয় কথা: রক্ষা করতে হবে ইজরায়েলী স্বার্থ ।

শেষ কথা: রক্ষা করতে হবে ইজরায়েলী স্বার্থ ।

এর বাইরে কিছু ভাববার দরকার নেই ।

প্রয়োজন পড়লে শেষ করে দাও যে-কাউকে ।

‘আমি কোনও সাহায্যে আসতে পারি?’ নিশাতের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল রিসেপশনিস্ট ।

‘পারেন,’ বলল নিশাত, ‘আমরা এসেছি ডেনিস ই. ম্যাকিনের সঙ্গে আলাপ করতে।’

‘দুঃখিত, কিন্তু ওই নামের কেউ তো এই অফিসে কাজ করেন না।’

‘তা হলে চেয়ারম্যান বা তাঁর পার্টনারদের জানান, ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা এবং সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির এসেছে,’ দ্বিধা না করেই বলল খবির। ‘আরও বলবেন, আমরা এসেছি মেজর ম্যাকিনের সঙ্গে দেখা করতে। মেজর মাসুদ রানার তরফ থেকে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। আরও ভাল হয় বললে, বিসিআই-এর মাসুদ রানা দু’জনকে পাঠিয়েছেন।’

‘সত্যিই দুঃখিত, স্যর, কিন্তু...’

কথার মাঝে থেমে গেল মেয়েটি, এইমাত্র বেজে উঠেছে রিসেপশনিস্টের ফোন। রিসিভার তুলে নিল সে, কয়েক মুহূর্ত শুনে খবিরের দিকে চাইল। ‘আপনাদেরকে নিয়ে যেতে লোক পাঠাচ্ছেন চেয়ারম্যান। একটু অপেক্ষা করুন।’

একমিনিট পর দূরের একটা দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল চমৎকার সুট পরা এক ভদ্রলোক। নিশাত ও খবির লক্ষ্য করল, তার সুটের নীচে ফুলে আছে উষি সাবমেশিনগান।

পিং! আওয়াজ শুনল ওরা।

এইমাত্র থেমেছে একটা এলিভেটর।

তারপর আরেকটা।

ভুরু কুঁচকে ফেলল খবির, ঘুরে চাইল।

ওই একইসময়ে খুলতে লাগল এলিভেটরের দুই দরজা।

পরক্ষণে হুড়মুড় করে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল কমপক্ষে দশজন লোক। প্রত্যেকে সশস্ত্র। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে কন্টিনেন্টাল সোলজার ৬৬ ইউনিটের নেতা ডেভিড এন. হেঞ্জিক।

‘যাহ্ শালা!’ বিড়বিড় করল খবির।

কালো পোশাকে একেকজনকে ওর মনে হলো সাক্ষাত যম ।

হাতে মেটালস্টর্ম রাইফেল ।

পরক্ষণে মাযলগুলোর মুখে বলসে উঠল কমলা আগুন ।

তার এক সেকেণ্ড আগে রিসেপশন ডেস্কের ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিশাত ও খবির । চারপাশ ঝাঁঝরা হলো 'হাইপার মেশিনগানের' গুলিতে । জোরালো ঝিরঝির আওয়াজ তুলছে অস্ত্রগুলো ।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা চৌকশ পোশাকের লোকটা কিমা হয়ে গেল শতখানেক গুলি খেয়ে । ছিটকে গেল মেঝের একদিকে । কপালে একটিমাত্র গুলি নিয়ে শুয়ে পড়ল সুন্দরী ইজরায়েলি রিসেপশনিস্ট ।

ঝড়ের গতিতে সামনে বাড়ছে ডেভিড এন. হেঞ্জিকের দলের সবাই । অবশ্য রয়ে গেছে তাদের একজন । এইমাত্র রিসেপশন ডেস্কের ওদিকে লাফিয়ে পড়া সিভিলিয়ান দু'জনকে শেষ করবে সে ।

সময় নষ্ট না করে কাউন্টার ঘুরে ওদিকে গেল লোকটা ।

আর তখনই গর্জে উঠল দুটো অস্ত্র ।

নাকে বাড়তি দুটো ফুটো নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বাউন্টি হান্টার । ধোঁয়া বেরুনো রিভলভার হাতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নিশাত ও খবির ।

'ওরা ম্যাকিনের জন্যে এসেছে,' চাপা স্বরে বলল নিশাত ।
'এসো, খবির!'

ওরা যেন অনুসরণ করছে ভয়ঙ্কর কোনও টর্নেডোর গতিপথ ।

মেইন অফিস এরিয়ায় পৌঁছে গেল ।

ডেস্কগুলোর উপর মুখ খুবড়ে পড়ে আছে সুট পরিহিত পুরুষ ও মহিলা আইনজীবীরা । সারাদেহে রক্তাক্ত সব গর্ত । ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ওঅর্ক স্টেশনগুলো ।

ঝড়ের গতিতে ওপেন-প্ল্যান অফিস পেরিয়ে গেল হেণ্ডিকের দল। ঝরঝর করে ভেঙে পড়ছে সামনের সমস্ত কাঁচ। বিস্ফোরিত হচ্ছে কমপিউটার মনিটর। বিশ্রী আওয়াজ তুলছে মেটালস্টর্ম মেশিনগান।

দূরে জ্যাকেটের তলা থেকে উষি বের করল এক সিকিউরিটি গার্ড— কিন্তু ওই পর্যন্তই, হাইপারভেলোসিটি মেটালস্টর্ম বুলেট ঝাঁঝরা করে দিল তাকেও।

বাঁক নেয়া অপূর্ব সুন্দর এক ইন্টারনাল স্টেয়ারকেস বেয়ে উনচল্লিশ তলা লক্ষ্য করে ঝড়ের বেগে উঠছে বাউন্টি হাণ্টাররা।

তাদের পিছনে ছুটতে শুরু করল নিশাত ও খবির।

কয়েক মুহূর্ত পর উঠে এল স্টেয়ারকেসের উপর অংশে। ওখান থেকে দেখল, দলের অন্যদের কাছ থেকে সরে গেল তিন বাউন্টি হাণ্টার, ঢুকে পড়ল ইন্টারোগেশন রুমে। তাদের গুলি শেষ করে দিল দুই সিনিয়র মোসাদ এজেন্টকে। তৃতীয়জনকে খুন করল না, তাকে হেঁচড়ে নিয়ে বেরিয়ে এল। দূর থেকে যুবককে ডেনিস ই. ম্যাকিন বলেই ধারণা করল নিশাত ও খবির। সুদর্শন, বয়স হবে পঁচিশ। শার্টের উপরের দুটো বোতাম খোলা। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

দেরি না করে সামনে বাড়ল নিশাত ও খবির। শেষ কয়েকটি ধাপ পেরিয়েই গুলি করল তিন বাউন্টি হাণ্টারকে লক্ষ্য করে। কাঁচির দুই ফলার মত নিখুঁতভাবে কাজ করছে ওরা। খবিরের গুলিতে শুয়ে পড়ল বামদিকের লোকটা। ডানদিকের লোকটা মরল নিশাতের বুলেটে। পরক্ষণে ওদের দু'জনের গুলিতে আত্মা খাঁচাছাড়া হলো তৃতীয় লোকটার।

ধপ্ করে মেঝের উপর পড়ল ম্যাকিন।

এক দৌড়ে তার দু'পাশে পৌঁছে গেল নিশাত ও খবির, টেনে তুলে বসিয়ে দিল ইজরায়েলি এজেন্টকে।

‘আপনি ম্যাকিন?’ জানতে চাইল নিশাত, ‘ডেনিস ই. ম্যাকিন?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু...’

‘আমরা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। বিসিআই-এর মেজর মাসুদ রানা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।’

এক সেকেণ্ড পর পরিচিতির ছাপ পড়ল যুবকের চোখে। ‘বিসিআই-এর মাসুদ রানা... ওই লিস্টের...’

বুম!

এক বাউন্টি হান্টার একটু দূরের অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই গুলি করেছে খবির।

‘আপা! কথা বলার সময় নেই এখন!’

‘ঠিক! ছুটবার ফাঁকে কথা চলুক!’ টান দিয়ে ম্যাকিনকে দাঁড় করিয়ে দিল নিশাত। ‘সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন! জলদি!’

ওরা তিনজন দৌড়ে পৌঁছে গেল স্টেয়ারকেসে, ঝড়ের গতিতে উঠতে লাগল উপরতলা লক্ষ্য করে। পাশে পড়ল দেয়ালে বসানো চমৎকার এক সেট পিকচার উইণ্ডো। অনেক নীচে লগুন। কিন্তু অন্য দৃশ্য দেখেছে নিশাত ও খবির। আকাশ চিরে হাজির হয়েছে অশুভ চেহারার একটা অ্যাসল্ট হেলিকপ্টার। দালানের বাইরে পজিশন নিচ্ছে। ওই কপ্টারের পাইলট এবং অন্য এক লোক চেয়ে আছে নিশাত, খবির ও ম্যাকিনের দিকে।

ব্রিটিশ মিলিটারির হিউ গানশিপের মতই একই জিনিস ওই হেলিকপ্টার— লিঙ্কস। পাশে টো মিসাইল ও ছয় ব্যারেলের মিনিগান।

‘দৌড়ে ওঠো!’ ম্যাকিন-খবিরকে তাড়া দিল নিশাত। ‘ওঠো! ওঠো! ওঠো! জলদি!’

গুলি শুরু করেছে লিঙ্কস।

ঝরঝর করে ভেঙে পড়ল পিকচার উইণ্ডোর কাঁচ। বেঁকে

নেমে যাওয়া স্টেয়ারকেস ধসে গেল কপ্টারের গুলির আঘাতে।
নড়বড় করেছে সিঁড়ির ধাপগুলো। চারপাশে এক পশলা বৃষ্টির মত
বয়ে গেল ভাঙা কাঁচের ঝড়। নিশাত ও খবির দু'পাশ থেকে খপ্প
করে ধরল ম্যাকিনকে, তাকে মাঝে রেখে তুমুল গতিতে উঠতে
লাগল। গুলির তোড়ে খসে পড়ল নীচের কয়েকটা ধাপ।
চল্লিশতলায় পৌঁছে গেল ওরা, ডাইভ দিয়ে পড়ল মেঝেতে। এক
সেকেণ্ডে দেরি করলে ওদেরকে নিয়ে নীচে রওনা হতো ভাঙা
সিঁড়ি।

উনচল্লিশ তলা অফিসের ক্ষয়-ক্ষতির ভিতর হাঁটছে ডেভিড এন.
হেঞ্জিক, হেডসেট রেডিয়োতে মন দিয়ে শুনছে দলের সবার
রিপোর্ট।

‘দিস ইয় এয়ারবোর্ন ওয়ান। ওরা চল্লিশতলায়। পরনে
সাধারণ পোশাক। কোনও ভুল না হলে ম্যাকিন ওদের সঙ্গে।’

‘এয়ারবোর্ন টু। হাতে ল্যাণ্ড করছি, নামিয়ে দেব দ্বিতীয়
ইউনিটকে।’

‘দিস ইয় এয়ারবোর্ন থ্রি। আমরা উত্তর-পূর্বে। পৌঁছব
চল্লিশ...’

‘টেকনিকাল টিম। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সব এলিভেটর।
আটত্রিশ তলায় আটকা পড়েছে চারটে এলিভেটর। এখন আর
কেউ ওগুলোতে করে...’

‘বয়েজ,’ বলল হেঞ্জিক। ‘ওই দুই পিঁপড়েকে শেষ করো।
ধরে আনো ম্যাকিনকে।’

দূরে জোরালো গুঞ্জন তুলছে বাউন্টি হান্টারদের তিন লিফ্‌স
কপ্টার। কয়েক মুহূর্ত পর ওগুলো পৌঁছে গেল কুইন্স টাওয়ারের
উপর। যেন বিরক্তি ধরিয়ে দেয়া নীল মাছি, নামবে কারও আম-
দই-কলা মাখা খাবারের পাতে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর ছাতে নামল একটা কপ্টার। অন্যদুটো চক্রর কাটতে থাকল সবচেয়ে উপরের তিনতলা অফিস ঘিরে। উঁকি দিচ্ছে প্রতিটি অফিসের জানালায়।

একের পর এক জানালা বিস্ফোরিত হবার আওয়াজ পেয়েছে অনেকেই। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ যোগাযোগ করেছে পুলিশের সঙ্গে।

চল্লিশতম ফ্লোরের হলওয়ে ধরে ছুটে চলেছে নিশাত ও খবির, নিজেদের মাঝে প্রায় বয়ে নিয়ে চলেছে ম্যাকিনকে।

‘আমাদেরকে জানান,’ ছুটতে ছুটতে বলল নিশাত, ‘ওই তালিকা... আপনি বা মাসুদ রানা ওই তালিকার ভেতর কেন?’

ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে এজেন্ট। ‘ম্যাজেস্টিক... ম্যাজেস্টিক-১২। ওখানে তুলে দিয়েছে আমাদের নাম। আমি লিস্টে আছি কারণ, জেনে ফেলেছি কারা ম্যাজেস্টিক-১২-র সদস্য। ওরা ওদের পরিকল্পনা গুছিয়ে নেয়ার আগেই হয়তো ওদেরকে ধরিয়ে দিতে পারি।’

‘আর মাসুদ রানা?’ জানতে চাইল নিশাত।

‘তাকে শেষ করতে চায় অন্য কারণে। অত্যন্ত গিফটেড লোক রানা। তালিকার পনেরোজনের একজন। ইচ্ছা করলেই পাশ করবে সি স্নেক টেস্ট। পৃথিবীতে মাত্র নয়জন ডিসআর্ম করতে পারবে টাচলক-৯। ওটা ব্যবহার করা হয় লিয়ার্ড মিসাইল সিকিউরিটি সিস্টেমে...’

কথা শেষ করতে পারল না ম্যাকিন, ওদের ডানদিকে দড়াম করে খুলে গেল ফায়ার ডোর, ছিটকে বেরিয়ে এল চারজন ৬৬ ইউনিটের লোক— হাতে মেটালস্টর্ম রাইফেল, জ্বলজ্বল করছে সবুজ লেসার সাইট।

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাবার সময় পেল না খবির ও ম্যাকিন,

কিছু সতর্ক ছিল নিশাত— দু'জনকে ঠেলে পার করিয়ে দিল একটা বাঁক। নিজেও থামল না, ঝেড়ে দৌড় দিল দীর্ঘ আরেক হলওয়ে ধরে। পিছনে ধেয়ে এল হাইপারমেশিনগানের শত শত গুলি।

উত্তরদিকের করিডোর ধরে ছুটছে খবির ও ম্যাকিন। পিছন থেকে গুলি খেয়ে যখন তখন পাখির মত মরবে। বামদিকে ছোট একটা অফিস দেখে ম্যাকিনকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল খবির।

এই অফিস কানা গলির মত।

‘দুশশালা!’ কপালকে দোষ দিল খবির। এক দৌড়ে পৌঁছে গেল জানালার সামনে। ওর মনে হলো, নাকের সামনে দিয়ে গেল একটা লিঙ্কস হেলিকপ্টার।

তখনই দরজার বুকে বসানো কাঁচের ওপাশের দৃশ্য দেখল খবির। আবারও চাইল জানালার দিকে।

যে চার বাউন্টি হাণ্টার বেরিয়ে এসেছিল ফায়ার স্টেয়ারওয়েল থেকে, তারা এখন দুই ভাগে ভাগ হয়েছে— একদল আসছে ওদেরকে শেষ করতে। অন্য দু'জন গেছে নিশাতের ব্যবস্থা নিতে।

খবির ও ম্যাকিনকে করিডোর পেরিয়ে বিশ গজ দূরের অফিসে ঢুকতে দেখেছে প্রথম দলের দুই কমাণ্ডো। সাবধানে, নিঃশব্দে চলল তারা। ৫০০৪ সংখ্যা লেখা দরজার দু'পাশে থামল।

‘টেকনিকাল টিম, ডলার ফাইভ বলছি,’ হেডসেটে ফিসফিস করল বয়স্ক কমাণ্ডো। ‘ফ্লোর স্কেম্যাটিক চাই। অফিস নাম্বার ৫০০৪।’

সঙ্গে সঙ্গে এল জবাব: ‘কানাগলি ওটা, ডলার ফাইভ। ওদের আর কোথাও যাওয়ার নেই।’

উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রুপারকে ইশারা করল বয়স্ক

কমাণ্ডো ।

জবাবে ভিড়িয়ে রাখা দরজায় বেদম এক লাথি বসাল তরুণ কমাণ্ডো । গর্জে উঠল হাতের মেটালস্টর্ম রাইফেল ।

কিন্তু বাঁঝরা হলো না কেউ ।

অফিস পুরো ফাঁকা ।

মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত জানালার দামি কাঁচ আগেই ভেঙে পড়েছে । ঝিরঝির করে মেঝেতে নামছে লগুনের বৃষ্টির ফোঁটা ।

কোথাও নেই খবির ।

উধাও হয়েছে ম্যাকিন ।

৬৬ ইউনিটের দুই কমাণ্ডো লাফিয়ে গিয়ে ঢুকল অফিসে, দ্রুত পায়ে পৌঁছে গেল কাঁচ ভাঙা জানালার সামনে । নীচে চাইল ।

দেখবার কিছুই নেই ।

নীচে নেমে গেছে টাওয়ারের কাঁচের দেয়াল ।

সামান্য দূরে পার্ক, চকচক করছে বৃষ্টিস্নাত সবুজ ঘাসগুলো ।

এবার উপরে চোখ গেল দুই বাউন্টি হান্টারের । শুনতেও পেল সর-সর আওয়াজ । উইণ্ডো ওয়াশার্স প্ল্যাটফর্মের নীচের অংশ এইমাত্র পেরিয়ে গেল এই তলা । কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছুবে ছাতে ।

উইণ্ডো ওয়াশার্স প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে খবির ও ম্যাকিন, কুইন্স টাওয়ারের গা বেয়ে উঠছে ।

শক্তপোক্ত দুই উইন্ডো-ক্রেনের সাহায্যে ঝুলছে আয়তাকার প্ল্যাটফর্ম । ছাত থেকে কয়েক ফুট বেরিয়ে এসেছে ক্রেনের দুই বাহু ।

দুই আততায়ী বাউন্টি হান্টার অফিসে হামলা করবার কয়েক সেকেন্ড আগে নিজেই খবির গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে জানালার কাঁচ । ম্যাকিনকে নিয়ে উঠে পড়েছে ক্যাটওয়াকে ।

প্রথমে কাঁধে ইজরায়েলি এজেন্টকে উঠতে দিয়েছে খবির, তারপর যুবক উপরের প্ল্যাটফর্মে উঠতেই নিজেও উঠে এসেছে ।

ঝট করে সরিয়ে নিয়েছে দুই পা। তখনই অফিসে ঝড়ের গতিতে
ছুকেছে লোকদুটো।

নিশাতের পিছু নিয়ে আসছে হাইপারচার্জড বুলেট। যান্ত্রিক একটা
পা নিয়ে হরিণীর মত ছুটছে বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন, চলেছে
পশ্চিমদিকের হলওয়ে ধরে। পিছু নিয়েছে ৬৬ ইউনিটের দুই
কমাণ্ডো।

কানের পাশ দিয়ে বুলেট বেরিয়ে যেতেই তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে
বামের অফিসে ঢুকল নিশাত।

ও আছে সুসজ্জিত এক বোর্ডরুমের ভিতর।

চকচকে কাঠের মেঝে। চেয়ারগুলো চামড়া দিয়ে মোড়া।
আগে কখনও এত বড় বোর্ডরুম টেবিল দেখেনি নিশাত। দৈর্ঘ্যে
ওটা হবে কমপক্ষে তিরিশ ফুট।

‘শালার ব্যাটারা,’ বিড়বিড় করল নিশাত। ‘কাজ একটাই,
মক্কেলের পকেট ফাঁকা করা!’

দালানের কোণায় এই অফিস। পুরো এক দেয়াল জুড়ে মেঝে
থেকে শুরু করে সিলিং পর্যন্ত একটিমাত্র মস্ত জানালা। বাইরের
দারুণ দৃশ্য দেখলে আটকে আসতে চায় শ্বাস। চোখে পড়ে
পুরনো লগুন। অন্যদিকে দালানের বাইরের এলিভেটর।

নিশাত একটু আগে বুঝেছে, ওর এই কোন্ট রিভলভার দিয়ে
মেটালস্টর্ম রাইফেলের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। কাজেই
দরজার আড়ালে সরে এল ও।

কয়েক সেকেন্ড পর দুডুম আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজা।

টর্নেডোর মত হাজির হলো লোকদুটো।

প্রথম লোকটা ওকে লক্ষ্য করবার আগেই তার মাথার পাশে
গুলি করল নিশাত। অন্য লোকটা ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। দেরি না
করে ট্রিগার টিপে দিল নিশাত। কিন্তু ক্লিক শব্দটা কানের কাছে

হাতুড়ির বাড়ির মত আওয়াজ তুলল।

‘মর্ জ্বালা!’

গুলি শেষ।

রিভলভারের চেম্বারে আছে শুধু গুলির খোসা।

দ্বিতীয় কমাণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে নামল নিশাত, দু’জন ছিটকে পড়ল বোর্ডরুম টেবিলের চকচকে পিঠে।

নানাদিকে গেল লোকটার হাতের মেটালস্টর্ম রাইফেলের গুলি।

মেঝে ও সিলিং পর্যন্ত কাঁচের জানালা, তার বুকে লাগল শ’ খানেক বুলেট। তৈরি হলো অসংখ্য মাকড়সার জাল।

বোর্ডরুম টেবিলের উপর হামলকারীর বিরুদ্ধে লড়তে চাইল নিশাত। লোকটা বিশালদেহী, শক্তিশালী। কোমরের খাপ থেকে বের করেছে ছোরা। ওই একই কাজ করেছে নিশাতও, দু’জনের ছোরা টক্কর দিতেই ঠন্‌ আওয়াজ উঠল।

লড়বার ফাঁকে চোখের কোণে দরজা দেখল নিশাত। ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে দুই লোক।

কিন্তু তারা ৬৬ ইউনিটের কেউ নয়।

দামি সুট পরা দুই ইজরায়েলি, কাঁধ থেকে বুলছে উষি সাবমেশিনগান। শার্টের বুকে রক্তের ছাপ।

মোসাদের সিকিউরিটি গার্ড।

দুই ইজরায়েলি দেখছে বোর্ডরুমের টেবিলের উপর লড়ছে দু’জন।

‘শালার বাউন্টি হান্টার!’ মেঝেতে থুতু ফেলল ডানদিকের লোকটা।

‘চলে এসো!’ বলল অন্যজন, আবারও ফিরল হলওয়েতে।
‘ওরা আসছে!’

প্রথম গার্ড টিটকারির হাসি নিয়ে লড়াইরত নিশাত ও প্রকাণ্ড

লোকটাকে দেখল। পকেট থেকে বের করল হাই-পাওয়ার্ড আরডিএক্স গ্ৰেনেড। খুলে ফেলল ক্যাপ, ছোট আনারসটা ছুঁড়ে ফেলল বোর্ডরুমের ভিতর। পরের সেকেন্ডে উধাও হলো দুই ইজরায়েলি গার্ড।

হামলাকারীর বিরুদ্ধে লড়বার ফাঁকে নিশাত দেখেছে, উড়ে এসেছে গ্ৰেনেড। হঠাৎ করেই ওটার গতি যেন ধীর হয়ে উঠল। মাত্র একবার মেঝেতে কপাল ঠুকল, পরক্ষণে অদৃশ্য হলো প্রকাণ্ড টেবিলের নীচে।

খটাৎ আওয়াজ পেল নিশাত।

এইমাত্র মস্ত টেবিলের গাছের গুঁড়ির মত মোটা এক পায়ার গায়ে লেগেছে গ্ৰেনেড। পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো বোমা।

এর প্রতিক্রিয়া হলো ভয়ঙ্কর।

টেবিলের এক অংশ উড়ে গেল করিডোরের দিকে। চারপাশে ছিটকে গেল হাজার হাজার কাঠের কুচি।

টেবিলের অন্য অংশ এখনও কমপক্ষে পঁচিশ ফুট দৈর্ঘ্যের, ভিন্ন পরিণতি হলো ওটার ভাগ্যে।

গ্ৰেনেডের কনক্যাশন ফোর্স মেঝে থেকে শূন্যে তুলে ফেলল অত বড় টেবিল, ছুটে যাওয়া রেলগাড়ির বগির মত রওনা হয়ে গেল। গতি প্রচণ্ড, দেখতে না দেখতে পেরোল বোর্ডরুম, বুলেটের মত গিয়ে লাগল ঘরের পশ্চিমের জানালায়।

এক সেকেন্ডে আগেই নিশাত বুঝেছে এরপর কী ঘটবে।

সুসজ্জিত, আরামদায়ক বোর্ডরুমের ফাটা কাঁচের জানালা বিস্ফোরিত করে ব্যাটারিং রুমের মত বেরিয়ে গেল টেবিল চল্লিশতলা উঁচু আকাশে।

ভীষণ হোঁচট খেল ওটা।

হঠাৎ নিশাত টের পেল, পিছলে পড়ছে। মুখে ঝরঝর করে নামছে বৃষ্টির শীতল জল।

চার শ' ফুট নীচে রাস্তা!

দৃশ্যটা অদ্ভুত। টাওয়ারের উপরের তলা থেকে গলা বের করেছে মস্ত টেবিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য, তারপর হঠাৎ করেই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে ঝুঁকে রওনা হয়ে গেল নীচে!

অবশ্য, এ পতন পলকের জন্য।

টেবিলের উপরাংশ গিয়ে বাধল সিলিঙে, এদিকে মেঝের কিনারায় আটকা পড়ল পুরু দুই পায়া। ফলে হঠাৎ করেই আবারও ঝাঁকি খেয়ে থামল টেবিল, ঝুলছে উঁচু দালানের সবচেয়ে উঁচু তলা থেকে।

সরসর করে পিছলে পড়ছে নিশাত, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে টেবিলের বুকে ঘঁষাচ করে বিঁধিয়ে দিল ছোরা। হাতলের তামার ফিঙ্গারহোল্ডে চেপে বসল দুই হাত। প্রায় খাড়া টেবিলের শেষে ঝুলছে ওর দুই পা।

নিশাতের হামলাকারী অত দ্রুত নড়তে পারেনি। ঝট করে টেবিলের দু'পাশ ধরতে গিয়ে ফেলে দিয়েছে ছোরা। কিন্তু কপাল মন্দ, ধরা হয়নি কিছুই। অবশ্য ভাগ্য তার ভাল, সে ছিল উপরে। ঝরা পাতার মত নেমে এল নিশাতের ছোরার উপর বুট রেখে। বন্ধ হলো তার পতন।

নিশাতের কজির উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে।

ব্যথায় ছিঁড়ে যেতে চাইল নিশাতের হাত। মুখ তুলে চাইল। উপর থেকে চেয়ে আছে লোকটা, হাসছে বত্রিশ দাঁত বের করে!

টেবিলের দু' পাশ ধরে ফেলেছে ব্যাটা, এবার নিশাতের কজির উপর লাথি মারতে লাগল।

দাঁতে দাঁত খিঁচে টিকে থাকতে চাইল নিশাত। একের পর এক লাথি পড়ছে কজির উপর। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল মুখ। কখনও কখনও তামার ফিঙ্গারহোল্ডে লাথি নামছে, তখন সামান্য কমছে ব্যথা।

তখনই শুনতে পেল শব্দটা:

ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ...

ওই আওয়াজ হেলিকপ্টারের রোটরের।

মাথা কাত করে ওদিকে চাইল নিশাত।

সামান্য দূরে প্রকাণ্ড বোলতার মত ভাসছে লিঙ্কস কপ্টার।

‘হায়রে কপাল...’ বিড়বিড় করল নিশাত।

ওর কজির উপরে ভর করে পাইলটকে একহাতে ইশারা করল বাউন্টি হান্টার। বোঝাতে চাইছে যেন কপ্টার নিয়ে নীচে আসে।

সবই বুঝেছে পাইলট, কপ্টার নিয়ে এল নিশাতের পায়ের নীচে। সাঁই-সাঁই ঘুরছে রোটর। ঝাপসা আকৃতি তৈরি করেছে সাদা কোনও চরকির। নিশাতের দুই পা থেকে মাত্র দশফুট নীচে ঘুরছে দুরন্ত পাখা।

সম্ভ্রষ্ট হয়েছে বাউন্টি হান্টার। নতুন উদ্যমে শুরু হলো লাথি।
কড়াৎ!

চারপাশের এত আওয়াজের ভিতরও নিজের আঙুলের হাড় ভাঙবার শব্দ শুনল নিশাত।

বাউন্টি হান্টারের উদ্দেশ্যে গলা ফাটাল: ‘হারামজাদা, তোর মা বেশ্যা ছিল, আর তোর বাপ ছিল রাস্তার কুকুর!’

তিনগুণ জোরে লাথি নামল।

নিশাতের বুট পরা দুই পায়ের দশ ফুট নীচে জোরালো গুঞ্জন তুলছে রোটর ব্লেডগুলো।

জোরালো শেষ লাথি মারতে তৈরি বাউন্টি হান্টার। ঝট করে পা ছুঁড়ল...

ওই একই সময়ে অদ্ভুত কাজ করল নিশাত।

টেবিলের বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল ছোরা!

পিছলে পড়তে শুরু করেছে দু’জন!

এবার টেবিলের শেষ অংশ পেরিয়ে নামবে গিয়ে ঘুরন্ত

রোটরগুলোর ভিতর!

নিজ চোখকে বিশ্বাস করছে না নিশাতের হামলাকারী।

পায়ের নীচে ছুরিটা ছিল শক্ত মাটির মত, ভরসা করা যাচ্ছিল ওটার উপর, কিন্তু এখন সব সরে যেতেই বোর্ডরুমের টেবিল থেকে পিছলে পড়ছে সে।

টেবিলের শেষাংশে পৌঁছে গেল নিশাত। কিন্তু হামলাকারীর মত অপ্রস্তুত নয় ও।

টেবিলের শেষ কিনারা পেরুতেই আবারও ছোরা চালান ও। এবার কোপ দিয়েছে টেবিলের উল্টোদিকে। হাত থেকে ছুটল না ছোরার হ্যাণ্ডেল। জোরালো ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল নিশাত।

ওর পাশ দিয়ে পড়ার সময় নিশাতকে ধরার জন্য হাত বাড়ান লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে জোরালো এক থাবড়া হাঁকাল নিশাত, কড় কড় আওয়াজে ভাঙল লোকটার দু'পাটির দশটা দাঁত। বেরিয়ে গেল বাউন্টি হান্টার, পেরোল টেবিল। নীচে...

দৃশ্যটা যেন হয়ে উঠল স্লো মোশন ছায়াছবির মত।

লোকটার আতঙ্কিত চেহারা দেখল নিশাত। ডিমের মত বড় হয়ে উঠেছে ব্যাটার দুই চোখ। মস্ত হাঁ করেছে, ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওর আলাজিভ। পড়ছে... পড়ছে...

মাত্র এক সেকেন্ড পর রোটর ব্লেডগুলোর উপর পড়ল সে।

জোরালো একটা ভোঁতা আওয়াজ হলো।

মুহূর্তে হারিয়ে গেল লোকটা, তার জায়গায় চারপাশে বিস্তৃত হলো লাল একটা নক্ষত্র।

ছড়িয়ে গেল রক্তের কোটি কণা।

কপ্টারের উইণ্ডকিনে ছাড়া করে লেগেছে একরাশ লাল তরল। ঝাপসা হয়ে গেল উইণ্ডকিন। দালানের পাশ থেকে সরে গেল লিঙ্কস কপ্টার।

তাতে স্বস্তির শ্বাস ফেলবারও সময় পেল না নিশাত।

বৃষ্টির ভিতর টের পেল, এইমাত্র নড়ে উঠেছে টেবিল!
 নতুন করে হোঁচট খেয়ে নামছে।
 ঝট করে মুখ তুলে চাইল নিশাত।
 চল্লিশতলার মেঝেতে আটকা পড়া টেবিলের দুই পায়ার
 একটা মচকে গেছে!
 এবার সোজা নীচে রওনা দেবে গোটা টেবিল!
 ‘অ্যাঁই মিয়া, এটা কোনও বিচার হলো তোমার?’ আকাশের
 দিকে চেয়ে গলা ফাটাল নিশাত। ‘না! আমি মরব না!’
 চারপাশে চোখ বোলাল।
 ও আছে দালানের এক পাশে।
 ঝুলছে বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।
 সামান্য নীচে একটু দূরে কাঁচ ঘেরা একটা এলিভেটর। ওটা
 দালানের দক্ষিণের শুরুতেই আটত্রিশ তলায় থেমেছে।
 ‘ঠিক আছে,’ ফিসফিস করে নিজেকে বলল নিশাত। ‘শান্ত
 থাকো। ভাবো, তোমার বস্ মাসুদ রানা হলে কী করত।’
 নিশ্চয়ই ম্যাগলুক ব্যবহার করত? -ভাবল।
 বেল্ট থেকে ম্যাগলুক নিয়ে মাযল তাক করল চল্লিশতলার
 সিলিঙে, তারপর টিপে দিল ট্রিগার।
 কিছুই হলো না।
 ম্যাগলুক ফায়ার করেনি।
 শুধু ক্লিক আওয়াজ তুলেছে ট্রিগার, ব্যারেলের ভিতর থেকে
 বেরোল দুর্বল ফিজ-ফিজ শব্দ। ফুরিয়ে গেছে গ্যাস প্রোপেল্যান্ট।
 ‘যাহ্ শালা!’ রাগে গরগর করল নিশাত। ‘এমন তো হয় না
 রানার বেলায়!’
 তখনই আবারও হোঁচট খেল টেবিল।
 সড়াৎ করে নামল আরও দু’ফুট।
 ম্যানুয়ালি দড়ি গোটাতে শুরু করেছে নিশাত, কাজটা করতে

হচ্ছে দাঁতের জোরে। তারই ফাঁকে বিড়বিড় করছে: ‘ঠিক না, এসব একদম ঠিক না। শালার কপাল আমাকে জুতিয়ে দিচ্ছে!’

চল্লিশতলার মেঝের কিনারায় টলমল করছে টেবিল। গুণ্ডিয়ে উঠছে পায়া। যে-কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে।

যথেষ্ট দড়ি পাওয়া গেছে বুঝতেই অন্যহাতে ম্যাগল্কের গ্র্যাপলিং হুক চল্লিশতলার মেঝে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল নিশাত।

মেঝের কিনারায় পড়ল গ্র্যাপলিং হুক, ভাঙা উইণ্ডোসিলে আটকে গেল আঁকশি। তখনই জানালা থেকে ছুটে গেল টেবিল!

দেরি না করে ছোরা ছেড়ে দিল নিশাত, আরেক হাতে টেবিলে জোর এক ধাক্কা দিয়ে সরে গেল দূরে।

বৃষ্টির আকাশে নীচে রওনা হয়ে গেল টেবিল, পড়ছে দালানের গা ঘেঁষে।

দড়ি থেকে ঝুলছে নিশাত, দোল খেয়ে সরল বাড়ির কোণে, পৌঁছতে চাইল এলিভেটোরের কাঁচের দেয়ালের পাশে। একবার খপ করে কাঁচের বাস্তের ছাতের কিনারা ধরতে পারলেই...

সাত সেকেণ্ড পর সিলভারম্যান, নিউটন অ্যাণ্ড যেমির লইয়ার্স ফার্মের বোর্ডরুমের প্রকাণ্ড টেবিল আছড়ে পড়ল ফুটপাথে, মুহূর্তে লাখখানেক টুকরো হলো।

উইণ্ডো-ওয়াশার্স প্ল্যাটফর্মে চেপে ছাতের পাশে পৌঁছে গেছে খবির ও ম্যাকিন। রেলিং টপকে চট করে লুকিয়ে পড়ল এগযস্ট চিমনির আড়ালে। উঁকি দিয়ে দেখল, ছাতে নেমেছে হেঞ্জিকের লিঙ্কস কপ্টার। ঝামঝাম বৃষ্টির ভিতর এখনও ঘুরছে রোটরগুলো।

‘আলাপ চলুক,’ ম্যাকিনকে বলল খবির। ‘এই ম্যাজেস্টিক-১২ একটা তালিকা তৈরি করেছে। আর চাইছে মাসুদ স্যরকে মেরে ফেলতে। ওই তালিকায় আরও...’

‘এসব করছে সি স্নেক টেস্টের কারণে,’ বলল ম্যাকিন।

‘কারণ, ধরে নেয়া হয়েছে মাসুদ রানা এবং অন্য আটজন ওই টেস্টে পাশ করবে। ন্যাটো ওই টেস্টের নাম দিয়েছে: মোটর নিউরন র‍্যাপিডিটি অভ রেসপন্স টেস্ট।’

‘মোটর নিউরন র‍্যাপিডিটি অভ রেসপন্স টেস্ট?’ বলল খবির, ‘তার মানে রিফ্লেক্সের বিষয়?’

‘ঠিকই ধরেছেন,’ বলল ম্যাকিন। ‘সবই রিফ্লেক্সের ব্যাপার। বলতে পারেন সুপারফাস্ট রিফ্লেক্স। ওই তালিকার নয়জন দুনিয়া সেরা। অনায়াসে পাশ করবে সি স্লেক টেস্ট। এরা ডিসআর্ম করতে পারবে টাচলক-৯। আর ওটাই হচ্ছে ম্যাজেস্টিক-১২-র পরিকল্পনা। আর ওই পরিকল্পনা কাজে লাগাতে হলে আগে এই লোকগুলোকে শেষ করতে হবে।’

‘একটা মিসাইল সিকিউরিটি সিস্টেম...’

‘হ্যাঁ, কিন্তু মনে কোনও ভুল ধারণা রাখবেন না। এই বাউন্টি হাণ্টের পরিকল্পনা ম্যাজেস্টিক-১২-এর মস্ত পরিকল্পনার সামান্য অংশ।’

‘ওই মহাপরিকল্পনা কী?’

‘বর্তমান দুনিয়ার রাজনৈতিক সমস্ত অবস্থান পাল্টে দেয়া। মূল কথা: তারা ছড়িয়ে দেবে গোটা দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ। নিজেদের খুশিমত আবারও জন্ম দেবে নতুন রাষ্ট্র।’ খবিরের কানের কাছে বলল ম্যাকিন, ‘আমার কথা শুনুন। এ বিষয়ে আস্ত ফাইল জোগাড় করেছি, দুইতলা নীচেই আছে ওটা। গত দু’দিন ধরে আমার কাছ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করছিল মোসাদ। ওই ফাইলে আছে কেন, কী কারণে ম্যাজেস্টিক-১২ বা এর সদস্যরা বাউন্টি হাণ্টের আয়োজন করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ভয়ঙ্কর সেই মহাপরিকল্পনা কী তা...’

আকাশ থেকে পড়া বাগ্মির মত বিস্ফোরিত হলো ম্যাকিনের গোটা মাথা। ওটা যেন ছিল রক্তভরা পাতলা রাবারের বেলুন।

কিছুই টের পায়নি খবির।

ওর পিছন থেকে মেটালস্টর্ম রাইফেলের বিশটা বুলেট উড়িয়ে দিয়েছে মোসাদ এজেন্টের আস্ত মুখ।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল খবির।

ত্রিশ গজ দূরে ফায়ার স্টেয়ার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে স্বয়ং ডেভিল ডেভিড এন. হেঞ্জিক, কাঁধে মেটালস্টর্ম রাইফেলের বাঁট।

ঝট করে ম্যাকিনের দিকে চাইল খবির। ভাঙা পুতুলের মত পড়ে আছে রক্তাক্ত লাশ! আর একটা কথাও বেরোবে না ওই মুখ থেকে। মাথাটাই নেই তৌ তার আর কীসের মুখ বা কথা!

এবার নিজের জান বাঁচা, বাপু! ঘুরেই ঝেড়ে দৌড় লাগাল খবির। হাতে উদ্যত রিভলভার, গুলি করছে হেলিকপ্টারের পাশ দিয়ে। চলেছে ওই কপ্টার লক্ষ্য করেই। একবার চড়তে পারলে চিন্তা নেই। নিজের হাতে ওকে কপ্টার চালানো শিখিয়েছেন মাসুদ স্যর।

টারজানের মত ঝুলতে ঝুলতে চলেছে নিশাত, দু'পায়ের দুই লাথিতে ঝরঝর করে ভেঙে পড়ল এলিভেটোরের কাঁচের দেয়াল। পরক্ষণে মেঝেতে নামল ও।

টাওয়ারের দক্ষিণে আটত্রিশতলায় প্রথম এলিভেটোর থেকে দেখল, প্রায় প্রতিটি এলিভেটোর একই উচ্চতায় স্থির।

পাশাপাশি তিন এলিভেটোর আটত্রিশতলায়। পরেরটা, অর্থাৎ চতুর্থ এলিভেটোর নেই। কোনও কারণে ডেকে নেয়া হয়েছে নীচে। মাঝের ওই ফাঁক বাদ দিলে ওদিকে পঞ্চম এলিভেটোর। সেটাও আটকা পড়েছে আটত্রিশতলায়।

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপেন বাটন টিপে দিল নিশাত।

ওর মনে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে ফিশবউলে। যে-কোনও সময়ে ওর খোঁজ নিতে আবারও ফিরবে লিঙ্কস কপ্টার। তার আগেই

সরে যেতে হবে, নইলে নিশ্চিত মৃত্যু...

ধূপ-ধূপ-ধূপ-ধূপ-ধূপ...

আসছে লিঙ্কস কপ্টার।

ঘুরে চাইল নিশাত।

পৌছে গেছে ওটা।

ওর কাঁচের এলিভেটোরের পশ্চিমে ভাসছে।

এবার খরগোশের উপর ছোঁ দেবে ঈগল।

বারবার ওপেন বাটন টিপে চলেছে নিশাত। বিড়বিড় করে বলল, 'মর জ্বালা! কাজ করে না এই বাটন?'

তখনই লিঙ্কসের সাইড মাউন্টেড মিসাইল পডগুলো থেকে ভুস্ করে উঠল একরাশ ধোঁয়া।

অবাক হলো নিশাত।

ওকে শেষ করতে মিসাইল মেরেছে শালারা!

পড থেকে ছিটকে বেরোল টো মিসাইল।

যেন দিগন্ত থেকে এল নিশাতের এলিভেটোর লক্ষ্য করে।

এইমাত্র খুলতে শুরু করেছে এলিভেটোরের দরজা।

শৌ-শৌ গর্জন ছাড়তে ছাড়তে বিদ্যুৎবেগে নিশাতের নাক লক্ষ্য করেই আসছে মিসাইল।

মস্ত শরীরটা চাপাচাপি করে দুই দিকের কবাট ঠেলে ওদিকের মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশাত। তখনই এলিভেটোরের পশ্চিম কাঁচ ভেঙে ভিতরে ঢুকল মিসাইল। ওটার লেজের উত্তপ্ত আগুন ঝলসে দিল এলিভেটোরের ভিতরের অংশ। পরক্ষণে আরেকদিকের কাঁচের দেয়াল ভেঙে গিয়ে ঢুকল পাশের এলিভেটোরের বুকে।

দৃশ্যটা বিস্ময়কর।

কুইন্স টাওয়ারের দক্ষিণ-দেয়াল ছুঁয়ে চারটে এলিভেটোর ভেদ করে কাঁচ ভাঙবার ঝন-ঝন-ঝন-ঝন আওয়াজ তুলে টেমসে গিয়ে

পড়ল মিসাইল। পানির মস্ত গিইজার তৈরি হলো নদীর বুকে।

কঠিন ক্যাচ ধরতে চাওয়া আনাড়ি ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মত আটত্রিশতলার রিসেপশন এরিয়ায় ধূপ করে পড়েছে নিশাত। মুখ তুলেই দেখল, এখনও ধীরে ধীরে খুলছে এলিভেটোরের কাঁচের দরজা।

ছোখের কোণে দেখল, বিধ্বস্ত রিসেপশন এরিয়ায় চার বাউন্টি হান্টার। বেশি দূরে নেই তারা!

নিশাত তাজ্জব বনে গেছে, কিন্তু ওর চেয়ে কম বিস্মিত হয়নি লোকগুলো।

• ‘শালার তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলোর ভেতর পড়েছি!’
বিড়বিড় করল নিশাত।

ঝট করে যার যার মেটালস্টর্ম রাইফেল ঘোরাল লোকগুলো।

ওই একই সময়ে লাফ দিয়ে উঠে সিধে হলো নিশাত, বুঝে গেছে মাত্র একটা জায়গায় যেতে পারবে: ক্ষিপ্ত চিতার মত এক লাফে গিয়ে ঢুকল এলিভেটোরের ভিতর।

লুকিয়ে পড়ল কন্ট্রোল প্যানেলের আড়ালে। এক সেকেণ্ড পর হাইপারমেশিনগানের অজস্র তপ্ত বুলেট ঢুকল খোলা দরজা দিয়ে।

দমকা হাওয়া ছেড়েছে, সেই সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি— পুরো ভিজে গেছে নিশাত। বিধ্বস্ত এলিভেটোর হয়ে উঠেছে বড়জোর খোলা প্ল্যাটফর্ম, ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লণ্ডন শহর।

টাওয়ারের দক্ষিণে চোখ গেল নিশাতের।

ওদিকে পাশাপাশি তিনটে এলিভেটোর।

‘বাঁচতে চাইলে ঝুঁকি নে,’ বিড়বিড় করল। ‘নইলে নির্ঘাতে মরবি!’

কাজেই দৌড় শুরু করল নিশাত।

আটত্রিশতলায় প্রথম এলিভেটোর থেকে ছুটতে শুরু করেছে। একটু পর পর তিন ফুট জায়গা ফাঁকা, তারপর একের পর এক

বিশ্বস্ত এলিভেটর।

দ্বিতীয় এলিভেটরে নামতেই আবারও হাজির হলো লিঙ্কস কপ্টার। নেমে এল চিলের মত, যেন ছোঁ দেবে। চালু করেছে মিনি-গান, ঝড়ের মত এল শত শত বুলেট, চুরচুর করে দিল দালানের কাঁচ।

ভাসতে ভাসতে ঘুরছে কপ্টার, ওটার ঝোড়ো বুলেটকে পিছনে ফেলে ছুটছে নিশাত। মাত্র একফুট পিছনে তেড়ে আসছে নিশ্চিত মৃত্যু। লাফিয়ে পড়ল তৃতীয় এলিভেটরের ভিতর।

এবার?

চার নম্বর এলিভেটর নামিয়ে নেয়া হয়েছে অনেক নীচে।

পাঁচ নম্বর এলিভেটরের আগে হাঁ করে আছে অতল খাদ।

দৌড়ের গতি রোধ করল না নিশাত।

মাঝের ফাঁক অনেক বেশি চওড়া— পুরো বারো ফুট।

কিছু পাতা না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশাত। সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত। আশা করছে আটত্রিশতলা বাড়ি থেকে পড়ে মরবে না। কেন যেন ওর মনে হলো: পৌঁছুতে পারবে পঞ্চম এলিভেটরে।

কিন্তু কপাল সবসময় সাহায্য করে না।

ঝাঁপিয়ে পড়েই বুঝে গেল নিশাত, দূরের ওই গন্তব্যে পৌঁছুবে না ও।

পঞ্চম এলিভেটরের মেঝের এক ইঞ্চি দূরে হাত পৌঁছতেই শুরু হলো পতন।

অবশ্য এলিভেটরের মেঝের কিনারায় ক্রিচ-ক্রিচ আওয়াজ তুলে আটকে গেল ম্যাগল্কের গ্র্যাপলিং হুক।

কাজ করছে না ম্যাগল্ক, কিন্তু নিশাতের হাত থেকে পুরো একফুট সামনে বেড়ে আছে ওটা।

এর বেশি বাড়তি সুযোগ আশা করেনি নিশাত।

সিটলের আঁকশির এক ফুট নীচে বুলছে ও ।

লক্ষ্যের বেয়ে উঠতে শুরু করেছে, এমন সময়...

আবার শুরু হলো ধূপ-ধূপ-ধূপ-ধূপ-ধূপ-ধূপ আওয়াজ!

লিঙ্কস অ্যাটাক হেলিকপ্টার!

আবারও হাজির হয়েছে ওটা ।

চলে এসেছে নিশাতের এলিভেটোরের খুব কাছে ।

কিন্তু এই কপ্টারের পিছনে উদয় হয়েছে আরেকটা কপ্টার ।

ওটাও লিঙ্কস ।

সামনের লিঙ্কস কপ্টারের পাইলটের হাসিটা পরিষ্কার দেখল নিশাত ।

লোকটা খুশি মনে হাত নাড়ল, পরক্ষণে খপ করে ধ্বল গান ট্রিগার ।

এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের নীচে বুলতে বুলতে মাথা নাড়ল নিশাত । দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে ।

কেউ চিরকালের জন্য আসে না ।

বনবন করে ঘুরছে লিঙ্কসের মিনি-গান ব্যারেল । কিন্তু চোখের কোণে আরেকটা নড়াচড়া দেখল নিশাত ।

এই লিঙ্কস কপ্টারের পিছনে ধূসর ধোঁয়া ছাড়ছে কী বেন...

ওই যে পিছনের লিঙ্কস হেলিকপ্টারটা...

তখনই সামনের কপ্টারের কোমরে বিঁধল মিসাইল ।

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হলো । থরথর করে কেঁপে উঠল বাতাস ।

সে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজ । যেন গা পুড়িয়ে দেবে আগুনের হলকা ।

নিশাতের চোখের সামনে হাজার টুকরো হলো বাউন্টি হাটারদের

কপ্টার । টাওয়ারের দেয়াল ঘেষে নীচে রওনা হয়ে গেছে জ্বলন্ত

টুকরোগুলো । গা থেকে উঠছে তেলতেলে ধোঁয়া ।

বিস্ত্রস্ত কপ্টারের পোড়া কাঠামো প্রচণ্ড আওয়াজে আছড়ে

পড়ল টাওয়ারের সামনের সবুজ ঘাসের লনে ।

বিস্ময় নিয়ে দ্বিতীয় লিঙ্কস কণ্টারের দিকে চাইল নিশাত।
নিজের দলের লোককে শেষ করেছে ওই পাইলট?
তখনই চিনল তাকে।

লেখক টু খবির!

ইয়ারপিসে নিশাত শুনল পরিচিত কণ্ঠ, 'আপা, কী করেন?
ছাতে পেলাম এই মাল। বেচবে না পাইলট। এখন ঘুমিয়ে আছে
বৃষ্টির ভেতর। তারপর এইমাত্র দেখলাম আপনি এখানে।'

হাচড়ে-পাছড়ে এলিভেটোরের মেঝেতে উঠে এসেছে নিশাত।
বলল, 'পরে কথা হবে, ছুড়ু বাই! আগে মৃত্যু-প্রাসাদ থেকে
সুন্দরী রাজকন্যা আপাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও!'

'নিশ্চই তাই করব। কিন্তু আগে একটা কাজ করে দেবেন,
আপা?'

তিন মিনিট পর।

উনচল্লিশতলার এক করিডোর ধরে রেলগাড়ির মত ছুটল
নিশাত, হাতে উদ্যত কোল্ট।

চারপাশ একেবারে বিধ্বস্ত হয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে বুলেটের
ক্ষত-বিক্ষত চিহ্ন। কোথাও আস্ত নেই একটা কাঁচও।

বাউন্টি হাণ্টাররা এখনও থেকে থাকলে, তাদের কাউকে দেখা
গেল না।

'ওটা আছে ইন্টারনাল স্টেয়ারকেসের কাছে,' ইয়ারপিসে
খবিরের কথা শুনল নিশাত। 'যে ঘরের কাছে ম্যাকিনকে
পেয়েছিলাম। ওটা বোধহয় কোনও ধরনের ইন্টারোগেশন রুম।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল নিশাত।

বাঁকা সিঁড়ির কাছেই ওই ঘরের দরজা।

কয়েক সেকেণ্ডে ওখানে পৌঁছে গেল ক্যাপ্টেন। ঘরে ঢুকে
একটু দূরে দেখল টু-ওয়ে মিরর। ওদিকে ইন্টারোগেশন রুম।

আয়নার এদিকে দুটো আধুনিক মুভি ক্যামেরা। টেবিলের পাশে পুরু ম্যানিলা ফোল্ডার এবং দুটো কেসে ডিভিডি।

‘আসলেই ইন্টারোগেশন রুম,’ থোট মাইকে বলল নিশাত। ‘ফাইল ফোল্ডার পেয়েছি। ডিভিডি দুটোও। এবার কী করতে বলো?’

‘সব নিন। এ ছাড়া ম্যাজেস্টিক-১২ বা টাচলক-৯ সম্পর্কে যা কিছু পাবেন, নেবেন। ক্যামেরার পেটেও কিছু থাকতে পারে।’

মেঝের উপর কাত হয়ে পড়ে থাকা ছোট স্যামসোনাইট সুটকেস সিধে করল নিশাত। ওটার ভিতর ভরতে লাগল ফাইল ও ডিভিডি। দুই ক্যামেরাও এঁটে গেল।

অনেক নীচে অসহায় শিশুর ওঁয়া-ওঁয়া কান্না জুড়েছে পুলিশের একাধিক গাড়ির সাইরেন। যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল নিশাত। বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। ছুটতে শুরু করেছে সিঁড়ির দিকে। উঠবে ছাতে।

মাত্র পাঁচ মিনিট পর অন্য একটা সিঁড়ি ব্যবহার করে ছাতে পৌঁছে গেল, ছুটছে বৃষ্টির ভিতর।

আগেই লিঙ্কস্ কন্টার নামিয়ে এনেছে খবির। দরজা খুলে দিতেই ঝটপট উঠে পড়ল নিশাত।

পাঁচিশ সেকেন্ড পর ছাত ছেড়ে আকাশে উঠল কন্টার, বৃষ্টির ভিতর ধোঁয়াভরা কুইন্স টাওয়ারকে পিছনে ফেলে রওনা হয়ে গেল।

আঠারো

ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রধান অফিস।

সাব-লেভেল তিন, পেন্টাগন।

অক্টোবর, ১৪।

সকাল সাড়ে এগারোটা।

খুব নিরীহ ভঙ্গিতে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল কেভিন কনলন, যাবে ডক্টর ওয়াকারের কাছে সেন্ট জর্জ হসপিটালে—
কিন্তু এমন সময় বুনো দাঁতাল গুয়োরের মত হামলে পড়ল ওর মোটর বস।

‘তো, কোথায় চললেন, কনলন স্যার?’ টিটকারির সুরে বলল জন ওয়ার্ন। প্রকাণ্ডেহী লোক সে, আগে আর্মিতে ছিল, দু’বার ইরাকে লড়াই করে এসেছে। আর ওই কথাটা একটু পর পর আশপাশের সবাইকে মনে করিয়ে দেয়।

বাস্তবে নির্বোধ লোক। দুনিয়ার আর সব গাধার মতই, কোনও নিয়ম বা আইন থেকে নড়তে সম্পূর্ণ নারাজ। অথচ জটিল সমস্যার সমাধান হয়তো রয়েছে একেবারে হাতের নাগালে।

‘আমি একটু কফির জন্যে বেরুচ্ছি,’ বলল কেভিন।

‘আমাদের অফিসের কফির দোষটা কী, শুনি স্যার?’

‘এর চেয়ে হাইড্রফ্লোরিক অ্যাসিড ভাল।’

ঠিক তখনই অফিসে এসে ঢুকল ডানাকাটা পরী, তরুণী মেরিয়ান বিটন। সে মেইল ক্লার্ক। আর ওই মুখ দেখলে জ্বলজ্বল

করে কনলনের দুই চোখের তারা। কিন্তু দুঃখের কথা, ওর মতই কীসের যেন ভাষা খুঁজে পায় জন ওয়ার্নের কুঁতকুঁতে চোখ।

‘হাই, মেরিয়ান,’ নিজের সেরা হাসিটা দিল কেভিন।

‘হাই, কনলন,’ লাজুক হাসল তরুণী।

গলা চড়িয়ে বলল ওয়ার্ন, ‘তুমি না অফিস ছেড়ে যাচ্ছিলে, কনলন? যাও, ঘুরে এসো। আসার সময় স্টারবাক থেকে আমার জন্যে গ্র্যাণ্ড ফ্রেপাচিনো এনো।’

শালা, তোর নিকুচি করি, মনে মনে গাল দিল কেভিন। শ্রাগ করল। ‘আপনি যা বলেন, ওয়ার্ন।’

‘অ্যাই,’ ধমক দিল বস। ‘আগেও বলেছি, আমাকে সার্জেন্ট ওয়ার্ন বলেই ডাকবে। তোমার মত মেরুদণ্ডহীন সামান্য কিবোর্ড টেপা ছোকরা আমাকে যা খুশি ডাকবে, সেজন্যে ইরাকে গুলি খাইনি আমি। সত্যি যখন বিপদে পড়ে দেশ, তখন আমার মত লোকই বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়।’ চওড়া হাসি দিল সে মেরিয়ানের দিকে চেয়ে। ‘তখন পিস্তলটা কি তোমার হাতে থাকবে, না আমার হাতে, কনলন?’

অপমানে লাল হয়ে গেছে কেভিনের গাল। আশ্তে করে শ্বাস ফেলে বলল, ‘আপনি যা বলেন, ওয়ার্ন।’

‘যা বললাম, এখন থেকে মনে রাখবে, ছোকরা!’

বিরক্তি চেপে মেরিয়ানের দিকে সামান্য নড় করল কেভিন, বেরিয়ে এল অফিস ছেড়ে।

ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড, সেন্ট জন্স হসপিটাল।

আর্লিংটন, ইউএসএ।

অক্টোবর ১৪। দুপুর পৌনে বারোটো।

সেন্ট জন্স হাসপাতালের ই.আর. বিভাগে ঢুকে রিসেপশন কাউন্টারের সামনে থামল কেভিন কনলন।

বেলা বাড়ছে, কিন্তু আজ রোগী বা দর্শনার্থীদের ভিড় নেই।
ওয়েটিং এরিয়ায় যোম্বির মত পেট ভাসিয়ে কাউচে বসে আছে
পাঁচজন বয়স্ক লোক ও এক মুটকি মহিলা।

‘হাই, আমি কেভিন কনলন, ডক্টর জেফ ওয়াকারের সঙ্গে
দেখা করতে চাই।’

অলসভঙ্গিতে বাবলগাম চিবিয়ে চলেছে ডেস্ক নার্স। ‘এক
মিনিট। ...ডক্টর ওয়াকার! আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন
এক ভদ্রলোক!’

পর্দা ঘেরা এক বেড-বে থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় নার্স।
‘বেলিগু, শশশশ! উনি চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমি গিয়ে
তুলে দিচ্ছি।’

আবারও হলওয়াতে গিয়ে ঢুকল দ্বিতীয় নার্স।

ওই একই সময়ে রিসেপশন কাউন্টারে কনলনের পাশে থামল
অত্যন্ত দীর্ঘ এক কালো ভদ্রলোক। গরিলার মত ঢালু কপাল,
ছড়ানো নাকের দুই ফুটো।

এই মাল খোদ আফ্রিকার, ভাবল কেভিন।

চোখে এলভিস সানগ্লাস। গায়ে বাদামি ট্রেঞ্চকোট।

কনলন বা নার্স জানে না, বাউন্টি হান্টারদের সমাজে এই
লোকের নাম: দি আফ্রিকান।

‘গুড ইভনিং,’ আড়ষ্ট উচ্চারণে বলল সে। ‘আমি ডক্টর জেফ
ওয়াকারকে খুঁজছি।’

বাউন্টি হান্টারের দিকে ঘুরেও চাইল না কনলন। টের পেয়ে
গেছে ওই লোক কে। ধূপ-ধাপ লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড।

তালগাছের মত উঁচু লোকটা যেন পেশাদার বাস্কেটবল
খেলোয়াড়। তার বুক পর্যন্ত পৌঁছুবে না কেভিনের মাথা।

বাবলগাম দিয়ে বড় বল তৈরি করল নার্স। ‘আজকে দেখি
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন ডক্টর ওয়াকার! ওদিকে আছেন। বোধহয়

ঘুমিয়েই পড়েছেন। এইমাত্র জিনা গেল ডেকে তুলতে।

কথাটা শ্রদ্ধা শেষ করেছে, এমনসময় চোখ ডলতে ডলতে 'অথোরাইযড পার্সোনেল ওনলি' লেখা করিডোর থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার।

বয়স্ক মানুষ। মাথার চুল ধূসর। কুঁচকে গেছে গাল। শার্টের উপর সাদা ল্যাবকোট। পকেট থেকে চশমা বের করে নাকের উপর চাপিয়ে নিলেন।

'ডক্টর ওয়াকার?' জানতে চাইল দি আফ্রিকান।

'জী,' কালো লোকটার দিকে এগিয়ে এলেন ডক্টর।

বাদামি ট্রেঞ্চকোটের তলা থেকে অস্ত্রটা বেরতেই সবার আগে চোখে পড়ল কেভিনের।

একটা সিযেড-২৫ সাবমেশিনগান। বিশ্বের সবচেয়ে কুৎসিত অস্ত্র। দেখতে অনেকটা উয়ির মত, কিন্তু আরও ন্যাংটো— যেন দুই ভাই ওরা। পিস্তল গ্রিপের ভিতর থাকে চল্লিশ রাউণ্ড গুলি।

ডাক্তারের দিকে অস্ত্র তুলল লোকটা, পাত্তাই দিল না বেশ ক'জন সাক্ষী থাকবে। দেরি না করে টিপে দিল ট্রিগার।

লম্বু খুনির বিরুদ্ধে মাত্র একটা কাজই সম্ভব ছিল, ঠিক তাই করল কেভিন।

ওর ডানহাত ছিটকে লাগল পিস্তলের পাশে, ফলে ডক্টর ওয়াকারের মাথার তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে গিয়ে দূরের দেয়ালে বিঁধল গোটা পনেরো গুলি।

কাউচে বসা বয়স্ক লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। তাদের একজনের উপর পড়েছে ইয়া মোটা মহিলা। নীচে চাপা পড়ে মুরগির মত ক্লক-ক্লক্ আওয়াজ তুলল বেচারী লোকটা।

চিৎকার শুরু করেছে ডেস্কের নার্স।

ঘুরেই পিছনের করিডোরের মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওয়াকার, পরক্ষণে উঠেই শুরু করলেন দৌড়।

দি আফ্রিকানের উল্টো হাতের প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে ছিটকে গেল কেভিন, হুড়মুড় করে পড়ল একটু দূরে রাখা জ্যানিটরের ট্রলিতে।

সামান্যতম দুশ্চিন্তা নেই আফ্রিকান খুনির, রিসেপশন ডেস্ক পাশ কাটিয়ে চলে গেল ‘স্টাফ ওনলি’ লেখা করিডোরে। এবার সিয়েড-২৫ দিয়ে খতম করবে ডাক্তার ওয়াকারকে।

একটা একটা করে গুলি করছে কিছুই পাত্তা না দিয়ে।

নানাদিকে ছিটকে পালাতে শুরু করেছে নার্সরা।

এইমাত্র করিডোরের একদিকের সাপ্লাই রুমে গিয়ে ঢুকেছেন ডাক্তার, বাইরের দেয়াল ও কবাটে স্কুলিঙ্গ তুলল গোটা দশেক গুলি।

ট্রলির উপর ছড়িয়ে পড়া জ্যানিটরের সাপ্লাইগুলোর মাঝে শুয়ে আছে কেভিন। দেখল, পাশেই পেটমোটা সাদা পাউডারের ব্যাগ। গায়ে পুরু নীল কালিতে লেখা:

‘যিয়োলাইট-ক্লোরিন— ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-স্ট্রেংথ।

ক্লিনিং এজেন্ট— অ্যাভয়েড স্কিন কন্ট্যাক্ট।’

খপ্প করে ব্যাগ তুলে নিল কেভিন, লাফ দিয়ে নামল ট্রলি থেকে। আর সবাই পালাতে শুরু করেছে, কিন্তু উল্টো দিকে রওনা হয়ে গেল ও। এক ছুটে ঢুকল স্টাফ ওনলি করিডোরে, দেখতে পেল আফ্রিকান লোকটা থেমেছে এক দরজার সামনে, হাতে উদ্যত সিয়েড-২৫।

পাঁচ ফুট দূর থেকে ক্লোরিনের ব্যাগ ছুঁড়ে দিল কেভিন।

লক্ষ্যভেদ নির্ভুল হলো।

খুনির মাথার পিছনে গিয়ে লাগল ব্যাগ।

চারপাশে ছিটকে উঠল সাদা গুঁড়ো।

ভয় পেয়ে নেড়ি কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল খুনি, ঝট করে সরে গেল দরজার সামনে থেকে। একহাতে চাপড়াতে শুরু করেছে মাথা। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর নর্তন-কুর্দন। এলভিস সানগ্লাসের কাঁচে পুরু হয়ে জমেছে সাদা পাউডার। যিয়োলাইটে ত্বক ও মাংস চিড়চিড় করে পুড়ছে, বড় বড় ফোঁসকা পড়তে শুরু করেছে শরীরে।

ঝড়ের গতিতে সামনে বাড়ল কেভিন, দুই হাঁটুর উপর ভর করে ধুপ করে বসল। দি আফ্রিকানের পায়ের পাশে থেমেছে। দরজার ওপাশে ওই তো ডাক্তার! কয়েকটা সাপ্লাই শেলফের নীচে মাথা গুঁজে দুই হাতে ঢেকে রেখেছেন মুখ।

‘ডক্টর ওয়াকার! কথা শুনুন! আমি কেভিন কনলন! ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি থেকে এসেছি! কোনও হিরো নই! কিন্তু আর কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না! যদি বাঁচতে চান, আমার সঙ্গে আসুন!’

হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার। উঠে দাঁড়িয়েছে কেভিন, দেরি না করে খপ করে তাঁর হাত ধরল, টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ভদ্রলোককে। কালো লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ছুট দিল দু’জন। তীরের মত বেরিয়ে গেল রিসেপশন কাউন্টারের পাশ দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পর পৌঁছে গেল অটোমেটিক স্লাইডিং ডোরের সামনে। ওরা বেরিয়ে এল দুপুরের কড়া রোদে। পিছনে কর্কশ আওয়াজ ছাড়তে শুরু করেছে সিয়েড-২৫।

ধাওয়া করছে দি আফ্রিকান। একবার হাতের নাগালে কেভিন বা ওয়াকারকে পেলে রক্ষা নেই।

ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের দালানের সামনে পার্ক করা অ্যাম্বুলেন্স।

‘উঠে পড়ুন!’ তাড়া দিল কনলন। দরজা খুলে লাফিয়ে উঠল ড্রাইভিং সিটে। প্রায় একইসময়ে প্যাসেঞ্জার সিটে বসল ডাক্তার।

ইগনিশন চাবি মুচড়ে দিতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন। কেভিন

অ্যাম্বুলারেটর টিপে ধরতেই ছিটকে রওনা হলো গাড়ি। দড়াম করে বন্ধ হলো দুই দরজা। কিন্তু তারই ভিতর শোনা গেল জোরালো ধূপ আওয়াজ। কে যেন উঠেছে গাড়ির পিছনে।

‘যাহ্...’ বিড়বিড় করল কেভিন।

সাইড মিররে লম্বা, কালো লোকটাকে দেখছে।

সে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্সের রিয়ার বাম্পারে। দু’হাতে শক্ত করে ধরেছে ছাতের কিনারা।

কিঁচ-কিঁচ আওয়াজ তুলে বাঁক নিল গাড়ি, আগারকাভার টার্নিং বে থেকে বেরিয়ে এল মূল পার্কিং লটে। ইচ্ছা করে একটা ড্রেনের উপর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেল কেভিন। আশা করেছিল বাম্পার থেকে খসে পড়বে লোকটা। কীসের কী, সে থাকল। মাতালের মত ভীষণ দুলছে গাড়ি, পেরিয়ে গেল আরেকটা বড় নর্দমা—কেভিন নিশ্চিত হয়ে গেল, এত ঝাঁকুনির ভিতর কেউ টিকবে না।

কিন্তু এক সেকেন্ড পর দড়াম করে খুলে গেল অ্যাম্বুলেন্সের পিছন দরজা; রিয়ার কম্পার্টমেন্টে এসে ঢুকল লোকটা।

‘যাশ্শালা!’ বিড়বিড় করল কেভিন।

এখন লোকটার কাছে সিগেড-২৫ নেই। অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে গিয়ে ব্যবহার করতে হয়েছে দু’হাত, ফলে হারাতে হয়েছে অস্ত্রটা।

এখন আর অ্যাম্বুলেন্স থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। ট্রেন্ডকোটের তলা থেকে বের করল দীর্ঘ ম্যাচেটি। কেভিন আর ওয়াকারের দিকে রক্তচোখে চাইল লোকটা।

ক্ষুরধার ম্যাচেটির দিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে গেল কেভিনের।

রিয়ার কম্পার্টমেন্ট পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছে বাউন্টি হান্টার। উঠে পড়ল চাকাওয়ালা স্ট্রিচারে, এগুতে শুরু করেছে।

যা করবার এখনই, ভাবল কেভিন।

সামনে দু’ভাগে ভাগ হয়ে গেছে রাস্তা। একটা রাস্তা বামদিকে

গেছে একঘিটের দিকে, অন্যটা বাঁক নিয়েছে ডানদিকে। ওদিকে কংক্রিটের র‍্যাম্প গিয়ে উঠেছে হাসপাতালের বহুতল পার্কিং লটে।

ডানদিকের রাস্তা বেছে নিল কেভিন। বনবন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং হুইল, ফ্লোরের সঙ্গে টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর। ছুটে চলেছে র‍্যাম্পের দিকে। দ্রুত উঠছে, কাজেই পেয়ে বসল সেকুইফিউগাল ফোর্স। তাল হারাতে বাধ্য হলো খুনি। দড়াম করে বাড়ি খেল পাশের দেয়ালে। থেমে গেল তার অগ্রগতি।

কিন্তু শুধু উঠবার সময় এই সুযোগ পাব, ভাবল কেভিন। পার্কিং এরিয়া মাত্র ছয়তলা।

উঠতে পারবে আর মাত্র পাঁচতলা, তার আগেই ভেবে বের করতে হবে কিছু।

কেভিন, ডাক্তার এবং বাউন্টি হান্টার যখন পার্কিং লটে সাঁই-সাঁই করে উঠছে, ওই একইসময়ে রাস্তা থেকে গভীর মনোযোগে তাদেরকে লক্ষ্য করছে অন্য কেউ।

সে অপূর্ব সুন্দরী, দীঘল দুই উরু যেন কোনও দেবীর। সুডৌল কাঁধ, কিন্তু পেশিবহুল। শীতল, কাঠবাদামাকৃতি চোখদুটো জাপানি।

নাম তার মাসু হোকামা, কিন্তু বাউন্টি হান্টারদের সমাজে তার নাম: তুষার-শুভ্র রানি। এরই ভিতর হ্যারিস এক্স, টেরেসের মাথা কেটে নিয়েছে সে। এখন এসেছে ডাক্তার জেফ ওয়াকারকে কতল করতে।

শুধু কালো চামড়ার পোশাক পরে সে। পরনে এখন হিপস্টার প্যান্ট, বাইকার জ্যাকেট। পায়ে কিলার বুট। বেগী করে রেখেছে দীর্ঘ কৃষ্ণ চুল। জ্যাকেটের নীচে দুই শোল্ডার হোলস্টারে হাই-টেক শ্টায়ার এসপিপি মেশিন পিস্তল।

রাস্তার বাঁকে এনএসএক্স হোণ্ডা স্পোর্টস কারের ইঞ্জিন চালু করল মাসু, রওনা হয়ে গেল বহুতল পার্কিং লট লক্ষ্য করে।

পেঁচিয়ে ওঠা র‍্যাম্পে জোরালো কিঁচকিঁচ শব্দ তুলছে দ্রুতগামী অ্যাম্বুলেন্সের চাকা। গাড়ির পিছনের দু'কবাট দড়াম দড়াম খুলছে-বন্ধ হচ্ছে।

তৃতীয় লেভেলে উঠে এসেছে ওরা।

আর মাত্র তিনটে তলা, তারপর উঠবে ছাতে— আর তখন আবারও সামনে বাড়বে দি আফ্রিকান।

অবশ্য আগেই কেভিন ঠিক করেছে, এরপর কী করবে।

ছয়তলা ছাত থেকে ফেলে দেবে অ্যাম্বুলেন্স— আর তার আগে ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে ডাক্তারকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ছাতে। গাড়ির ভিতর থাকুক শালা বদমাশ খুনি!

‘ডক্টর ওয়াকার!’ গলা ছাড়ল কেভিন। চট করে চাইল বাউন্টি হাণ্টারের দিকে। ‘আমার কথা মন দিয়ে শুনুন! আমরা হয়তো পরে আর কথা বলার সুযোগ পাব না! আন্তর্জাতিক বাউন্টি হাণ্ট শুরু হয়েছে! টার্গেট করা হয়েছে আপনাকে!’

‘আমাকে? কেন!’

‘এখন আপনার মাথার দাম তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার। আপনারা ন্যাটোর একটা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। আমার ধারণা সেজন্যেই আপনাকে শেষ করতে চাইছে। আপনার সঙ্গে ছিলেন ডক্টর বেইন্স। মনে পড়ে? এমএনআরআর স্টাডি। ওই পরীক্ষা কী বিষয় নিয়ে ছিল?’

ভুরু কুঁচকে ফেললেন ডাক্তার। শকের ভিতর আছেন। একের পর এক প্রশ্ন জন্ম নিচ্ছে মনে। তবে বুঝতে পেরেছেন, সত্যিই তাঁকে শেষ করতে চাইছে কেউ।

‘এমএনআরআর? ওটা ছিল... ওটা...’

তীব্র গতি তুলেছে অ্যান্ডুলেন্স ।

চারতলায় উঠে এসে গতি কমল না গাড়ির ।

‘ওটা ছিল... সোভিয়েত কোবরা টেস্টের মতই । এমন টেস্ট, যেটাতে...’

ডাক্তারের কথা শুনেছে কেভিন, কিন্তু তার ফাঁকে চট করে পিছনে চাইল । ভীষণ ভয় পেল । অনেক কাছে চলে এসেছে খুনি । হাতে ধারালো ম্যাচেটি! এবার ওর ঘাড়ের উপর নামবে ওটা! কচাৎ করে কাটা পড়বে মাথা!

বাঁচার উপায় নেই!

পালাবে কোথায়?

শ্-শ্ আওয়াজ তুলে নেমে এল ম্যাচেটি । আটকা পড়ল কেভিনের সিটের হেডরেস্টের ফোমের ভিতর ।

হেডরেস্টের ভিতরের পুরু রডে লেগে জোরালো ধাতব আওয়াজ তুলেছে ম্যাচেটি । কেভিন টের পেল, ওর ডান কানের আধ ইঞ্চি দূরে থেমেছে ক্ষুরধার ফলা ।

‘হায় যিশু!’ বিড়বিড় করল কেভিন ।

ঘাড়ের কাছে পৌঁছে গেছে বাউন্টি হান্টার । এত বাঁক নেয়া, এত দ্রুত ওঠা, কিন্তু সবকিছুর ভিতর এগিয়ে এসেছে লোকটা!

গাড়ি উঠে এসেছে লেভেল পাঁচ-এ ।

সরু হয়ে গেল কেভিনের দু’চোখ । দূরে চেয়ে রইল । মরতেই যখন হচ্ছে, তো আর ভয় পেয়ে কী হবে?

দাবিয়ে দিল গ্যাস পেডাল ।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখাল অ্যান্ডুলেন্স, ঝটকা দিয়ে বাড়ল গতি ।

চল্লিশ মাইল বেগে উঠে এল শেষ বাঁকে, আরেকটু হলে কাত হয়ে আছড়ে পড়ত গাড়ি— দু’চাকার উপর ভর করেছে ।

কয়েক মুহূর্তে পৌঁছে গেল প্রকাণ্ড ছাতে ।

উপরে একটা গাড়িও নেই— ঘাসহীন ন্যাড়া বিরান প্রান্তরের মত চারপাশ ফাঁকা। অ্যাম্বুলেন্সের সিয়ারিং হুইল বনবন করে ঘুরিয়ে নিল কেভিন, আবারও ধুপ্ করে চার চাকার উপর ভর করল গাড়ি। দ্রুত আরেকদিকে সরছে বলে উল্টো দিকের দেয়ালে আছড়ে পড়ল বাউন্টি হান্টার। কেভিনের হেডরেস্টের ফোমের ভিতর রয়ে গেল তার ম্যাচেটি।

নতুন উদ্যমে গতি তুলছে কেভিন।

গাড়ির নাক তাক করেছে দূরের রেলিং লক্ষ্য করে।

‘ডক্টর! লাফ দিতে তৈরি থাকুন!’ গলা উঁচিয়ে বলল কেভিন।

রকেটের মত ছুটছে অ্যাম্বুলেন্স, কয়েক মুহূর্তে পৌঁছবে রেলিঙে।

ওটা খুবই পলকা। লাথি খেলে খসে পড়তে পারে।

সিটে নড়েচড়ে বসল কেভিন। ‘তৈরি থাকুন! এক... দুই... তি...’

পিছন থেকে ড্রাইভারের সিটের উপর হামলে পড়ল খুনি। দুই হাতে ধরেছে কেভিন এবং ডাক্তারের ঘাড়। নড়তে দেবে না!

হতভম্ব হয়ে গেল কেভিন।

এবার ওরা বেরুবে কী করে?

ঝড়ের মত আসছে রেলিং।

গতিরুদ্ধ করা এখন অসম্ভব!

বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা করল কেভিন। চরকির মত ঘুরিয়ে দিল সিয়ারিং হুইল। একইসময়ে দাঁড়িয়ে গেল ব্রেক পেডালের উপর।

ছ্যার-ছ্যার আওয়াজ তুলে পিছলে গেল অ্যাম্বুলেন্সের পিছনদিক। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে স্কিডিং।

রেলিং উড়িয়ে দিয়ে নীচে গিয়ে পড়বার কথা অ্যাম্বুলেন্সের, কিন্তু বাঁক নেয়ার ফাঁকে ব্রেক কষতেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে চার

চাকা— বন বন করে এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরল গাড়ি। দড়াম করে পিছন দিক গিয়ে লাগল রেলিঙে।

হালকা রেলিং উড়িয়ে দিয়ে শূন্যে বেরিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্সের পিছনদিক, ছাতে রয়ে গেছে সামনের সামান্য অংশ। তারপর শুরু হলো পতন। গাড়ির ভিতর থেকে বেরুতে পারেনি কেভিন, ডাক্তার বা বাউন্টি হান্টার।

এবার ষাট ফুট নীচে গিয়ে পড়বে ওরা।

কিন্তু ভাঙা রেলিঙের রডের জালে বাঁধা পড়ল অ্যাম্বুলেন্সের সামনের বাম্পার। ওটাই আটকে রাখল পতন। অবশ্য বেকায়দা ভাবে নামল গাড়ি, ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ঝুলতে লাগল।

অ্যাম্বুলেন্সের চোখ এখন বেহেস্তের দিকে। খুলে গেছে পিছনে দুই কবাট। প্যাসেঞ্জার সিটে পিঠ ঠেকিয়ে শুয়ে আছেন ডাক্তার ওয়াকার। আছেন ভালই, কিন্তু কেভিনের কপাল মন্দ।

গাড়ি রেলিঙে গুঁতো দিতেই হ্যাঁচকা টানে কেভিনকে নিজের পাশে নিয়ে এসেছে বাউন্টি হান্টার। পরক্ষণে ছুঁড়ে ফেলেছে পিছন দিকে।

আর অ্যাম্বুলেন্স খাড়া হতেই ফুটবলের মত ডিগবাজি খেয়েছে দু'জন।

গাড়ির পিছনের দুই কবাট হাট করা— ওরা দেখেছে, ষাট ফুট নীচে পাকা সিমেণ্টের চাতাল।

কেভিন ও দি আফ্রিকান হাতের কাছে যা দেখেছে, খপ্প করে ধরতে চেয়েছে।

প্রকাণ্ডদেহী লোকটা ধরেছে চাকা লক করা স্ট্রচার।

দেয়ালের একটা র্যাক ধরেছে কেভিন।

খাড়া অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর ঝুলছে ওরা, সামান্য নীচে হাঁ হয়ে আছে দরজার দুই কবাট। একবার ওদিক দিয়ে পড়লে ভর্তা হয়ে যাবে দু'জন।

মনেই হলো না ভয় বলে কিছু আছে বাউন্টি হাণ্ডারের ।

এখনও ডাক্তারের মাথাটা চাই তার ।

একহাতে স্ট্রেচার ধরেছে, অন্যহাত বাড়াল ম্যাচেটি খুলে
নিতে । ধারালো অস্ত্রটা এখনও আটকে আছে হেডরেস্টে ।

‘না!’ চাপা স্বরে বলল কেভিন, ব্যাক ধরে উঠছে ।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ওর ।

একহাতে চাকাওয়ালা স্ট্রেচার ধরেছে, অন্য হাতে খপ্পু করে
ম্যাচেটির হাতল ধরল খুনি । হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল অস্ত্রটা ।

রক্তচোখে কেভিনকে দেখল লোকটা, মুখে ফুটে উঠল ভয়ঙ্কর
অশুভ হাসি । ঠোঁট ফাঁক হতেই হলদে বড়বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে
এসেছে ।

‘বাই-বাই!’ চরম আঘাত হানবার জন্য সামান্য কাত হয়ে
ম্যাচেটি তুলল খুনি ।

‘তাই?’ আনমনে বলল কেভিন । ম্যাচেটি ঠিকই দেখেছে ।

হাত ঘুরিয়ে ম্যাচেটি চালান বাউন্টি হাণ্ডার ।

ধারালো ফলা নামছে কেভিনের মাথা লক্ষ্য করে ।

কিন্তু ওই একইসময়ে পায়ের লাথিতে স্ট্রেচারের চাকার লক
খুলে দিল কেভিন ।

ফলাফল হলো বিস্ময়কর ।

ভারী পাথরের মত রওনা হলো স্ট্রেচার । মুহূর্তে পেরিয়ে গেল
খোলা দরজা, সঙ্গে নিয়ে চলেছে দি আফ্রিকানকে!

বিকট চিৎকার ছাড়ল লোকটা ।

ধরে আছে স্ট্রেচারের পায়া । গোল হয়ে উঠেছে রক্তলাল দুই
চোখ ।

দেখতে না দেখতে দূরে চলে গেল সে ।

পড়বার সময় উল্টে গেল স্ট্রেচার । আগে মেঝের উপর পড়ল
বাউন্টি হাণ্ডার । ভয়ঙ্কর বিশ্রী থ্যাপ আওয়াজ উঠল । ফেটে গেল

দেহের সব যন্ত্রপাতি । তবুও বেঁচে রইল সে ।

অবশ্য, তা এক মুহূর্তের জন্য ।

তখনই তার মাথার উপর নামল ভারী স্ট্রেচার । চিনাবাদামের খোসার মত ফাটল লোকটার করোটি । নানাদিকে ছিটকে গেল তাজা রক্ত ও ধূসর মগজ ।

পূরের দু'মিনিট ব্যস্ত থাকল কেভিন ও ডাক্তার ওয়াকার । খাড়া অ্যান্ডুলেসের ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে উঠল বনেটে । ওখান থেকে রডের জাল ধরে ছাতে ।

কিনারায় শুয়ে পড়ল দু'জন, হাঁপাচ্ছে বেদম ।

একবার নীচে উঁকি দিল কেভিন ।

সামান্য নীচে বুলছে অ্যান্ডুলেস ।

বকবক শুরু করেছেন ডাক্তার ।

সামলে নিতে পারেননি শক ।

'ওই টেস্ট... মোটর নিউরন... মোটর নিউরন র‍্যাপিডিটি অভ রেসপন্স... আমরা দুনিয়ার সেরাদের রেসপন্স টেস্ট করছিলাম । সবধরনের প্রতিক্রিয়া... চোখের দৃষ্টি... মুখের কথা... স্পর্শ করবার গতি... সব রিফ্লেক্স ছিল ওই টেস্টের মূল বিষয় ।

'প্রায় তিন লাখ লোকের রিফ্লেক্স টেস্ট করি । প্রত্যেকের রিফ্লেক্স আলাদা । তাদের ভিতর সেরা মাত্র কয়েকজন, অন্যরা মস্তুর, বা আরও ধীর ।

'কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলেনি কেন ওই টেস্ট করতে হবে... অবশ্য নানাকিছু আঁচ করে নিয়েছিলাম আমরা । একদল বলছিল, এসব হচ্ছে কমাণ্ডো টিম সিলেকশনের জন্যে । আবার অন্যদল বলছিল, এসব হচ্ছে নতুন এক সিকিউরিটি সিস্টেম তৈরির জন্যে । ওই সিস্টেম দুনিয়া-সেরা... ব্যালিস্টিক মিসাইলের টাচলক-৯ সিকিউরিটি সিস্টেম... তারপর হঠাৎ করেই বন্ধ হলো ওই টেস্ট । বলা হলো ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্স প্রাথমিক প্রজেক্টটি বাতিল ।

করেছে। আর তাদের জানা হয়ে গেছে...'

খচ্! খটাং!

অ্যামুলেসের দিকে চেয়ে ছিল কেভিন, মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো, পাশে আওয়াজ পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে চাইল।

হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। পাশে শুয়ে আছেন ডাক্তার ওয়াকার, কিন্তু মাথাটা নেই। ধড়ের গলা থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত, ছড়িয়ে পড়ছে ছাতে।

মাথাহীন লাশের ওপাশে দাঁড়ানো এক জাপানি অপরূপা, হাতে খাটো সামুরাই তলোয়ার। অন্যহাতে চুলের মুঠো ধরে তুলে রেখেছে ডাক্তারের মাথা।

মাসু হোকামা।

বাউন্টি হাণ্টার।

অলসভঙ্গিতে ডাক্তারের মাথা দোলাল সে।

হাঁ করে চেয়ে রইল কেভিন।

মসৃণগতিতে খাপে তলোয়ার ভরল মেয়েটি, হোলস্টার থেকে নিল শ্টায়ার এসপিপি মেশিন পিস্তল, লক্ষ্য স্থির করল কেভিনের কপালে।

অস্ত্রের সাইটের উপর দিয়ে কেভিনকে দেখছে। পলক পড়ছে না দু'চোখে। চাহনি বরফের মত শীতল। এক সেকেণ্ড পর অদ্ভুতভাবে ভুরু কোঁচকাল রূপসী, থুতনি তাক করল কেভিনের দিকে। রিনরিনে কণ্ঠে বলল, 'তুমি বোধহয় বাউন্টি হাণ্টার নও?'

'না...' তিজ স্বরে বলল কেভিন। 'তা নই।'

'তা হলে দি আফ্রিকানের সঙ্গে লড়ছিলে কেন?'

'আমার এক বন্ধুর নাম উঠেছে ওই বাউন্টি লিস্টে। আমি ওকে সাহায্য করতে চাই।'

'আচ্ছা?' অবাক হয়েছে যুবতী। 'এই লোক তোমার বন্ধু?'

'না, তা নয়, আমার বন্ধু এখন অন্য দেশে।'

‘আর তুমি আফ্রিকানের সঙ্গে লড়েছ বন্ধুর জন্যে?’

‘হুঁ।’

ভুরু স্বাভাবিক হলো মাসুর, সত্যিকারের কৌতূহল নিয়ে বলল, ‘বন্ধু-পাগল, তোমার বন্ধুটির নাম কী?’

‘মাসুদ রানা।’

‘আর তোমার নাম?’

‘কেভিন কনলন।’

‘কেভিন কনলন,’ আস্তে করে উচ্চারণ করল জাপানি যুবতী।
‘আগে কখনও কারও প্রতি কাউকে এত বিশ্বস্ত হতে দেখিনি।’

‘দেখোনি?’ বলল কেভিন।

‘না।’ মাথা নাড়ল মাসু। ‘তোমার কাছ থেকে বহু কিছু শেখার আছে তোমার বন্ধুর। তুমি রীতিমত প্রেমে ফেলে দিচ্ছ আমাকে। এতে ক্ষতি হবে আমাদের।’

‘তাই?’

‘হ্যাঁ।’ আস্তে করে মাথা দোলাল তরুণী। ‘তারপরও বাঁচতে দেব তোমাকে। দেখা যাক বন্ধুকে সাহায্য করতে পারো কি না। হয়তো আবারও দেখা হবে আমাদের। তখন পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, কেভিন কনলন, তখন যদি তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে চাও, আমি বাধ্য হয়েই তোমাকেও শেষ করব। তখন কোনও সুবিধা পাবে না আমার কাছ থেকে।’

অস্ত্রটা হোলস্টারে রেখে দিল মাসু, চরকির মত ঘুরে রওনা হয়ে গেল। ডাক্তারের মাথাটা নিয়ে উঠে পড়ল নিচু ছাতের স্পোর্টস্‌ কারে।

রওনা হয়ে গেল গাড়ি।

হাই স্পিড হোগার দিকে চেয়ে রইল কেভিন।

ওর চোখ ফিরল ডাক্তারের মুণ্ডহীন ধড়ের উপর।

মাঝ আকাশ থেকে অনল বর্ষণ করছে সূর্য।

দূর থেকে কাছে আসছে পুলিশের গাড়ির সাইরেন ।
লাশের দিকে চেয়ে গলগল করে বমি শুরু করল কেভিন ।

লণ্ডনের পশ্চিমে চল্লিশ মাইল দূরে ।

পরিত্যক্ত হোয়াইটমোর এয়ারফিল্ড ।

ব্রিটিশ সময় বিকেল চারটা ।

এইমাত্র চোরাই লিঙ্কস কন্টার নিয়ে পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে
নামতে শুরু করেছে নিশাত ও খবির ।

ওদেরকে এখানেই নামিয়ে দিয়েছিল রঘুপতি ।

নিশাত-খবির আশা করেনি এখনও বসে থাকবে রঘুপতি ।
রোবট জানিয়েছিল, কিছুক্ষণ পর বিজ্ঞানীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার
জন্য ফ্রান্সে যাবে ।

কিন্তু ওরা উড়ন্ত কন্টার থেকে দেখল, পুরনো হ্যাঙারের
বাইরে পার্ক করা রয়েছে কালো বিমান । ওটাকে ঘিরে ফেলেছে
পুলিশের গাড়ি । মাথার উপর জ্বলছে লাল-নীল আলো ।

বিমানের পাশেই রানওয়েতে বিষাদ নিয়ে বসে আছে
রঘুপতি, অসহায় চেহারা । ট্রেঞ্চকোট পরা ছয়জন লোক ঘিরে
রেখেছে তাকে । এ ছাড়া লোকগুলোর সঙ্গে রয়েছে ভারী অস্ত্র
সজ্জিত এক প্লাটুন রয়াল মেরিন ।

কন্টার নিয়ে আকাশ থেকে নেমে আসতেই আটক করা হলো
নিশাত ও খবিরকে ।

ওদের দিকে এগিয়ে এল ট্রেঞ্চকোটদের একজন । রয়সে
যুবক সে, হাতে সেলফোন । ওদিকের কারও সঙ্গে কথা বলছে ।

উচ্চারণে বোঝা গেল, সে আমেরিকান ।

‘ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা এবং সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত
খবির, আমি চার্লস ডেলাত্রুস । লণ্ডন অফিসের ইউএস স্টেট
ডিপার্টমেন্টে আছি । জানতে পেরেছি, আপনারা বিসিআই এজেন্ট

মাসুদ রানাকে সহায়তা করছেন। তিনি প্রাণ বাঁচাতে লড়ছেন। আরও জেনেছি, একটি আন্তর্জাতিক বাউন্টি হান্ট চলছে। ...আমি কি ঠিক বলেছি?’

আন্তে করে মাথা দোলাল নিশাত ও খবির।

‘হ্যাঁ... তা ঠিকই বলেছেন,’ বলল নিশাত।

‘ইউনাইটেড স্টেটস সরকার এই বাউন্টি হান্ট সম্পর্কে বহু কিছুই জেনেছে। তথ্য যা পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে: আমাদের দেশের জন্য বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানাকে জীবিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ...আপনারা কি জানেন তিনি এখন কোথায়?’

‘হয়তো জানি,’ বলল নিশাত, ‘আগে বলুন কেন ওঁকে চাই আপনারা।’

‘মস্ত কোনও ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছেন আপনারা?’ টিটকারির সুরে জানতে চাইল খবির।

লালচে হয়ে গেল চার্লস ডেলাক্রুসের গাল। ‘আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না।’

‘আরে বলে ফেলুন,’ হালকা সুরে বলল নিশাত। ‘আমরা মুখ খোলার আগে আপনারা পেটের খবর জানতে চাই।’

‘প্লিজ, ম্যাম, আমি সামান্য বার্তাবাহক,’ নরম স্বরে বলল যুবক। ‘পুরো কাহিনি শুনবার ক্লিয়ারেন্স নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনারা কোনও ক্ষতি করে দেয়া বা আটক করবার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে: এক বা একাধিক লোক ওই বাউন্টি হান্টের পিছনে জড়িত। তাদের এমনই ক্ষমতা, ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এর বাইরে কোনও তথ্য আমাকে দেয়া হয়নি। জানিও না তেমন কিছু।’

‘শুধু জানি: ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছেন আমাকে। নির্দেশের শুরুতেই উনি জানিয়ে দিয়েছেন: আপনারা সাহায্য চাইলে, তা দেব আমরা। মেজর রানাকে জীবিত রাখবার কাজে আসবে, এমন যে-কোনও কিছু চাইলেই দেয়া হবে। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সে ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়েছে। আপনারা প্রয়োজনে অস্ত্র চাইতে পারেন। নির্দেশ অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে তা জোগান দেব। যদি টাকা লাগে, সঙ্গে সঙ্গে হাজির করব। মুখ ফুটে শুধু জানান পরিমাণ। যদি চান এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে কোথাও যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাই করা হবে।’

‘তা হলে একদিনের জন্য প্রেসিডেন্ট হতে চাই,’ বিড়বিড় করল খবির।

‘কী কারণে আপনাকে বিশ্বাস করব আমরা?’ জানতে চাইল নিশাত।

ওর দিকে সেলফোন বাড়িয়ে দিল ডেলাক্রুস।

ওটা নিয়ে কানে লাগাল নিশাত।

‘ওদিকে কে? কী বলবেন শুনি?’

‘ক্যাপ্টেন নিশাত?’ গম্ভীর কণ্ঠ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ওই কণ্ঠ চিনে ফেলল নিশাত। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট।

এয়ার বেস যিরো নাইন মিশনে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওর।

ওই গলা অন্য কারও নয়।

‘ক্যাপ্টেন নিশাত,’ বললেন প্রেসিডেন্ট। ‘ইউনাইটেড স্টেটস সরকারের সমস্ত ক্ষমতা আপনি ব্যবহার করতে পারেন। যা লাগবে, শুধু জানিয়ে দিন আগারসেক্রেটারি ডেলাক্রুসকে। যে ভাবে হোক জীবিত রাখতে হবে মেজর রানাকে। ...আপাতত মিটিঙে যোগ দেব। পরে আবারও কথা হবে।’

খুট করে কেটে গেল ফোন যোগাযোগ।

‘তার মানে মস্ত বিপদে পড়িনি,’ বিড়বিড় করল নিশাত।

‘ওঁর কথা তো নিজ কানেই শুনলেন,’ বলল ডেলাক্লুস। ‘এ মুহূর্তে কী চাই আপনাদের?’

চোখে চোখে কথা হলো নিশাত ও খবিরের।

‘খবির,’ বলল নিশাত, ‘তুমি যাও ঐর সঙ্গে, খুঁজে বের করবে আসলে কী ঘটছে। এদিকে আমি যাব স্যরকে সরিয়ে নিতে।’

আস্তে করে মাথা দোলাল খবির।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রঘুপতির দিকে চাইল নিশাত। কিন্তু কথা বলল ডেলাক্লুসের উদ্দেশে, ‘ওকে চাই আমি। ওর বিমানটাও লাগবে। ভরে দেবেন বিমানের ট্যাঙ্ক। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ড ছাড়ার অনুমতিও চাই। আমরা জানি এ মুহূর্তে কোথায় আছেন মাসুদ স্যর। আগে ওঁকে সরিয়ে আনতে হবে।’

‘আমি বোধহয় অনেক দ্রুত ওঁকে সরিয়ে...’

‘হয়তো,’ ডেলাক্লুসকে থামিয়ে দিল নিশাত, ‘কিন্তু আমরা এখনও আপনাকে বিশ্বাস করি না।’ রঘুপতিকে দেখাল। ‘ও সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত। তা ছাড়া, ওর বদলে অন্য কেউ এত দ্রুত আমাকে ফ্রান্সে পৌঁছে দিতে পারবে না।’

‘ঠিক আছে,’ নিজের এক লোকের দিকে চাইল ডেলাক্লুস। ‘বিমানে ফিউয়েল পাম্প করো। আকাশ ফাঁকা রাখতে বলো।’ খবিরের দিকে ফিরল সে। ‘আর আপনি কী করবেন, সার্জেন্ট?’

‘আপা, আপনার কপাল ভাল থাকুক,’ বলল খবির। ‘স্যরকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনুন।’

‘তা আমি করব,’ নিশ্চয়তা দিয়েই বলল নিশাত। পা বাড়াল রঘুপতি ও সুখোই ফাইটার বিমানের দিকে।

পাঁচ মিনিট পর ভরে গেল বিমানের ট্যাঙ্ক। পরের মিনিটে আকাশে উঠল ফাইটার, আফটারবার্নার ব্যবহার করে তীব্র গতি তুলে রওনা হয়ে গেল।

নিশাত ও রঘুপতিকে নিয়ে বিমান উধাও হতেই ডেলাক্লুসের দিকে চাইল খবির। ‘আমার একটা ডিভিডি প্লেয়ার লাগবে।’

উনিশ

ব্রিটানি-আটলান্টিক উপকূল, ফ্রান্স।

ফো’ট্রেস দো শ্যাটিয়ন।

বিকেল সাড়ে চারটা।

মেইন ল্যাণ্ড ও দুর্গের মাঝের প্রকাণ্ড পাথুরে সেতু পেরতে শুরু করেছে তিনজন মানুষ— মাসুদ রানা, কুয়াশা ও তিশা করিম। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সাদা মেডিকেল ট্রান্সপোর্ট বক্স।

তিনটে বাক্স মানেই তিনটে ছিন্ন মাথা।

রানা আপাতত দুনিয়ার সেরা কাক্ষিত লোকগুলোর একজন। জানে, ঢুকতে চলেছে ক্ষুধার্ত সিংহের গুহায়। এখান থেকেই পরিচালিত হচ্ছে বাউন্টি হান্ট।

মেকআপ করে, রানা ও তিশার মুখ সামান্য বদলে দিয়েছে কুয়াশা।

রানা ও তিশার পরনে বাউন্টি হান্টার দল কন্টিনেন্টাল সোলজারদের কালো ব্যাটল ইউনিফর্ম, মাথায় হেলমেট। সুবই এসেছে হারকিউলিস বিমান থেকে। নিজেদের অস্ত্র তো আছেই, এ ছাড়া রয়েছে মেটালস্টর্ম রাইফেল। পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য চোয়ালে দুটো রক্তাক্ত রুমাল বেঁধেছে রানা। চোখে রে-ব্যান

সানগ্লাস। মুখের বেশিরভাগই ঢাকা পড়েছে।

ওর পকেটে রয়েছে কুয়াশার মডিফায়েড পাম পাইলট।

দুর্গের ডোরবেল বাজাল কুয়াশা। 'আগের মতই ওর পরনে কালো আলখেল্লা। নিচু স্বরে সে বলল, 'বাক্সগুলো আমার হাতে দিয়ে দাও। অ্যাসেসরের কাছে দেব। সে অপেক্ষা করতে বলবে তোমাদেরকে। শুনেছি জায়গাটা কারাগারের মত।'

'কারাগারের মত?'

'হুঁ। অ্যাসেসর চায় না কোনও বাউন্টি হান্টার তার অফিসে ঢুকুক। নইলে কমপিউটার ব্যবহার করে ফ্লাগ সরিয়ে নিত কেউ। শুনেছি আগেও এমন হয়েছে। কাজেই নিজেকে রক্ষা করতে ভয়ঙ্কর সব পদ্ধতি ব্যবহার করে অ্যাসেসররা। ...আর যার কথা ভাবছি, এ লোক সে হলে তাকে খুনি-পিশাচও বলতে পারো।'

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল কুয়াশা। 'যাই হোক, চোখ রেখো পাম পাইলটের স্ক্রিনে। দেখা যাক কমপিউটার থেকে কী ধরনের তথ্য আসে। হয়তো জানা যাবে কে বা কারা গুরু করেছে এই বাউন্টি হান্ট।'

নিজের পকেটে একই ধরনের পাম পাইলট রেখেছে কুয়াশা। ওটা ইনফ্রা-রেড ব্যবহার করে ডেটা ট্রান্সফার করে। কোনও তারের সংযোগ লাগে না, কমপিউটারের হার্ডডিস্ক থেকে নিয়ে নিজের মগজে রাখে তথ্য। সোজা কথায়, কুয়াশার যন্ত্র যে-কোনও কমপিউটারের ডেটা চুরি করতে পারে। সেজন্য ওটাকে নিতে হয় কমপিউটারের দশফুটের ভিতর।

খুলে গেল দুর্গের প্রকাণ্ড কবাট।

সুসজ্জিত পোশাকে দেখা দিল মোসিউ ড্যাবলার।

'কাকে চাই, মোসিউরস?'

'আমি কুয়াশা। অনেকে চেনেন মিস্টার ফগ নামে।'

‘আগেও আপনার নাম শুনেছি... প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। ...কী করতে পারি আপনার জন্যে?’

‘বাধ্য হয়ে বাউন্টি হান্ট করছি। টাকার প্রয়োজন সবারই।’

‘তাই?’

‘মোসিউ ড্যাবলার, আমি এবং আমার সঙ্গে দু’জন বাউন্টির টাকা নিতেই এসেছি।’

‘নিশ্চয়ই নেবেন,’ শুকনো স্বরে বলল ড্যাবলার। ‘আপনাদের দুজনের পরনে দেখছি কণ্টিনেন্টাল সোলজারদের ছেষটি ইউনিটের পোশাক।’

‘এরা ওই ইউনিটেরই লোক,’ জানাল কুয়াশা। ‘আমাকে সহায়তা করছে।’

‘জানতাম না ডেভিড এন. হেঞ্জিক নতুন লোক নিয়েছে।’

‘আজকাল ভাল লোক পাওয়া কঠিন,’ বলল কুয়াশা। ‘হেঞ্জিক ভাগ্যবান লোক।’

‘তা অবশ্য ঠিক,’ মাথা দোলাল ড্যাবলার। ‘বেশ, আমার সঙ্গে আসুন।’

দুর্গের শো-রুমের মত গ্যারাজে এসে ঢুকল সবাই।

দুর্লভ গাড়িগুলো দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না রানা। কী নেই গ্যারাজে: সারা দুনিয়ার সেরা সব গাড়ি।

সবার আগে হাঁটছে ব্যাঙ্কার ড্যাবলার। সামনে রেখেছে হ্যাণ্ডকার্ট, ওটার উপর তিনটি সাদা বাক্স।

‘চমৎকার দুর্গ,’ মন্তব্য করল কুয়াশা।

‘সত্যিই দেখার মত,’ প্রশংসা ঝরল ব্যাঙ্কারের কণ্ঠে।

‘দুর্গের মালিক কে?’

‘অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোক।’

‘তার নাম জানতে...’

‘দুঃখিত, অনেক সময় আমাকে বাধ্য হয়েই মক্কেলের নাম

গোপন করতে হয়। এ ক্ষেত্রেও বলে দেয়া হয়েছে, মুখ বুজে রাখতে হবে।’

‘আচ্ছা।’ চুপ হয়ে গেল কুয়াশা। কয়েক মুহূর্তে পর জানতে চাইল, ‘সঙ্গে অস্ত্র রাখলে আপত্তি নেই তো?’

‘না, নেই।’ মনে হলো না চিন্তিত ড্যাভলার। ‘ওই জিনিস এখানে কাজে আসবে না।’

গ্যারাজের শেষে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা। সামনেই গোলাকার পাথুরে অ্যান্টিকুম। এখান থেকে দূরে হারিয়ে গেছে সরু সুড়ঙ্গ।

থামল ড্যাভলার। ‘আপনার দুই সঙ্গীকে এখানেই থাকতে হবে, মিস্টার কুয়াশা।’

রানা ও তিশার দিকে মাথার ইশারা করল কুয়াশা। ‘ভাববেন না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে দরজা বোধহয় লক করে দেয়া হবে।’

দেয়াল ঘেঁষা চামড়ার আরামদায়ক কাউচে বসে পড়ল রানা ও তিশা।

মশাল প্রজ্জ্বলিত সরু টানেলে কুয়াশাকে পথ দেখাল ব্যাঙ্কার। আগুনের হলদে আলো পড়ছে চারপাশে।

প্যাসেজওয়ের শেষে পৌঁছে গেল ওরা। সামনে অত্যন্ত দামি আসবাবপত্রে সজ্জিত অফিস। কুয়াশাকে টানেলে রেখে অফিসে ঢুকে পড়ল ব্যাঙ্কার। হাতে রিমোট কন্ট্রোল।

দড়াম! দড়াম! দড়াম!

টানেলের দু’দিকে নামল স্টিলের দরজা। টানেলে আটকা পড়ল কুয়াশা। অ্যান্টিকুমে বান্দি হয়েছে রানা ও তিশা।

চোখের পাতাও পড়ল না কুয়াশার।

কাটা মাথাগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করেছে ব্যাঙ্কার। এসব কঙ্গোতে সংগ্রহ করেছিল ডেভিড এন. হেঞ্জিক। আলাল হোসেন,

আজিজ আমিন ও চার্লস আর. কোসলোস্কির মাথা। ওগুলোর উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে লেসার স্ক্যান, ডেন্টাল পরীক্ষা, ডিএনএ টেস্ট...

দীর্ঘ পাথুরে টানেলে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। অপেক্ষা করছে। আপাতত বন্দি।

দেয়ালে ফুটন্ত তেলের নর্দমা চোখে পড়ল তার।

‘জঘন্য,’ বিড়বিড় করে বলল।

স্টিলের দরজার বুকে পুরা প্লাস্টিকের জানালা। ওদিক দিয়ে দেখা গেল ড্যাবলারের অফিসের ভেতরের অংশ।

ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে সুইস ব্যাঙ্কার। ডেস্কের ওদিকে মস্ত পিকচার উইণ্ডো। বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে আটলান্টিক মহাসাগর। নীলের বিস্তৃতি উদাস করে তোলে মন। নিজের প্রিয় বঙ্গোপসাগরের কথা মনে পড়ল কুয়াশার। কী অদ্ভুত সুন্দর ওর দেশের সাগরটা!

দূরে দেখা গেল দিগন্তের কাছে একের পর এক নেভাল ভেসেল। ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট... মস্ত এক এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে ঘিরে রেখেছে। প্রকাণ্ড জাহাজটাকে চিনল কুয়াশা— চার্লস দ্য গল ক্লাস ক্যারিয়ার, নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড।

সাগরে জড় হয়েছে ক্যারিয়ার ব্যাটল গ্রুপ।

ফ্রেঞ্চদের।

অ্যান্টিরুমে চুপ করে বসে আছে মাসুদ রানা ও তিশা।

সিলিঙের কাছে ছরছর আওয়াজ তুলছে কী যেন।

ওদিকে চাইল রানা।

অদ্ভুত চেহারার ছয়টি অ্যান্টেনা, গাঁথে আছে দেয়ালে। দেখে মনে হলো, কোনও ধরনের স্টেরিও স্পিকার।

অবশ্য, রানা বুঝে গেল ওগুলো মাইক্রোওয়েভ এমিটার।

• ছিরছির আওয়াজটা আসছে সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে ।

‘আমাদের ওপর চোখ রাখছে,’ নিচু স্বরে বাংলায় বলল রানা ।

দুর্গের দূরের কোনও কামরায় সাদা-কালো মনিটরে রানা ও তিশাকে দেখছে এক লোক গভীর মনোযোগে । বিশেষ করে নজর তার রানার ব্যাণ্ডেজ ও সানগ্লাসের উপর ।

সমস্ত টেস্ট শেষ করেছে মোসিউ ড্যাবলার । টানেলে বন্দি কুয়াশার দিকে চাইল সে ।

‘মিস্টার কুয়াশা,’ ইন্টারকমে বলল, ‘কংথ্র্যাচুলেশস । প্রতিটি মাথা পারফেক্ট স্কোর করেছে । আপনারা পাবেন নিরানব্বুই মিলিয়ন ডলার ।’

রিমোট কন্ট্রোলের বাটন টিপল সে, স্লট থেকে উপরে উঠল তিন দরজা ।

ড্যাবলারের অফিসে ঢুকল কুয়াশা । মস্ত ডেস্কের পিছনে বসে পড়ল সুইস ব্যাঙ্কার । ল্যাপটপের কিবোর্ডে টোকা দিতে শুরু করেছে ।

‘হুম্,’ কিবোর্ডে আরও কয়েকটা টোকা দিল, ‘আপনারা বাউন্টির টাকা কোন্ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবেন?’

‘আপনার ব্যাঙ্কেই আমার অ্যাকাউন্ট আছে, ওখানে পাঠিয়ে দিন,’ ওই কমপিউটারের উপর চোখ কুয়াশার । পাম পাইলটের ট্রান্সমিট বাটন টিপে দিল ।

দুই কমপিউটারের ভিতর তথ্য আদান-প্রদান শুরু হয়েছে ।

পাথরের অ্যান্টিরুমে পাম পাইলট জেগে উঠেছে, দেখল রানা ।

দ্রুত আসছে ডেটা । নাম, সংখ্যা এবং ডায়াগ্রাম ফুটে উঠছে স্ক্রিনে:

.....
সোর্স। ডেলিভারি সিস্টেম। লি-এইচ। অরিজিন। টার্গেট। টাইম।
.....;

ট্যালবট:

সাহাব- টিএন৭টি ৩৫৭০২.	০০০০১.	১১:৪৫
৫	২০ ৬৫	
	৫০০২. ৫২৪১.	
	০০ ২০	

.....
সাহাব-

৫ টিএন৭বি ৩৫৭০২.	০০৪২০-	১১:৪৫
	টি ও ০২	
	৫০০২. ৪১০০-	
	০০ ৩৫	

.....
সাহাব-

৫ টিএন৭বি ৩৫৭০৩.	০১৩১২.	১১:৪৫
	৯১ ২৫	
	৫০০২. ৫৩৫৮.	
	০০ ৮৫	

.....
অ্যামব্রোস:

সাহাব-

৫ টিএন৭বি ২৬৭৫৩.	২ ফ্লাইট?	১২:০০
	০৬ ৪৪.১ ফ্লাইট	
	৪৫০৪-	
	৪৫ ৪৫০৪-বি-৪	

একযেকিউটিভ ইটিনেৰাৰি

দ্য প্রোপোষড অৰ্ডাৰ অফ ট্ৰাভেল ইয অ্যায ফলোয: আসমাৰা
(২৪/০৬), লৌণ্ডা (২৪/০৬), আবুজা (২৭/০৬), নাযামেনা
(২৭/০৬) এবং তব্ৰুক (২৯/০৬).

০১/০৭ – আসমাৰা (এম্বেসি)

০৩/০৭ – লৌণ্ডা (থাকছি ওলিফ্যান্টের ভাতিজার ওখানে)

শেষ ডকুমেন্ট চিনল রানা। একটা বাউণ্ডি লিস্ট।

নাম

দেশ অৰ্গানাইযেশন

১ ক্যাপলান এম. স্কট	ইউ.কে.	এসএএস
২. ডওসন কে. রিচার্ড	ইউ.কে.	এমআই-৬
৩. অ্যাটলক, হার্লি	ইউএসএ	ডেল্টা
৪. আমিন, আজিজ	লেবানন	আলকায়েদা
৫. কার্লটন, রবিন	ইউএসএ	মেরিন
৬. চার্লস আর, কোসলোস্কি	ইউ.কে.	এসএএস

অন্যান্য ডকুমেন্ট ডাউনলোড করছে পাম পাইলট, কিন্তু সাবধানে
আড়াল তৈরি করে হত্যা তালিকায় চোখ বোলাল রানা।

একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র অন্যতম নেতা কার্ট কে. এবেলহার্ডের কাছ থেকে যে তালিকা পেয়েছিল, তার সঙ্গে এর সামান্য তফাৎ আছে।

কিছু নাম ছাই রঙে হাই লাইট করা।

মৃতের জন্য ধূসর রং, ভাবল রানা।

মেরুদণ্ড বেয়ে নামল শীতল অনুভূতি।

লাশ হয়ে গেছে অনেকেই।

স্কট এম. ক্যাপলান এবং রেমণ্ড কে. গ্র্যাঞ্জারের নাম ওই তালিকায় তুলে দিতে পারবে রানা। স্পেৎন্যায বাউন্টি হান্টাররা ক্যাপলানকে শেষ করেছে কঙ্গোর খনির ভিতর। আর কার্গো বিমানে নিহত হয়েছেন জেনারেল রেমণ্ড কে. গ্র্যাঞ্জার।

এ তালিকার পনেরোজনের ভিতর এখনও বেঁচেবর্তে আছে মাত্র পাঁচজন।

তালিকায় আরও মনোযোগ দিল রানা।

ভীষণ অস্বস্তি মনে, কিন্তু বিষয়টি কী বুঝতে পারছে না...

তারপর আরেকটা ডকুমেন্টে 'অ্যাসেসর' শব্দটা চোখে পড়ল।

ওই ডকুমেন্ট ওপেন করল রানা।

ওটা একটা ই-মেইল:

বিষয়: অ্যাসেসরের কমিশন

অ্যাসেসরের প্রাপ্য কমিশন দেয়া হবে ইন্টারনাল ইলেকট্রনিক ফাণ্ডের মাধ্যমে। অ্যাসেসর টাকা পাবেন স্করপিয়ন-১৫ প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের (নং ১২৪-৪৪৪-২৪) মাধ্যমে। প্রতিটি অ্যাসেসমেন্টের জন্য তাঁকে দেয়া হবে ইউএস ৫ মিলিয়ন ডলার।

এজিএম-সুইস ব্যাঙ্কের মোসিউ পি. এস. ড্যাবলার অ্যাসেসরের দায়িত্ব নেবেন।

শব্দগুলোর উপর আবারও চোখ বোলাল রানা।

স্করপিয়ন-১৫ থাইভেট লিমিটেড, ভাবল।

টাকা দেবে ওই কোম্পানি থেকেই।

তারাই আয়োজন করেছে বাউন্টি হান্ট।

চমৎকার পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠ বলে উঠল, ‘গুড মর্নিং।’

মুখ তুলে চাইল রানা ও তিশা।

পাথুরে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়েছে এক হ্যাণ্ডসাম যুবক, এইমাত্র গ্যারাজ থেকে ঢুকেছে অ্যাণ্টিক্রুমে। বয়স পঁচিশ থেকে সাতাশ। পরনে ডিযাইনার জিন্স। টি-শার্টের উপর রালফ্ লরেন্স শার্ট। অত্যন্ত অভিজাত মনে হলো তাকে।

যুবকের চোখে অস্বাভাবিকতা দেখল রানা।

তার এক চোখের মণি গাঢ় নীল, অন্যটা পচা ডিমের কুসুমের মত হলদেটে।

‘আমার দুর্গে আপনাদের স্বাগতম,’ যুবক হাসল। কিন্তু ওই হাসি কেন যেন রানার ভাল লাগল না। মনে হলো, এ লোক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। ‘জানতে পারি আপনারা কারা?’

‘ক্লিণ্ট, জন ক্লিণ্ট,’ নিজ পরিচয় দিল রানা। ‘ইনি জেসিকা রনসন। মিস্টার ফগের সঙ্গে এসেছি। কয়েকটি বাউন্টি এনেছি মোসিউ ড্যাবলারের জন্যে।’

‘ও, আচ্ছা...’ বলল যুবক। রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য।

‘ডেমিয়েন... ডেমিয়েন ডগলাস। আপনাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ঝঙ্কি পোহাতে হয়েছে। আপনাদের জন্যে কোনও ড্রিঙ্ক বা খাবারের ব্যবস্থা করি?’ করমর্দনের সময় রানাকে দেখল মনোযোগ দিয়ে। ‘আপনি চাইলে আমার ব্যক্তিগত ডাক্তার আপনার ব্যাণ্ডেজ পাল্টে দিতে পারে। ক্ষতগুলোও পরিষ্কার করা

উচিত।’

চট করে সরু টানেল দেখল রানা। চোখ খুঁজছে কুয়াশাকে।

‘প্লিথ, আসুন...’ সিঁড়ি দেখাল ডগলাস।

কোনও আপত্তি তোলা একেবারেই অনুচিত হবে, উঠে দাঁড়াল রানা ও তিশা। অনুসরণ করল লোকটার।

‘আগেও আপনাকে দেখেছি,’ পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা। ‘টিভিতে...’

‘মাঝে মাঝে আমাকে ওই রূপালি পর্দায় মুখ দেখাতে হয়।’

‘আপনি আফ্রিকায় ছিলেন,’ বলল রানা, ‘গতবছর। একের পর এক ফ্যাক্টরি উদ্বোধন করছিলেন। খাবারের ফ্যাক্টরি। নাইজেরিয়ায়...’

এখন সামান্যতম মিথ্যা বলছে না রানা।

আফ্রিকার ক’জন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করছিল এ লোক। সামনের মস্ত মাঠে ছিল হাজারো শ্রমিক, হাসি-খুশি।

ওরা আবার চলে এসেছে ক্লাসিক সব গাড়ির গ্যারাজে।

‘আপনার স্মৃতি জোরালো,’ বলল ডগলাস। ‘ইরিত্রিয়া, চাদ, অ্যাঙ্গোলা এবং লিবিয়ায় গিয়েছিলাম। এসব দেশে বসাই নতুন ফুড প্রসেসিং প্লান্ট। কেউ কেউ আজও জানে না পৃথিবীর ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে ওই আফ্রিকাতেই।’

‘আপনার গাড়ির কালেকশন সত্যিই ঈর্ষণীয়,’ মন্তব্য করল তিশা।

‘ওগুলোকে খেলনা বলতে পারেন,’ বলল ডগলাস। ‘সামান্য খেলনা। এর বেশি কিছু নয়।’

গ্যারাজের একদিকের শাখা টানেলে ঢুকল ওরা। সুড়ঙ্গের মেঝে কুচকুচে কালো, দুই দেয়াল ধবধবে সাদা।

‘আমি অবশ্য নানান খেলনা নিয়ে খেলতে ভালবাসি,’ বলল ডেমিয়েন। ‘মানুষ নিয়ে খেলতেও মজা লাগে। কঠিন পরিস্থিতিতে

মানুষ কী করে, তা দেখে খুব উৎসাহিত হই।’

কাঠের মস্ত এক দরজার সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। দরজার ওদিকে হাসির আওয়াজ। পুরুষ কণ্ঠ। যেন পার্টি চলছে ওদিকে।

‘আপনি বলছিলেন কঠিন পরিস্থিতির কথা,’ বলল রানা। গলা শুকিয়ে গেছে। ‘আসলে কী বোঝাতে চাইছেন, ডগলাস?’

‘যেমন ধরুন, পশ্চিমারা বোঝে না কেন ইসলামপন্থীরা বোমা দিয়ে নিজেদেরকে উড়িয়ে দেয়। ছোটবেলা থেকে পশ্চিমা বাচ্চাদেরকে শেখানো হয় লড়তে হবে সমানে সমানে। লড়াই যেন হয় ন্যায্য। ফ্রেঞ্চরা দশ কদম দূর থেকে ডুয়েল করত, ইংরেজরাও দূরত্ব দিয়ে জস্টিং করত, আমেরিকার বুনো পশ্চিমের শহরের রাস্তায় মুখোমুখি লড়ত গানস্টিংগাররা। পশ্চিমা দুনিয়ায় লড়াই জিনিসটা ন্যায্য সঙ্গত। কারণ ধরে নেয়া হয়েছে, দুই পক্ষই বিজয়ী হতে চাইবে। এটা সত্যিকারের ন্যায্য চিন্তা।’

‘ডেমিয়েন থেমে যেতেই বলল রানা, ‘কিন্তু আত্মহত্যাকারী বোমাবাজরা অন্যভাবে চিন্তা করে, আপনি বোধহয় তাই বোঝাতে চাইছেন?’

‘ঠিকই ধরেছেন,’ বলল ডগলাস। ‘বোমাবাজ বিজয়ী হতে চায়। কিন্তু লড়াই তাদের কাছে মূল্যহীন। আরও মস্ত এক লড়াই তাদের সামনে। মানসিক লড়াই ওটা। ইচ্ছের বিরুদ্ধে মরতে চায় কেই-বা, তবুও এরা শেষ করে নিজ জীবন— আশা করে আরও বহু মানুষ কষ্ট পাবে এবং মরবে তার কারণে। আত্মহত্যাকারী বোমাবাজ মনে করে এর মাধ্যমে আত্মিকভাবে বিজয়ী হবে সে।’

‘যখন কোনও পশ্চিমা ছিন্নভিন্ন হচ্ছে বোমার আঘাতে, ধরে নেয়া হচ্ছে, সে যাবে নরকে। নিজ চোখে এসব মানুষকে মরতে দেখেছি। কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, বা হাঙরের মুখে ফেলে দেয়া হয়েছে কাউকে... আসলে মানুষের সত্যিকারের আতঙ্ক

দেখতে ভাল লাগে আমার। যখন বোঝে কীভাবে মরতে চলেছে,
তখন মুখে ফোটে দারুণ আতঙ্ক। দারুণ দৃশ্য!

দরজা খুলতে শুরু করেছে ডেমিয়েন ডগলাস।

আর তখনই সব বুঝে গেল রানা।

সমস্যা ওই মাস্টার লিস্টেই।

হার্লি অ্যাটলক এবং রবিন কালটনের নাম ধূসর শেডে।
গতকাল সকালে সাইবেরিয়ায় নিহত হয়েছে ওরা। এবং মৃতের
তালিকায় তুলে দেয়া হয়েছে ওদের নাম।

অর্থাৎ, টাকা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে!

অথচ সাইবেরিয়ার ওই ওয়্যারহাউস বা বাউন্টি হান্টারদের
ধুলোয় মিশে যাওয়ার কথা মিসাইলের আঘাতে!

প্রকাণ্ড দরজা খুলেছে।

ওদিকে মস্ত ডাইনিং রুম।

টেবিল ঘিরে একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র কমপক্ষে
বিশজন বাউন্টি হান্টার!

সামনে দামি খাবার, পাশে দুর্লভ সোনালি পানীয়, কাছের
অ্যাশট্রেতে সিগারেট বা চুরুট।

টেবিলের একমাথায় ব্যাণ্ডেজে মোড়া ভাঙা নাক নিয়ে নতুন
পোশাকে বসে আছে কার্ট কে. এবেলহার্ড!

ধড়াস্ করে মস্ত লাফ দিল রানার হৃৎপিণ্ড।

‘আর এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই দেখি সাধারণ মানুষের মুখে,’
বলল ডগলাস। সরু ঠোঁটে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হাসি। ‘স্বাগতম
আমার দুর্গে, মেজর মাসুদ রানা!’

যা বুঝবার বোঝা হয়ে গেছে।

পরস্পরের দিকে চাইল রানা ও তিশা, পরস্পরে ঘুরেই ঝেড়ে
দৌড় লাগাল।

যেন লেজ আকাশে তুলে উড়ে চলেছে।

পিছনে পড়ে রইল ডাইনিং রুম।

করিডোর ধরে তীরের মত ছুটছে রানা ও তিশা।

পিছনে শুনল ডগলাসের পেটফাটা হাসির আওয়াজ।

একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র বাউন্টি হান্টাররা লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়েছে, খপ্ করে তুলে নিয়েছে যার যার অস্ত্র, পরক্ষণে শুরু করল ধাওয়া।

পাঁই-পাঁই করে ভাগছে ওদের সাধের তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার!

দুর্গের মালিক ডেমিয়েন ডগলাসকে ঝোড়ো গতিতে পাশ কাটাল লোকগুলো।

‘এত দামি গাড়ির কোন্টা নেব ভাবতে গিয়ে মাথা গরম হচ্ছে,’ মুখ থেকে ব্যাণ্ডেজ ছুঁড়ে ফেলল রানা।

গ্যারাজের দরজার কাছ থেকে নিচু স্বরে বলল তিশা, ‘যেটা তোমার খুশি।’ চট করে কাঁধের উপর দিয়ে করিডোরের দিকে চাইল। ধূপধাপ বুটের আওয়াজ আসছে। ‘বড়জোর দশ সেকেন্ড পাবে, রানা। দ্রুতগতি কোনও গাড়ি নাও।’

একসেকিউশন জিটি-২? রূপালি রঙের। খোলা টারগা টপ। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী গাড়ি, যেন বুনো মোষ।

না, পছন্দ হলো না, সরে গেল রানা। চলে এল একই গতির র‍্যালি কারের পাশে। ওটা ইলেকট্রিক ব্লু টার্বো-চার্জড সুবারু ডার্লিউআরএক্স।

নয় সেকেন্ড পর গ্যারাজে এসে ঢুকল একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র বাউন্টি হান্টাররা। তখনই দেখল, শো-রুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে ডার্লিউআরএক্স। এরই ভিতর গতি তুলেছে ষাট মাইল!

শো-রুমের শেষমাথায় গ্যারাজের দরজা খুলছে। মস্ত কবাটের পাশে তিশা, হাতে ডোর ওপেনার রিমোট কন্ট্রোল।

গুলি শুরু করল বাউন্টি হান্টাররা।

তখনই পলকের জন্য তিশার পাশে থামল রানার র্যালি কার।

‘উঠে পড়ো, তিশা!’

‘কুয়াশার কী হবে, রানা?’

‘উনি বুঝবেন আমাদের সমস্যা।’

‘জটিল, কঠিন সমস্যা,’ বিড়বিড় করল তিশা। সুবারুর
প্যাসেঞ্জার জানালা দিয়ে চড়ুই পাখির মত উড়ে ভিতরে নামল ও।

সামনে দুর্গের দেয়াল ঘেরা উঠান।

গ্যারাজের মুখে স্পেৎন্যায কোবরা দলের মেজর মিখাইল
পেদরোনভকে দেখতে পেল ওরা।

মস্ত হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে।

পাশে কোবরা ইউনিটের ছয় কমাণ্ডো।

একজনের হাতে মেডিকেল ট্রান্সপোর্ট বক্স।

নুড়িপাথরে ভরা উঠানের আরেকদিকে নেমেছে এমআই-৩৪
হেলিকপ্টার। স্পেৎন্যায কমাণ্ডোদের পিছনে এখনও বনবন করে
ঘুরছে রোটর।

‘যাহ্, সমস্যা আরও বাড়ল,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল তিশা।

গ্যারাজের দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনে মোসিউ ড্যাবলারের
অফিসে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা।

চট করে চাইল অ্যান্টিরুমের দিকে।

ওখানে রানা বা তিশা নেই।

‘আবার কী হলো,’ বিড়বিড় করল কুয়াশা। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে
এল অফিস থেকে।

কমপিউটার থেকে চোখ তুলেও চাইল না মোসিউ ড্যাবলার।

গ্যারাজের মুখে মেজর মিখাইল পেদরোনভের সামনা-সামনি

হয়েছে রানার টার্বো-চার্জড ডার্লিউআরএক্স ।

পরস্পরের চোখে চাইল দুই দেশের দুই পুরুষ ।

রাশান মেজরের চোখ থেকে বিদায় নিল বিস্ময়, সেখানে ঠাই
নিল ভয়ঙ্কর ঘৃণা ।

‘গতি তোলো, রানা!’ চাপা স্বরে বলল তিশা ।

মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরল রানা ।

ঝটকা দিয়ে রওনা হলো র্যালি কার । সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল
গ্যারাজ থেকে । দু’পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ রক্ষা করল স্পেৎন্যায়
কমাণ্ডেরা ।

তীর গতি তুলে দুর্গের উঠানে বেরোল ডার্লিউআরএক্স, পিছনে
ছিটিয়ে দিচ্ছে নুড়িপাথর । পেরোল প্রকাণ্ড পোর্টকালিস, ড্র-ব্রিজে
উঠে চলেছে মেইনল্যাণ্ডের দিকে ।

এইমাত্র ভূমিশয্যা থেকে উঠেছে মেজর মিখাইল পেরোনভ,
তখনই দেখল গ্যারাজ থেকে শাঁ-শাঁ করে ছিটকে বেরিয়ে গেল
দামি পাঁচটা গাড়ি । পিছু নিয়েছে ডার্লিউআরএক্স র্যালি কারের ।

সামনে লাল ফেরারি, পিছনে রুপালি পোর্শ জিটি-২, এর পর
একে একে তিনটি পিউজো র্যালি কার । শেষ তিন গাড়ির পাশে
ড্রাগন করপোরেশনের স্পনসরশিপ লোগো ।

‘শালারা!’ রাগে গরগর করল মেজর পেরোনভ । ‘ওই যে
ভাগছে শালার মাসুদ রানা! রওনা হও! রওনা হও! ধরে আনো!
একসেকিউশন সলিউশন ফর ইউ-র আগেই শালার মাথাটা চাই ।
চামড়া ছিলে জ্যান্ত শালার গায়ে লবণ দেব আগে!’

এইমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে তার লোক ।

তাদের চারজন ছুটল কপ্টারের দিকে ।

পিছনে রয়ে গেল পেরোনভ ও দুই কমাণ্ডে, হাতে ছিন্ন
মাথার বাস্ক ।

এবার সত্যিই শুরু হয়েছে রানা ও তিশার পিছনে ধাওয়া ।

. ওরা পালাবে কোথায়?

একাকী, অসহায় কুয়াশার পরিণতি কী হবে?

দুর্গ এবং এই বিরান এলাকায় কেউ তো বন্ধু নয় ওদের!

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

মাসুদ রানা বাউন্টি হান্টার্স

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

গম্ভীরদর্শন, ওই প্রকাণ্ড ফ্রেঞ্চ দুর্গ থেকে তিশাকে নিয়ে
লেজ তুলে পালাচ্ছে রানা। কিন্তু ঘিরে ফেলেছে শত্রুরা।
শেষে উঠতে হলো এক এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে।
ওখানেই জানল, ম্যাজেস্টিক-১২ কাউন্সিলের মাস্টার প্ল্যান।
ওরা দখল করবে গোটা দুনিয়া। একের পর এক
নিউক্লিয়ার মিসাইল দিয়ে উড়িয়ে দেবে বড় বড় শহর।
রানার এখনই চাই টাচলক-৯ ইউনিট।

...ওদিকে কী চলছে আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে?
রানার পথে বাধা হয়ে উঠল শত শত যুদ্ধ-বিমান।
কাবা ঘরে পড়বে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল।
কখনও লাভ হয় মিসাইলের পিছু নিয়ে?
তবু শেষ চেষ্টা করল রানা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে
দিল কুয়াশা। কী করে বাঁচাবে ওরা লাখ লাখ নিরীহ
হাজীকে? নিশ্চিত মৃত্যুকে পরোয়া করল না ওরা।
এবারই বুঝি চিরবিদায় নিতে চলেছে আমাদের
মাসুদ রানা ও মহৎহৃদয় বিজ্ঞানী কুয়াশা।



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০